বিষ্ণু দে : কালে, কালোত্তরে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় · পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণু দে ঃ কালে, কালান্তরে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৯

প্রকাশকাল :
শ্রাবণ : ১৩৩১

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮/বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : কুমারঅজিত

আমাদের ভাই প্রয়াত

প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণে :

পূর্বকথা

বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্বন্ধে সুচিরস্থায়ী আগ্রহের ফলে এই বইয়ের নানা নিবন্ধ আমরা লিখেছিলাম কয়েক বছর আগে। নিবন্ধগুলি ছাপা হবার পরে আমরা লক্ষ করি, বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও নিবন্ধগুলির মধ্যে একটি নাতিপ্রচ্ছন্ন যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। তখনই এগুলিকে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করার একটা পরিকল্পনা আমাদের সক্রিয় করে তোলে। তারই ফলে কিছু ঘসামাজা, কিছু বর্জন, সংযোজনের ভিতর দিয়ে এই দুরূহ কাজটিকে একটা মোটামুটি রূপ দেওয়া গেল। অন্য নামে বইটির বহুলাংশ প্রকাশিতও হয়েছিল। নানা কারণে তা পাঠকগোচর বিশেষ হয়নি। 'মৌসুমী প্রকাশনী' এ দায়িত্ব পরিশেষে কাঁধে নেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

কবিপত্নী শ্রীপ্রণতি দে নানা বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। নানা প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই তিনি যে গ্রন্থপঞ্জীটি করে দিয়েছেন, সেটি এ গ্রন্থের গৌরবের কারণ।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিষ্ণু দে-র কাব্যপাঠের ভূমিকা	৯
বিষ্ণু দে ও সময়	২৫
বিষ্ণু দে ও পুরাণ	৪০
বিষ্ণু দে ও মৃত্যুচেতনা	৫৯
বিষ্ণু দে ও এলিঅট	৬৯
বিষ্ণু দে-র নন্দন চিন্তা	৯৬
"বিভাবরী তাকে দিয়ে দাও যাকে দিয়েছ দিবা"	১০৯
ঘোড়সওয়ার, ঘোড়া>নদী	১১৮
একালে ক্রেসিডা-ট্রয়লাস	১৩২
পদধ্বনি	১৪২
"এলসিনোরে" ও "জল দাও"	১৪৮
ক্লান্তি নেই	১৬৪
চিঠিপত্র	১৬৮
গ্রন্থপঞ্জী	১৭৯

বিষ্ণু দে-র কাব্য পাঠের ভূমিকা

॥ এক ॥

নিশ্চিন্ততায় নিথর মধ্যাহ্নের দিবাস্বপ্ন প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলি ফুরোতে না ফুরোতেই পলাতক; ভিক্টোরীয় সাম্যানিকতার বিলম্বিত উপসংহারে সাম্রাজ্যের দ্বীপে দ্বীপে ঘনিয়ে এসেছে দীর্ঘ বিকেল। মহাযুদ্ধ সে-বিকেলকে কামানের ধোঁয়ায় চার বছর ঢেকে রেখেছে শুধু এক সঙ্কটের জটিল সন্ধ্যাকে জন্ম দেবে বলে। ওদেশে এবং এদেশে সে-জটিল সন্ধ্যার প্রাথমিক ধূসরতায় প্রাক্তন অথরিটির পতন ঘটেছে নানাভাবে। যে-মনোভাব নিয়ে তিরিশের মুখে মুখে অক্সফোর্ডের ছাত্রেরা রাজকীয় মহিমার জন্য, অথবা স্বদেশের জন্য অস্ত্রধারণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, সেই মনোভাব নিয়েই এদেশের যুবকেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে গিয়েছে, পুরাতন নেতাদের প্রত্যাখ্যান করে মহাত্মাজীকে অনুসরণ করেছে, আবার গান্ধীজীর পন্থাকেই কঠিন সমালোচনা করেছে। মার্কস্ এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্রয়েডীয় চিন্তাতরঙ্গ এদেশেও এসে পৌঁছোচে—মানুষের নতুন সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞার্থ ঘুচিয়ে দিল পুরনো মুখোশের সমস্ত জেল্লা। মধ্যবিত্তের পায়ের তলার মাটি সরতে লাগল বিশ্বব্যাপী মন্দার আঘাতে। সেই অথৈ আবর্তের মাঝখানে কূলহারা মধ্যবিত্ত কখনো কখনো এক আধখানা কাষ্ঠখণ্ড হাতের কাছে পেয়েছে বটে—কিন্তু সে-কাষ্ঠখণ্ড আর কিছু নয়, ঊনবিংশ শতকীয় লিবারেলিজ্‌মের বিরাট প্রতিশ্রুতির ভাঙা জাহাজের ব্যর্থ অবশেষ মাত্র। তা নিয়ে এ-সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যাবে না। চাক্ষুষ বাস্তবতা ও গূঢ় বাস্তবতার ছেদ ঘটে গেল নানা জটিলতায়।

এ সময়ে রচিত সেই সব কবিতাকেই আমরা বলেছি "আধুনিক কবিতা" বা 'একালের কবিতা' যেগুলিতে আবার ও বাস্তবতার ঐ জটিল অন্বয়কে উপেক্ষা করা হয়নি। এই স্বীকরণের কারণে প্রচলিত কবিতার সঙ্গে আধুনিক কবিতার ব্যবধানে অনুভূত হয়েছে এক অসমছন্দ ঝাঁকুনি। জীবন এবং মানুষ সংক্রান্ত উপলব্ধির স্বাতন্ত্র্যের জন্যই এই কবিতা প্রচলিত কাব্য ঐতিহ্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে কিছুটা রূঢ়তার সঙ্গে। আধুনিক কবিরা কবিতার বোধন এবং সংকল্প ঘটালেন গ্রামীণ বটবৃক্ষ বা বিল্বমূলে নয়—সেই নগরে,

যেখানে আবিশ্ব স্পন্দিত নানা ছন্দে। অথচ এ লক্ষণটুকু একান্তই আপাত। বরঞ্চ আরো বড়ো কথা হলো এই আধুনিক কবিরা প্রথম পর্যায়েই সবলে প্রত্যাখ্যান করলেন স্থূল আত্মতৃপ্ত বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত-সংস্কারকে। এই নিম্ন মধ্যবিত্ত তরলতাতেই আশ্রয় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রেতর কবি সমাজের অনেকে। তিরিশের কবি যাঁরা নন তাঁদের মধ্যেও এক সচেতন অংশে ঐ বাণিজ -নির্ভর মধ্যবিত্ত নিশ্চিন্ততাকে প্রত্যাখ্যানের মনোভাব কোনো না কোনো ভাবে দেখা দিয়েছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্রবিমুখতা সাহিত রুচির পুনঃসংস্কার নয়, বাস্তবতাকে পুনরধ্যয়নের এ প্রেরণামূল নিহিত ছিল বাস্তবতার মধ্যেই। বাস্তব অভিজ্ঞতাসিদ্ধ যতীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে এক নজরুলই কথঞ্চিৎ ফর্ম-স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিষয়বাস্তবতায়। যদিও তিরিশের কবিদের মধ্যে ভিন্নস্তরের কবিত্ব, তথাপি জীবনানন্দ এবং বুদ্ধদেব বসু একজন অজ্ঞাতে, একজন জ্ঞাতে ইএট্সের এই অনুভূতিকেই সমর্থন জানিয়েছেন যে, কবি এবং কৃষক যে-কোটিতে থাকেন, মুদি এবং রাজনীতিব্যবসায়ী তার বিপরীত কোটিতে। শুধু জীবনানন্দ যদিবা কখনো বুঝে থাকেন, বুদ্ধদেবের এ উপলব্ধির জন্য কোনো গরজ ছিল না যে, বাংলার প্রাণবন্ত লোককথায় হয়তো মধ্যবিত্ত সংকটের মুক্তিপথের একটা সংযোগ-সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়—ইএট্স-এর এ-ব্যাপারে কিন্তু কোনো ভুল ছিল না।

॥ দুই ॥

বিষ্ণু দে প্রথম থেকেই সে-সচেতন সংবেদিতার জন্য বিশিষ্ট, তার একমূল রয়েছে বাস্তবের পরস্পর প্রাতিমুখ্য সংক্রান্ত জ্ঞানে, আর এক মূল রয়েছে আবহমান শৈল্পিক বিশ্বের আনন্দের উত্তরাধিকারে। জীবনানন্দ বা বুদ্ধদেব বসু তিরিশের আর দুই প্রধান কবি, বাণিজ্যিক নাগরিক মধ্যবিত্তের সকল বাতাবরণ থেকে সেদিন বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। জীবনানন্দের 'অবসরের গান', বুদ্ধদেবের 'চলচ্চিত্র' বা 'কবিজীবনী মধ্যবিত্তের বদ্ধতা থেকে মুক্তির জন্য দুই প্রকারের আকুলতা। এই আকুলতার বাস্তবিকতায় কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এই আকুলতা এক বিশ্ববীক্ষায় সমৃদ্ধ না হলে তা শুধুই হবে এক রোমন্টিকতা। আমাদের শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই বিষ্ণু দে জেনেছিলেন যে, ঠাট বজায় রেখেও মধ্যবিত্তের যা কিছু সব ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে পড়ল ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে—তার জন্য হাহাকার করে লাভ নেই। এই ভাঙ্গচুরের মাঝখানে হারিয়ে গেছে সর্বজনীন বিশ্ববীক্ষা। কবি পাঠকে সামান্য সংযোগ খুঁজে পাওয়া দায়—পাঠকেরাও হারিয়ে ফেলেছে পরস্পরের মধ্যবর্তী পুরনো সংযোগ। এ কিন্তু আর্নল্ড-কথিত অশ্রুর সমুদ্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তি-দ্বীপের বিরহ বেদনা নয়। বেদনাই সেখানে ছিল সেতু। এখন আর সে সেতুও নেই। বৈদেশিকতায় দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল চারিপাশ। উদসীনতায়, অনপেক্ষতায়, সবাই নিঃসম্পর্ক।

ইংলণ্ডে এই সর্বজনীন বিশ্ববীক্ষার অনুপস্থিতিকে অনুভব করেই এলিয়ট খুঁজেছিলেন অস্তিত্বের নির্ভর হিসাবে এক কল্পভূমি—সেটাই হল—বিশ্বগত সাহিত্য ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। এই শূন্যতা এবং এই শূন্যতা পূরণের প্রয়াস—দুই ব্যাপারই বিষ্ণু দে-র কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিভাত হয়েছিল সেই তিনের দশকের বাস্তবতা-অধ্যুষিত দিনগুলিতে, সেইসব অনন্বিত অস্তিত্বের নিরুপাধি যন্ত্রণার প্রথম টেন্‌শনেই। কিন্তু এলিয়টের সঙ্গে এই এলিয়ট-শিষ্য জীবনের কুরুক্ষেত্রে প্রথম থেকেই যে পার্থক্য রচনা করলেন তা বুঝিবা দ্রোণার্জুনের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয়। এলিয়টের গুণমুগ্ধ হয়েও বিষ্ণু দে নিজ কাব্যচর্চায় ভিতর দিয়েই পরোক্ষে দেখালেন এলিয়টের সীমাবদ্ধতা কোথায়। সে সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে কডওয়েলের এই অনুমান খুবই সঠিক—Unless there is a common world view of reality, there cannot be a common world view of literature.*

এলিয়ট যাকে শিল্প সাহিত্যগত বিশ্বদৃষ্টি বলেছেন, তাওতো এক ব্যক্তিগত সাহিত্যবীক্ষণের ব্যাপার। তাই বিষ্ণু দে-কে প্রথম থেকেই বুঝে নিতে হয় বাস্তবের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা। এই দ্বন্দ্বময় বাস্তবকে স্বীকৃতি দিতে তিনি তিলমাত্র বিলম্ব করেননি বলেই এই কবির জীবনে একটা বিশেষ কৌতূহলো-দ্দীপক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিকৃতিতে দুরূহতা-এবং দুরূহতার সঙ্গে লড়াই একসঙ্গে রয়েছে সেই প্রথম মুহূর্ত থেকে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ভুল না করলে 'বিষ্ণু দে দুরূহ'—একথা বলার প্রাক্‌কালেই এ তথ্য স্বীকার্য। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় যে-প্রতীকই তিনি ব্যবহার করে থাকুন—বিচ্ছিন্নের

* Romance and Reality—A study in English Bourgeois Literature—Christopher Caudwell দ্রষ্টব্য।

ব্যাকুলতাই এই কবিতাটির হৃৎস্পন্দন। এই ব্যাকুলতার অভিঘাতে কখনো রূপান্বিত হয় কলকাতার রূঢ় নাগরিক জটিলতা, যেমন—'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী—(বুদ্ধদেব বসুকে)'। আবার 'ক্রেসিডা' কবিতায় সেই ঐতিহ্যগত প্রাচীন অসমাধান পীড়িত নায়কও মুক্তি খোঁজে কর্মৈষণায়। সুতরাং দুঃসমাধেয় বাস্তবতার তাড়নায় তিনি নিজের শিল্প অভিজ্ঞতার দুর্গে আত্মগোপন করলেন না। জীবনের সমাধান জীবনেই লভ্য—এই নৈতিক অবধানতাকে তিনি প্রথম থেকেই অঙ্গীকার করে নিয়েছেন।

॥ তিন ॥

এই অবধানতার ফলে কবি এগিয়ে আসেন বৃহত্তর স্বদেশপট ও বিশ্বপটভূমির উপস্থাপনা ও প্রয়োগে। অন্তরের দিক থেকে এ পরিবর্তন যেমন তাৎপর্যসূচক, শিল্পকর্মের দিক থেকেও এ অবধানতা তেমনই হয়ে উঠল পরিণামী। সিনেমা বা ফিল্‌মের সঙ্গে তুলনীয় সে-আঙ্গিক রীতি। ছোট ছোট শট্ বা দৃশ্যের মতো গূঢ়ভাষী ছোট ছোট স্তবক, বা চকিত করে তোলা-একক পংক্তি, একটা বা নানা mood-এর সাহায্যে একটা বস্তুনির্ভর মন্ময় অনুভূতি গড়ে দিতে পারে—তা আমরা এলিয়টের বিখ্যাত চেনা কবিতাগুলিতে কিছু দেখেছি। বিষ্ণু দে-র 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় এই রীতি প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সকলনাগরিক তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা এখানে ধৃত হয়েছে এক নতুন ধরনের মন্ময়তায়। Gerontion-এর বৃদ্ধ-স্মৃতি যেমন ফুটে ওঠে এলিয়টের বিশিষ্ট মন্ময়তায়, 'জন্মাষ্টমী' কবিতার স্তবকে স্তবকে তেমনি এক যুবকের আহৃত অভিজ্ঞতা সমাহৃতির পারম্পর্যে শেষ অবধি এক ঐক্যবিধায়ক মন্ময়তার জন্ম দেয়। এই দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের বিভিন্ন মুডের সম্পাতে অথবা মন্তাজের সদৃশ এক রীতি প্রয়োগে 'জন্মাষ্টমী' কবির আধুনিক সংবেদিতার কবিতা।* অথচ 'জন্মাষ্টমী-১৩৫৪' কবিতাটি রূপে ও স্বরে প্রথম 'জন্মাষ্টমী' থেকে কত পৃথক—সেই কলকাতা-ই—অথচ উপস্থাপনার স্বাতন্ত্র্যে তার তাৎপর্যই আলাদা।

*অপ্রাসঙ্গিক বলে পৃথক ভাবে উল্লেখ্য যে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার 'চলচ্চিত্র' নামকরণ সুধীন্দ্রনাথের 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের 'সিনেমায়' কবিতা এবং 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় 'মার্কিনীরা বৃথা মাথা নাড়ে' অংশ প্রমাণ করে যে এই নতুন শিল্প মাধ্যমটি সম্বন্ধে কবিদের সচেতনতা।

কিন্তু 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় অনুভব করা যায় যে কলকাতাতেই মধ্যবিত্তের দ্বিরায়তনিক অস্তিত্বের সংকীর্ণতা ঘুচে যাবে জীবনেরই বিস্তৃতির মোহনায় :—

সর্বংসহা আমাদের বসুন্ধরা সুন্দরী, বারেক
বিলম্বিতা গ্রীবা
রাকা মুখ ফিরায় বুঝিবা।
সূর্যের বিরাট তূর্যে হিরণ্যগর্ভের
আলোক কাড়ায়-নাকাড়ায়
মুক্তিস্নান লজ্জিত দর্বের
উচ্চৈশ্রব রক্তিমাধারায়

আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দ নিস্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বাবেগে।

এবং এ মুক্তির ভূমিকা রচিত হয়েছে 'পূর্বলেখের'ই 'পদধ্বনি' কবিতায়, বিপন্ন মধ্যবিত্তের হৃতমহিমা যে কবিতার পার্থের অন্তিম নিঃশক্তির প্রতীক রূপায়িত হয়েছে। কবিতাটি যেমন দীর্ঘ অতীতসম্পন্ন মধ্যবিত্তের পতনের প্রাঙ্‌মুহূর্তের সংকট-বিমূঢ় চিত্র, তেমনি অন্যদিক থেকে বিষ্ণু দে-রও ক্রান্তিলগ্নের ছবি। এদিকে ইতিহাসও তখন সমাগত দ্বারে—তার রূঢ় করাঘাত ও নিজেকে ঘোষণা তখন পক্ষপাতের সত্বর ডাক দিয়েছে। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষের মেঘছায়া ঘন নেমে এসেছে গ্রামে নগরে। 'সাতভাই চম্পা' এই সময়ের বই। সেই বিস্তৃত বিশ্ববাস্তবতার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা কবিকে সাধারণ্যের সচেতন অনুভূতির স্রোতে আহ্বান করেছে। তার চলিষ্ণু প্রাণবত্তায় দুলে ওঠে অসাধারণের ঢেউ—কথ্যের ধারালো দীপ্তি ফুটিয়ে তোলে আশ্চর্য নাটক। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সেই পুরনো অসিধার এখন সংবৃত হল। বিশ্বজোড়া মত্ত তোলপাড়ে আবেগের প্লাবনে ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ জ্বালার আর প্রয়োজন থাকল না। এই সাধারণের জীবন স্রোতে অবগাহন করেই কবি খুঁজে পেয়েছেন লোকজ সংস্কৃতির প্রাণদা প্রেরণাকে। রূপকথা, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব গান, লোকায়ত গাথার অফুরান ভাণ্ডার সাধারণ জীবনের তরঙ্গ বেগেই তার কাছে উন্মোচিত হল। 'সাতভাই চম্পা' নাম কবিতাটি এই অর্থে অসামান্য কবিতা। এবং সে অসামান্যতা অর্জিত হতো না, যদি না লিখিত হতো 'কোড়া' অথবা 'চা' কিংবা 'মফস্বলে' বা 'এ জনতার' মতো কবিতাগুলি।

এই সব বিষয়-বাস্তবতার এক একটি স্তর যেন এক একটি সোপান, মধ্যবিত্তের পোষ্য অস্মিতা থেকে মুক্তির জন্যই এই সোপানগুলি অতিক্রম করে কবি পৌঁছলেন 'চম্পা'-প্রতীকের গাঢ় স্মৃতিধর আবেগগর্ভ অনিবার্যতায় :—

তোমার বাহুর নির্দেশ দেখে ক্ষোভে
কত প্রাণ গেল, কতজনা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন হিরণ মায়ায় রেখেছে ঢেকে,
খুলে দাও মুখ রৌদ্রে জ্বলুক গান।

'অপাবৃণু'—এই প্রাচীন আর্য আবেদন আরেক নতুন অর্থে জন্মান্তর পায়। আবার অন্যদিকে প্রত্যক্ষ বাস্তবের জল হাওয়ার স্পর্শে এবং দোলায় চম্পা কবিতার 'তুমি' আর্ঘ পরিধির দিক থেকে হয়ে উঠল আরো বৃহত্তর। বস্তুতঃ বিষ্ণু দে-র কবিতায় 'সন্দ্বীপের চর' এবং 'অন্বিষ্টে' বিশেষতঃ যে-'তুমি' দেখা দিল তা কবির আবেগের বোধির এক কল্পনা গঠিত অধিষ্ঠান-ভূমি। 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে 'জল দাও' কবিতাও এর পরম অভিব্যক্তি ঘটেছে শেষতম স্তবকে।

এবং যদিচ কলকাতা মহানগরীর কয়েক দশকে নানা রংঢেের, সন্ধ্যা-বিকেল-মধ্যাহ্নের নানা ছবি, বিষ্ণু দে-র কবিতায় এক পৃথক কৌতূহলের স্রষ্টা, যদিও তাঁর কলকাতা কদাচ স্বপ্নে পাওয়া কবি সুলভ কলকাতা নয়, যদিও সে কলকাতার দীর্ঘতান কলরোলের প্রতিধ্বনি 'পূর্বলেখ' থেকে 'সংবাদ মূলতঃ কাব্য' পর্যন্ত শ্রুত হয় নানা ছন্দে, যদিও সমর সেনের 'কলকাতা চেতনা'-র সঙ্গে প্রতি-তুলনাতেই হয়তো বিষ্ণু দে-র কলকাতা-অবধানতা আর এক তাৎপর্য পায়—এবং যদিও সেটাই একটা পৃথক আলোচনার মনোজ্ঞ বিষয়—তথাপি অতঃপর গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক মিলনে তাঁর কবিতায় এসেছে একটা নতুন অধ্যায়। 'সন্দ্বীপের চর' এবং 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি যখন লেখা হচ্ছে তখনকার জীবনের নানা বেগার্ত যন্ত্রণা, বীরত্ব ও নিগ্রহ, অপচয় এবং সঞ্চয়, অপঘাত এবং আত্মদান, কলঙ্ক এবং তিলককে অঙ্গীভূত করেই কবি-ব্যক্তিত্বের বিকাশের ছন্দটি তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। সংহত ভাষণের সহজাত অধিকার নিয়েই বাংলা কবিতার অঙ্গনে তাঁর পদক্ষেপ। তাঁর নাটকীয় নৈপুণ্য ও দক্ষতা আমাদের কারো-অজানা ছিল না। 'সন্দ্বীপের চর' ও 'অন্বিষ্টে' পৌঁছে

আমরা বুঝলাম বিস্তৃতিতে তিনি বাংলা কাব্যে অদ্বিতীয়। 'সাত ভাই চম্পা'য় সেই বিস্তৃতির নাটকীয় সংহতি কালের স্পন্দনকে ধ্বনিত করেছে।

॥ চার ॥

প্রসঙ্গত আরো দু'জন কা'র কথা ওঠে—একজন কোন্ দুর্জ্ঞেয় কারণে আর লেখেন না, আর একজন আজও অনবসিত—অথচ সেই প্রথম তারুণ্যের দিনগুলিতেই, তিনের দশক শেষ হতে-না-হতেই এঁরা সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত বিদগ্ধ কাব্যরসিকদের; এঁরা হলেন সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র প্রথম কবিতাভবন সংস্করণের ভূমিকায় এঁদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর মন্তব্য আমাদের মনে আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন কবিতায় নিয়ে এসেছেন এক নতুন ঋজু প্রত্যক্ষতা। সুগভীর তাৎপর্যময় তাঁর ছন্দের নতুন শক্তি এই প্রত্যক্ষতারই দান। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্তের সকল অকৃতার্থতা সমর সেনের কবিতায় অসামান্য মূর্তি পেয়েছে। সমর সেনের কবিতায় অকাব্যিক গদ্যময় নাগরিক জগৎ তাঁর নিজস্ব ছন্দেই ঠিক মতো ফুটে উঠেছে। বিষ্ণু দে, সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বন্দ্বগত বস্তুবাদী এক বিশেষ বিশ্ববীক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন চারের দশকে—কিন্তু সে-বিশ্ববীক্ষার ফল হয়েছে তিনজনের ক্ষেত্রে তিন রকম। সমর সেনের আঙ্গিকরীতির যেখানে সাফল্য সেখানেই ছিল তার সীমাবদ্ধতার বীজ। মধ্যবিত্ত ধূসরতার ভিতরে চেয়ে থাকতে থাকতে তিনি হারিয়ে ফেললেন সেই বিস্তৃত জীবনপট, যা না হলে জীবনের বহুধাবিস্তৃত বাস্তবতার juxtaposition সম্ভব হয় না। যদিও সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যাকে তাঁর কাব্যের আবেগ-উৎস বলে মেনে নিয়েছিলেন, সেই জনতার জন্যই এই পর্যায়ে (মাত্র এই পর্যায়েই, পরে তিনি এ থেকে মুক্ত হন) কিছু সরলীকৃত কবিতা লেখেন. কিন্তু তাঁর সারল্যে আবেগের স্পর্শ থাকতো বলেই তাঁর কবিতা পাঠে উৎসাহের অভাব হয়নি—উৎসাহ দিতেও পারতো কবিতাগুলি এ বিষয়ে অবামপন্থীরাও সন্দেহ করবেন না।* হিকমতী অধ্যায়ে ও আরো পরে তিনি জীবনের সঙ্গে মিলেমিশেই শিল্প খুঁজেছেন তাতে কোনো ভুল নেই কিন্তু কোনো দিনই কবিতায় তিনি দ্বির্থকভাষী হয়ে স্বস্তি পান না। কবির মধ্যেই ব্যক্ত সময়ের ছন্দ এবং যতি—এতে বিষ্ণু দে,

* 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা'/সত্যজিৎ চৌধুরী/নতুন সাহিত্য—তৃতীয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সমর সেনের কোনো ভুল ছিল না। কিন্তু বিষ্ণু দে জেনেছিলেন সময়ের ত্রিকাল বিস্তৃত দীর্ঘ ছন্দের প্রবহমানতাকে। বিষয়-বস্তুর অনিবার্যতা অপেক্ষা তার মহত্ত্ব, তার শৈল্পিক সম্ভাবনার প্রশ্নটি বিষ্ণু দে-র কাছে জরুরী হয়ে দেখা দেয়—জীবনেরই তাগিদে। অতীত তাঁর কাছে ভাণ্ডার, বর্তমান তাঁর কাছে প্রয়োগক্ষেত্র, কেন না ভবিষ্যৎ তাঁর কল্পনায় অবচ্ছিন্ন সুদূর নয়। তাই তাঁর মধ্যে বিশ্বগ্রাহী কৌতূহলের আলোড়ন। 'সাতভাই চম্পা'র পরবর্তী কয়েক বছর এদেশে ডান-বামের নানা ঘোরা-ফেরায়, ভ্রাতৃ হননে, দুর্ভিক্ষে চিহ্নিত কাল খণ্ড। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে উৎসর্জিত প্রাণ কম্যুনিষ্ট কর্মী লালমোহন সেনের স্মৃতিতে সন্দ্বীপের চরভূমি সচেতন বাঙালীর কাছে অবিস্মরণীয়। বিষ্ণু দে-র 'সন্দ্বীপের চর' সেই মহৎ বিনষ্টির পটভূমিতে মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলিত বেদনা ও পুনরুজ্জীবনের কাব্য। বাস্তবের সেই প্লাবনী প্রবলতায় কবিতার আঙ্গিক রীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। এসেছে মহাকাব্যের সঙ্গে উপমেয় ভাষণ ভঙ্গী, এসেছে বিস্তৃত জীবনের প্রসাদ ও যন্ত্রণা। নাম-কবিতাটিকে উদ্ধৃতির দ্বারা খণ্ডিত করতে ইচ্ছে হয় না। একথা মনে হয় কবিই সময়ের সচেতনতার চূড়ান্ত বিন্দু। 'হাসনাবাদেই' রইল এই ঔপনিবেশিক জটিলতার এক ছবি, 'কঙ্কালীতলা' রইল সেই বিপর্যস্ত মর্মন্তুদ জীবনের আরেক সাক্ষ্য।

এবং এই বিস্তৃত বিশ্বগ্রাহিতার পরমা প্রতিমা গড়ে উঠেছে 'অন্বিষ্ট' কাব্যে। আত্মঘাত এবং আত্মদানের অযুক্তি ও প্রেরণায় জীবনের জটিলতা তখন বেড়েছে বই কমেনি।—"দেখ দেখ/তরুণ কুমার ওই মাথা কোটে বারবার/মরিয়া আবেগে"—অথবা এই জাতীয় আরো নানা অংশে আধুনিক মানুষের চারিত্র-ন্যায়ে স্পন্দিত হয় আধুনিক সংবেদী অভিজ্ঞতা। সেই সময়ের এক অস্বাভাবিক আত্মদানের নিরুত্তর রহস্য বোধ করি কবির সেই ঈপ্সিত নৈর্ব্যক্তিকতাকেও বিচলিত করে:

আর তুমি—তুমিই কি মরণের কূট-ভ্রূকুটিতে
পথের ধূলায় পড়ে? বরণীয় তনু হিম প্রাণ
হীন প্রাণহীন প'ড়ে পথের ধূলায় প'ড়ে রক্তময় বসন্তের প্রাণ?
এ কিবা সূর্যাস্ত শেষ কোন সূর্যোদয়ে?
ওড়াও ঊর্মিল বীজকম্প্র হাহাকার, স্মৃতি পাতো মর্মে মর্মে ভিতে
ঘনিষ্ঠ সংবিতে

তোমার নিথর দেহ প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী!

সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে সূর্যে পরাক্রান্ত গান।

শেষ দুই চরণের প্রথমটি সেই ঐতিহাসিক ট্রাজেডির সাক্ষ্য, দ্বিতীয়টি শেক্সপীয়রীয় কলাবিধির স্মারক—জীবনের সুস্থির প্রবহমানতার স্মরণ। '১৪ই অগস্ট' কবিতায় বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তের বিশৃঙ্খল রোগদুষ্ট উৎসববিকারকে এক জিজ্ঞাসায় চঞ্চল করে তোলেন :

দেখেছি মেলায় এক তারই মাঝে গুটিকয় শিশু

উদ্‌ভ্রান্ত ঘোরে যে তারা ফিরে কে তাকায়

কোন্ গ্রাম, কোথা ঘর, খুড়ারা দাদারা কে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত শিশুরা

এ ওকে শুধায়, ভাই একেই কি মেলা কয়? বাবুদের মেলা?

এই সেই সময়, যখন উগ্রতাজনিত কালিমা কবির উদ্দেশ্যেও নিক্ষিপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিষ্ণু দে-ও সেই সব কুৎসা থেকে নিষ্কাশিত করেছেন মুক্তার মতো উজ্জ্বল কবিতা :

পরমাগতি। তোমার হাসি চোখে

হৃদয়ে নীল ঢেউ বলো কে রোখে?

কুৎসা শুধু কুয়াশা, হবে ভোর

উষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর।…

তোমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে

বিজ্ঞ বলে কত কি মূঢ় রাগে।

এই সময়ের সমস্ত আক্ষেপস্পন্দের, বাস্তবতার সকল পাক, এবং মোচড়ের হাত থেকে মুক্তির প্রয়াসে বিশিষ্ট কবিতা 'এলসিনোরে'। ঐ পাপপূতি-অধ্যুষিত রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় ব্যক্ত হয় এ-যুগেরই অনাচারজর্জর এক অসহনীয় বাস্তবতা। কিন্তু এই আক্ষেপস্পন্দের চঞ্চলতা ছাড়িয়ে কবির কল্পিত চরিত্রপাত্র 'জল দাও' কবিতায় আরো গভীরতর এক স্বরূপকে খুঁজে পায়। 'অন্বিষ্ট'-সমসাময়িক জীবনের চেতনা গোটা কাব্যগ্রন্থটিতে 'জল>পাথর' অথবা 'তৃষ্ণার' প্রসঙ্গে যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে। যেমন প্রত্যক্ষতঃ এই সব অংশে :

(ক) কোথায় শ্রাবণ ধারী আষাঢ়ের গান

(খ) গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে

(গ) কাজের বিরস দিন করে দেবে বৈশাখের মেঘ/রচনার দিন

(ঘ) দিগন্তে দিগন্তে খোঁজো তৃষ্ণার্ত নিখিল

(ঙ) স্নায়ুর ঘাঁটিতে/অম্লান পিপাসা আজো,

(চ) অস্তিমের তৃষিত পাথরে

(ছ) দগ্ধ দিনের তৃষ্ণিকা টলোমলো

(জ) বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই প্রাণ এক ছিটে ;

(ঝ) একফোঁটা জলকণা নেই চোখ/এমন কি চোখ অশ্রুবাষ্পহারা—

তৃষ্ণার এই প্রতীকী অনুভূতির সতত উপস্থিতির জন্যই 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে কবির কল্পিত চরিত্রপাত্রের, বা তাঁর নৈর্ব্যক্তিক 'আমি'র কাছে 'জল>হাওয়া >গন্ধ এক নূতন তাৎপর্যে বাস্তবতার স্বরূপের রূপান্বিত ব্যাখ্যাতা হয়ে ওঠে। 'জল দাও' কবিতা 'অন্বিষ্টে'র প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা। গ্রীষ্মের দুঃসহ দুর্বিচার ও তার ফলে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, স্তব্ধীভূত কর্মধারা, সমস্ত বাস্তবাবস্থার এমন এক বস্তুনিষ্ঠ রূপাধার গড়ে তুলেছ যা মহাকাব্যের স্মৃতিবহ। 'জল দাও' কবিতাব পরোক্ষ প্রেরণায় যদি কোনো fertility ritual-এর অস্তিত্ব থাকে, তা ভেবে দেখা যাবে হয়তো— কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা হলো এ কবিতার শেষ স্তবকের সঞ্জীবনী আহ্বান নিজেই তৃষ্ণাবারির সমতুল্য।

॥ পাঁচ ॥

'অন্বিষ্ট' অধ্যায়ে প্রত্যক্ষের কঠিন চাপকে জ্যাবদ্ধ করার যে দুরূহ ব্রতে সেদিন কবির অভিনিবেশ ও সিদ্ধি, দেখা গেল, সঙ্গত কারণেই 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থে তা সহজ হয়ে এসেছে। সে আততিও বুঝি খানিকটা শিথিল। সুতরাং 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখে'র সাফল্য ভিন্নতর। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বাস্তবকে পরিগ্রহণের রীতি ও কলা বাস্তবের ছন্দ অনুসারেই ভিন্নতা পায়। অথচ এর পূর্ববর্তী 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ 'অন্বিষ্টে'র অভিজ্ঞতা যেন আরেক উজ্জ্বলতা পেয়েছে, পেয়েছে এক অন্য বর্ণবিভা। 'তিনটি কান্না' বা 'পাঁচ প্রহর' বাস্তবতার ভিতর দিয়ে প্রবহমান সময়চেতনার এক শিল্পময় সাক্ষ্য। 'তিনটি কান্না'র তৃতীয়টি এবং গোটা 'পাঁচ প্রহর' জীবন এবং শিল্প দুই প্রান্তের সম আকর্ষণে অসামান্য। পক্ষান্তরে 'টাইরেসিয়স' কবির তির্যক দৃষ্টির, নাগরিক সংলাপের, স্বরূপ উন্মোচনের চকিত ভঙ্গিতে বিশিষ্ট। ইতিহাসের ট্রাজেডিবোধ এবং সমাজ সম্বন্ধীয় এক প্রাহসনিক দৃষ্টি

ও অনুভূতির মিশ্রণে এই কবিতার পদ্যে বাঁধা কথ্যভঙ্গিতে এনেছে এক অনন্ত আস্বাদ।

ধীরে ধীরে দেখা গেল বিষ্ণু দে-র সমস্ত কবিতা একটিই দীর্ঘ কবিতা। তাঁরই বাদী সম্বাদী স্বরে, কখনো বা স্বগতোক্তিতে, কখনো স্মৃতিকথনে, কখনো ভবিষ্যভাষণে, কখনো তির্যক আলাপে স্ফুট হয়েছে এক আত্ম-অতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। 'বামী' বা 'একাদশী'র মতো কবিতা একদিকে যেমন এক হৃদয়বান মানবিকতাবাদীর মমতা, অপরদিকে তেমনি কবির বিপুল সময়-সভ্যতা-সমাজ চেতনার সাক্ষ্যবহ। এই বাস্তবতা প্রসঙ্গেই বিষ্ণু দে-র কবি-বৈশিষ্ট্যটির মূল সূত্র সচেতন কাব্য-পাঠকের কাছে স্পষ্টতা পায়। ঐতিহ্য এবং বাস্তবতার দরজা তো সকলের কাছেই খোলা থাকে—ঐতিহ্যকে আলোকবাহীরূপে পরিগ্রহণের সময়োপযোগী যোগ্যতা এবং বাস্তবতার প্রাতিমুখ্যের ভিতর থেকে গভীরতর বাস্তবতাকে আবিষ্কার—এই দুয়ের লীলাকে যিনি অঙ্গাঙ্গী করে তোলেন তিনিই বড়ো কবি। বিষ্ণু দে এই অর্থে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' নামক কবিতার সেই আশ্চর্য রূপকাবিষ্কারটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়—পাঠক বুঝতেই পারছেন আমি সেই বিবাহের সবই প্রস্তুত অথচ অনাগত বরের ঘটনা-রূপকটির কথা বলছি। এ গল্প রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু আধুনিক সংবেদিতায় নব অর্থ প্রদানের কৃতিত্ব কবি বিষ্ণু দে-র। এটা কোন প্রভাব বা অনুসরণ নয়, এইই পরিগ্রহণ।

তিনিই আধুনিক সংবেদিতার প্রধান কবি। জীবনানন্দের সঙ্গে বিষ্ণু দে'র পার্থক্য এইখানে যে জীবনানন্দের সংবেদিতা কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত — বিষ্ণু দে-র কল্পনা সংবেদিতার ক্রোড়ে সম্ভূত। তাই জীবনানন্দের সংবেদিতা স্তিমিত, বিষ্ণু দে-র কল্পনা একজন আধুনিক মানুষের স্মৃতিতে গঠিত—স্মৃতিতে মানে অভিজ্ঞতায়। যে-স্বরক্ষেপ বিষ্ণু দে-র বাগ্‌বিন্যাসকে এই সংবেদিতার উপযোগী করে তুলেছে তাও এই বাস্তবতারই অংশ। এই স্বরক্ষেপেই তিনি প্রতিফলিত করতে পারেন এক বিশালতার অনুভূতি—'জল দাও' কবিতার 'কিংবা বুঝি মোহনার গান…' অংশ, অথবা ছোট কবিতার পরিসরে 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের 'অতিক্রান্ত' কবিতা উদ্ধৃতিযোগ্য এ জাতীয় বহু কাব্যাংশের দুটি মাত্র উদাহরণ। মধুসূদনীয় বা রাবীন্দ্রিক স্বরক্ষেপের সঙ্গে বিষ্ণু দে যে-পার্থক্য সৃষ্টি করেন, তা রীতিবিলাসের তাগিদে নয়—এও তাঁর সময় এবং বাস্তবতাকে রূপান্বিত করার নিরাসক্ত শৈল্পিক প্রয়াসের ফল।

বাস্তবের প্রাতিমুখ্যের ভিতরে তিনি এক নাটককে অনুভব করেন। আনুষ্ঠানিক নয়—এই সচেতন সাধারণ্যের স্বর এক অনাটকীয় নাটককেই ধ্বনিত করে বস্তুনিচয়ের অনুভূতির মধ্যে—মানুষের যাত্রায় ও পশ্চাদপসরণে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে তা সচেতন সাধারণ্যের স্বর—সাধারণ স্বর নয়। এখনো তাঁর শেষ গুরুত্বপূর্ণ কবিতা—'অসমাপ্ত কবিতা-বাংলায় বাংলায়'—সেই মানবিক যাত্রাকেই তুলে নেয় কবিতার স্বরে ও সঙ্গীতে, পটে ও বর্ণে……

যে-চরিত্রপাত্র বিষ্ণু দে-র কবিতায় কথা বলে, অর্থাৎ এ কবিতায় যিনি 'আমি', তিনি কবিতার ভিতর দিয়েই হয়ে ওঠেন তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ দিনের ধারাজলে স্নাত এই কবি-ব্যক্তিত্ব যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে ও পরিণতিতে কবিতার দর্পণে দিনে দিনে ফুটিয়ে তোলে এক ব্যক্তিরই 'হয়ে ওঠা'। 'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনই লীলা তব'—রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণ মধ্যযুগের ভক্তি-সাধক কবিদের উচ্চারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়, এক আধুনিক ব্যক্তিত্বের গাঢ় আত্মসচেতনায়। আবার, বিষ্ণু দে যখন বলেন, 'সেকথা আমিও জানি এ যাত্রা অশেষ'—তখন এই কবি জীবনের গতিময়তাকে তাৎপর্য দেন আরেক স্পষ্টতর অর্থে। দুই কবির মানসিক গঠনের একটা সাদৃশ্যসূত্র এখানে স্মরণীয়। দুই কবিই নিজ নিজ ব্যক্তিস্বরূপকে নিয়ে ভাবিত হয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যা বিশ্ববীক্ষা, বিষ্ণু দে-র বিশ্ববীক্ষা সেই ব্যক্তি-স্বরূপের প্রসঙ্গেই পৃথক হয়ে ওঠে। "কবিতা রচনা ব্যক্তিস্বরূপের আত্মপ্রকাশ নয়, আসলে তা ব্যক্তিস্বরূপের হৃদয়ারণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ।"[১] এই নিষ্ক্রমণের প্রকার এবং ক্রিয়া বিষ্ণু দে-র কবিজীবনে বার বার নতুন নতুন রূপবন্ধনের আকৃতি সৃষ্টি করেছে। তাই তাঁর পর্ববৈচিত্র্য এত বেশি। তাই তাঁর পর্বান্তের জন্য আকুলতা এত তীব্র।

এ আকুলতা আসলে কিসের আকুলতা? যা তাঁকে উর্বশী ও আর্টেমিসেরও আগে থেকে চঞ্চল করে তুলেছে, যাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন 'দিনগুলি মোর তুলে নিলে অঞ্চলে', বলেছেন 'তোমার প্রেমে সাধনা অম্লান' অথবা বলেছেন :—

দেহের অতীতে স্মৃতির ধূপ তো জ্বালিনি।
কালের বাগানে থামেনিকো আসা যাওয়া,

---

১ 'কি করে লেখক হলাম'/বিষ্ণু দে/অমৃত/[illegible]শে আষাঢ়/১৩৭৭। বক্তব্যটির মূল তিনিই ধরিয়ে দেন এলিয়টের ট্র্যাডিশন ও ইনডিভিডুয়াল ট্যালেন্ট প্রবন্ধটির নাম নির্দেশ করে।

ত্রিকাল বেঁধেছে গুচ্ছে তোমার চুলে,
একটি প্রহর ফুলহার দাও খুলে,

সে আকুলতার পিছনে রয়েছে কিসের আকুতি? এক কথায় এর সম্যক উত্তর হয় না। যদি হয় তা হলে সে উত্তর আর কিছু নয়—এও একজন কবির যথার্থ, বৃহত্তর আত্মপরিচয়ের জন্য বিচিত্র অন্বেষা। এও আইডেন্‌টিটি ক্রাইসিস্‌। প্রাকৃত বর্ণনায় একেই বলা যায় উত্তরণের পর্বে পর্বে নিজের বিস্তৃততর গভীরতর পরিচয়কে জেনে নেওয়া। ব্যক্তিস্বরূপ আর আবেগ থেকে নিষ্ক্রমণ তার পক্ষেই সম্ভব যে ঐ দুই বস্তুর অধিকারী—একথাও এলিয়ট আমাদের জানান, বিষ্ণু দে-র কাব্যও একথা আমাদের অনুভব করায়।

তাই চোরাবালি-পর্যায়ে কবির আত্মাবিষ্কারের উল্লাসময় ভাষা ছন্দ এক দিকে 'যেমন 'ঘোড়সওয়ার' 'ওফেলিয়া' 'ক্রেসিডা'-র মতো কবিতায় পুরাতন চরিত্রের হৃদয়ের ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দেয় একালের এক কালবৈগুণ্যে পীড়িত কিন্তু ক্রান্তি-প্রয়াসী ব্যক্তির আকুলতাকে, অপর দিকে চোরা-বালিতেই হালকা চালের ("ভেরদ সোসিয়েতে-মার্কা লঘু কবিতা") কবিতায় সামাজিক পরিহাসের ছলে এক নাগরিক খঞ্জ, খণ্ডিত জীবনের ছবি আঁকা হয়। ঐ দুই 'আমির' যোগসূত্র যতটা বিস্ময়কর, তার চেয়েও বিস্ময়কর দুই 'আমি'-র বৈপরীত্য। তাঁকে একদিকে আবিষ্কার করে নিতে হয়েছে 'ঘোড়সওয়ার' থেকে 'এলসিনোরে'-র মতো কবিতার চরিত্র-পাত্রদের গতিময় কল্পনার ভাষা। অপরদিকে তিনের বা চারের দশকের কলকাতাই বিদগ্ধ যুবকের স্মার্টমন্ত ভাষার যথাযথতা বজায় রেখেই এঁকে প্রায়ই খুঁজে নিতে হয়েছে তার অচরিতার্থতার বিপন্ন স্বরটিকে। ব্যঙ্গের তির্যক চালেই শুধু নয় তিরিশের মধ্যবিত্তের সমস্ত ফাসাডের অন্তরালবর্তী শূন্যতার সচেতন বোধেই তা বারে বারে পেয়েছে এক করুণ অর্থগৌরব। মনোযোগী পাঠক দেখেছেন যে; আমাদের প্রত্যহের লোকায়ত বাক্‌স্পন্দের সঙ্গে আবেগে উন্নীত বাক্যধারার মেলবন্ধন অনধিকারীর হাতে গুরুচণ্ডালী—কিন্তু কবির হাতে এই মেল-বন্ধনেই জন্মায় অর্থের নানা স্তর। বিষ্ণু দে-র কবিজীবনের মূল সূত্রটি তাঁর পাঠকদের কাছে রস-ঘন মুহূর্তে এই কথাই ধরিয়ে দেয় যে, জীবন নামক চলিষ্ণু চঞ্চল জটিল দ্বন্দ্বময় বিশাল ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তাঁকে সমাধান করতে হয়েছে টেক্‌নিকের গূঢ় রহস্য। তাঁর বৈদগ্ধ্য তো বাংলা

কাব্যজগতে প্রায় কিম্বদন্তীর সামিল—কিন্তু এই বিদগ্ধ ব্যক্তিটি তাঁর শিল্প সাধনায় যা প্রতিভাত করলেন তা হল মানুষের অধ্যয়নের বিষয় মানুষ, জীবনের জীবন। পার্কে ক্রীড়ারত শিশু, গৃহস্থালীতে মেয়েরা, কিম্বা অফিসে কর্মিণীরা, সহিষ্ণু ঠাকুমা, গানের জলসায় উদাত্ত গায়ক, প্রৌঢ় পেনসনভোগী, গ্রামের প্রেমিক হাটুরিয়া, আদিবাসী অভিসারিকা, শহরের মিছিলের যুবক, অথবা অপচয়ে নিহত নারী শোভাযাত্রী, প্রৌঢ়ের স্নিগ্ধ চোখে দেখা নাগরিক প্রেমিক যুগল- জীবনের এমন বিশাল পরিধি সাম্প্রতিক কালের কোনো বাঙ্গালী কবির আলেখ্যে স্থান পায় নি। এ তাঁর ইচ্ছাকৃত আত্মনিক্রমণ নয়—কবিত্বের প্রেরণা সঞ্জাত উদ্গমন। তাঁর প্রকৃতিপটও জীবনের বিশালতারই আর এক ভাষ্য। নদী বা পাহাড়; শাল বা পিপুল; মধ্যরাত্রির আরণ্যক ডাকবাংলোয় ভরসাদাতা হরিণ দম্পতি, বৈশাখ শ্রাবণের রুক্ষতা, পূর্ণতা, আবার আশ্বিনের স্বস্থতা, কত রঙের আকাশ, অপিচ অবিস্মরণীয় শুশুনিয়া জীবনের ছন্দেই প্রকৃতি এখানে খুলে দিয়েছে নিজেকে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সব মিলিয়ে তিনি প্রেমের কবি। 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটি স্মরণীয় :—

তোমাকে কি দিই বলো?
প্রতিটি রাত্রিতে তুমিই অবকাশ, ঘুম,
অবচেতনের মুক্তি, পাশে জেগে থাকা।

সবই তো তোমাকে ছুঁয়ে,
দিনগুলি যেমন সূর্যের
—তোমাকে যা দিই—
তাও তোমারই তো, চেয়ে মেগে রাখা।

যেমন বাজাই এক কালেরই বিজয়গান ত্রিকাল তূর্যের

ভালবাসি, সেই কথা তোমাকে বলেছি বহুবার
আকাশ যেমন বলে, আর
মাটি শোনে রৌদ্রে মেঘে,

আর অন্ধকার নিত্যকাল।

তুমিও শিউরে ওঠো, হাওয়ায় হাওয়ায়
বর্ষে বর্ষে মাটির মতন,
সর্বদাই সূর্যে সর্বংসহা॥

জীবনের সঙ্গে প্রেমের এমন অচ্ছেদ্য অন্বয় পরিণত পর্যায়ে কবিকে করে তুলেছে প্রজ্ঞাবান। সে প্রজ্ঞা তাঁকে জীবনের ভাষ্য রচনা করায় 'প্রেমের তৃপ্তি অতৃপ্তি একই দীক্ষা'—দান্তে এবং চণ্ডীদাসের কাব্য নয়—জীবন থেকেই এই সূত্র তিনি সংগ্রহ করেন।

কিন্তু যে অর্থে আমরা প্রকৃতির কবি, জনগণের কবি, প্রেমের কবি—এই সব শ্রেণী বিভাগের প্রয়াস পাই, সে অর্থে বিষ্ণু দে-র কবিতার শ্রেণীভাগ হয় না। আমি এখানে 'প্রেম' শব্দটিকে ব্যবহার করছি এক বৃহৎ গভীর উপলব্ধি অর্থে, যা কবির অন্তর ও বাহিরের জগতের উপর একটা আলো ফেলে, যাতে প্রেমকে মনে হবে প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষাকে মনে হবে সাধনা, সাধনাকে মনে হবে কবিরই প্রণয়-ভাগিনী নারী। তিনিই আকর্ষণ করেছেন কবির বাক্‌ছন্দকে, তাঁর অন্তরঙ্গ আলাপকে, উদাত্ত সাত মাত্রার মাত্রাবৃত্ত তরঙ্গকে, ছমাত্রার ও পাঁচ মাত্রার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে। ওফেলিয়া, ক্রেসিডা মহাশ্বেতা, সুভদ্রা, তাঁর জীবনার্থের প্রতীক বা প্রতিমা হিসাবেই গণনীয়—'আমি যে তোমাকে ভালবাসি সে কি তাই শুধু ওফেলিয়া'। বিরাট বিশ্বগ্রাহী সে প্রেম—তাই তা কখনো রুগ্‌ন রোমান্টিকের ধূসরতায় আচ্ছন্ন হয়নি।

জীবনের সর্বৈব সম্পদ, শিল্প সঙ্গীত ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য, চিত্রকলা, সকল কিছুতেই একজন আধুনিক কবিমানস অনুভব করে নান্দনিক আত্তি। এলিয়ট ও বিষ্ণু দে-র কবিতায় এই নান্দনিক আত্তি কখনো আবহমান অতীতকে অনুভব করায়, কখনো ভবিষ্যৎকে আকর্ষণ করে বিপুল বেগে। যাঁর অতীত ও ভবিষ্যৎ-চেতনা এত সজাগ, তিনিই যথার্থ বর্তমানের রূপটা ধরতে পারেন। সময় তাঁর কাছে নিরবচ্ছিন্ন। তাঁর বেলায় আর সাময়িকতা বলে কিছু থাকে না। সময়ের এই ছন্দই তাঁর কাছে এনে দেয় 'ঘোড়া', 'নদী', 'মেঘ', ইত্যাদির প্রতীক, তারই অনুষঙ্গে সৃষ্ট হয় আর এক কবির প্রিয় প্রতীক 'পথ'। সময় থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে যাত্রার অনুভূতি তা থেকে

উৎসারিত হল ঐসব গতিব্যঞ্জক প্রতীক। অথচ এই পথ কদাচ নিরুদ্দেশ অন্বেষা নয়। খাঁটি ধ্রুপদীর মতোই পথ আর ঘরের বিস্তার আর সমের সম্পর্ককে তিনি মানেন, অথচ সব মিলিয়ে সে কবিতা কী অপ্রতিরোধ্য লিরিকল।

লিরিকল, কিন্তু স্বতোচ্ছ্বসিত হওয়া এ কবিতার যে স্বভাব নয়, তা আমাদের এই স্বল্পভাষী সামান্য ভূমিকা থেকেই স্পষ্ট। তাঁর চিত্রকল্প, প্রতীক, শব্দ, বাগ্‌ভঙ্গীতে উইট্‌-এর দীপ্তি,—ভাবনার তীব্র গতি, ছবি বা স্বপ্নের চকিত পরিবর্তন, চিন্তার বপ্রক্রীড়া—এবং সার্বিক সংবেদিতা আমাদের অনন্য মনোযোগ দাবী করে। বিষ্ণু দে-র কবিতার বিরুদ্ধে দুরূহতার অভিযোগ তোলার আগে ব্যাপারটি স্মরণ রাখি যেন। পাংশু ব্যক্তি-চর্চা নয় রবিক-রোজ্জ্বল নিজদেশের আকাশের মত নৈর্ব্যক্তিকতায় সর্বগ্রাহী হওয়াই কবিতার সাধ্যসাধন। এই সূত্রটি ধারণ করে আমরা বর্তমান গ্রন্থ রচনা করেছি। তাঁর কাব্যে পুরাণ, সময়, শিল্পগুণ ও তাঁর নান্দনিক চেতনাব স্বরূপ খুঁজতে চেয়েছি।

বিষ্ণু দে ও সময়

কোন তাৎপর্যপূর্ণ কবি, মহৎ কবির কবিতায় যে তত্ত্বসংগঠন, জীবনবীক্ষা বা বিশ্ববীক্ষা আমরা পাই, তা কোন বিমূর্ত আকাশলীন ভাবাদর্শ নয়: প্রাণময় ব্যক্তির বাস্তবের মূল থেকেই তা উদ্ভূত এবং এ ব্যক্তি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়। বৃহত্তর সমগ্রের সে অংশ। যে সামাজিক দল বা শ্রেণীর সে অন্তর্ভুক্ত, সেই সামাজিক দলের ইতিহাসই তার জীবনদৃষ্টিকে গড়ে তোলার প্রাথমিক উপাদান। সেই কারণেই অনেক সময় বিশেষ লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের সীমা ছাপিয়ে তাঁর লেখায় সামাজিক শ্রেণীর পিছুটান বা এগিয়ে যাওয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীর অনিবার্য পটভূমিকা থাকে বলেই ঐ কবির জীবনদৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে আসঞ্জনশীল। লুকাচ যাকে বিশ্ববীক্ষা বলেন, সেই বীক্ষা একজন কবির রচনায় আসলে একটি বিশেষ শ্রেণী জগতকে যেভাবে দেখে তারই নিকটতম দৃষ্টি। এই বিশ্ববীক্ষা কোন তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাজাত নয়—একটি শ্রেণীর উৎপত্তি, বিকাশ বা অবক্ষয়ের দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী যাই হোক্, একটি জীবনবীক্ষা থাকলেই একটি সামাজিক দল শ্রেণীপদবাচ্য হতে পারে—কেবল অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নয়। একেই শ্রেণীচেতনা বলা যায়। প্রতিটি শ্রেণীই অতীতে ফিরে যাওয়া, কিংবা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, বা পাল্টানোর জীবনবীক্ষায় স্থিত থাকে: তাঁর শ্রেণীর এই বিশ্বদৃষ্টি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, সমর্থনে বা প্রতিবাদে কবির রচনায় ছায়া ফেলবেই। সময় বা কাল সম্পর্কে কবির ধারণাও এই বিশ্ববীক্ষারাই অন্তর্গত: সময়কে তিনি অতীতের দীর্ঘশ্বাসে, ভবিষ্যতের প্রগতিতে, না বর্তমানের স্থিরবিন্দুর অনৈতিহাসিকতায় ধরবেন, তা যেমন তাঁর ব্যক্তিগত সচেতনতার ওপর নির্ভরশীল, তেমনি ঐ সচেতনতাও নির্ভর করে অনেকটাই কবির শ্রেণীর ইতিহাসের ওপর। আবার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় কবি শ্রেণীর বিশ্ব বিক্ষাকে মেলাতে মেলাতে পারেন নিজ শ্রেণীর অবক্ষয়ে, অন্ধকারের মুহূর্তে অন্যশ্রেণীর জীবনদৃষ্টির সঙ্গে, কিন্তু সে মেলানোতেও নিজ শ্রেণীভিত্তির ধরনটি থেকে যায়। বিষ্ণু দে-র কবিতায় সময় আসে তাঁর দ্বান্দ্বিক চিন্তার সংগ্রামে, শ্রেণীর সীমা ভাঙবার সাহসিক প্রচেষ্টায়, কিন্তু নিজ শ্রেণীর ইতিহাসের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে। তাঁর কবিতায় সময় কিভাবে বারবার আসে একটি ভাবাদর্শের, চিন্তার সঙ্গতিতে, সে প্রসঙ্গে

যাবার আগে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের ইতিহাস একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন।

বিষ্ণু দে-র জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাঁচ বছর আগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০৫ থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তখন সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ১৯১২-য়, ১৯০৯-এ বৃটিশ সরকার সংস্কার ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিভেদ নীতি স্পষ্ট ভাবে, সরকারী-ভাবে ঘোষণা করে। উনিশ শতকের শেষার্ধেই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটে : ভারতবর্ষে আধুনিক অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদি-উদাহরণ এরাই। এরা দেশশাসনে অংশগ্রহণ করতে চায় ও ভারতবর্ষের সংসদীয় স্বায়ত্তশাসনের বিকাশে নিজেদের স্থানকে নিশ্চিত করাই ছিল এই শ্রেণীর শেষ লক্ষ্য। বৃটিশ হুইগ ঐতিহ্যের ধ্যান-ধারণায় এই শ্রেণী জারিত ও বৃটিশ ভারতীয়দের একাংশের সমর্থনপুষ্ট। অন্যদিকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একটি শক্তিশালী অংশ এই বাঙ্গালী, তথা ভারতীয় মধ্যবিত্তর আশাআকাঙ্ক্ষার তীব্র বিরোধী ছিল—যারই পরিণতি ১৯০১-এর বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে শুধু বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চেতনাই নতুন স্তরে পৌঁছল—বস্তুতঃ বাঙ্গালী মধ্যবিত্তর নেতৃত্বে গণআন্দোলন এই প্রথম। সমাজে শ্রেণী-সম্পর্কের তাৎপর্য এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তাবা বুঝতে পারল। এই আন্দোলনেই শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আত্ম-বিশ্বাস অর্জন করল। ১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ রোধ হওযায ও বাংলাদেশ আবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় শ্রেণী হিসাবে এই শ্রেণীর যাথার্থ্য উপলব্ধ হল। এই সাফল্যের পরের ধাপই ছিল শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রেণী কর্তৃত্ব বা হিগেমনি সৃষ্টি করা : তাহলেই ইতিহাস বড় রাস্তায় চলত। কিন্তু ১৯১৩ থেকে ১৯২০-র মধ্যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত তার "ভদ্রলোক" ছাপ ঘোচাতে পারল না, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকই আইনসভার চৌহদ্দিতে কাজ করার সুযোগকেই চরম ভাবল, অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে বেশী বেশী ক্ষমতা পাওযার জন্য সে লালায়িত : যদিও সন্ত্রাসবাদের আগুন তখন জ্বলছে, ১৯০৮-এব বিরাট ধর্মঘট হয়ে গেছে, তিলকের নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ হলেও একটি প্রতিবাদী স্বর শোনা যাচ্ছে। অথচ ঔপনিবেশিক কাঠামো না ভাঙ্গলে যে প্রকৃত ক্ষমতা আসে না, তা তারা অন্ততায় বুঝতে পারল না। ১৯১৬-র ভারতব্যাপী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তখন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনেই

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজ অর্থনৈতিক স্বার্থ ও স্ট্যাটাস বজায় রেখে ব্যাপক গণআন্দোলনের অসুবিধা বুঝেছিল। বুঝেছিল বলেই ভোটাধিকার বাড়ানর প্রস্তাবে তারা সায় দিতে পারে নি। ১৯২১-এ গ্রামের লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর ব্যক্তি যখন নিজ ভোটাধিকার পেল, তখন এই শ্রেণী অপ্রস্তুত, এই ব্যবস্থার বিরোধীও। অর্থাৎ বিশের শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ থেকেই জনগণ সম্পর্কে ভীতি তাদের পেয়ে বসেছিল, যে ক্ষমতা তারা চাইছিল তাতে বিপুল বৃহত্তর জনসাধারণের অংশ গ্রহণে, নিজ বিশ্ববীক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থেই তারা অনিচ্ছুক ছিল : ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণকারী এই ভদ্রলোক শ্রেণী তার ইংলণ্ডীয় ঔপনিবেশিক তথাকথিত ভদ্রতা, আদবকায়দা, পোশাক ইত্যাদিতে দেশের অধিকাংশ জনসাধারণকে অচ্ছুৎই ভেবেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণী হিস বে সঙ্কটের মূল এখানেই। সংসদীয় স্বায়ত্তশাসনে অংশ গ্রহণের জন্যই তাদের অচেনা-অজানা, গ্রাম সম্পর্কে যাদের কমবেশী তারা শোষণ করে সেই কৃষক সম্প্রদায়ের সামনেই তাদের দাঁড়াতে হল : একদিকে হিগেমনি সৃষ্টির ব্যর্থতা, অন্যদিকে সংসদীয় রাজনীতির এই ভীতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উভয় সঙ্কটে ফেলল। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের, ধর্মীয় প্রতীকাশ্রয়ী বিশ্ববীক্ষা ও রাজনীতি এ অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবশালী হয়ে উঠতে লাগল। ১৯২৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আরও কানাগলির দিকে ঠেলে দিল। সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে রোধ করার মত বঙ্গভঙ্গ-যুগের প্রাণময়তা এই শ্রেণী ইতিমধ্যে হারিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের রাখী বন্ধনের উদার ক্ষেত্র অপসৃত, স্বপ্ন ভাঙছে, আর ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আগমনে অসহযোগ আন্দোলনে তখন এই জনগণই জাতীয় আন্দোলনে এগিয়ে আসছে, তার পরিণতি বা চরিত্র যাই হোক। আর এই আন্দোলনও কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষার আসঙ্গনে ধৃত নয় : দলগত শৃঙ্খলায় ধৃত একটি বিভিন্ন উপাদান সম্বলিত, তাত্ত্বিকভাবে শিথিল এই আন্দোলন। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত এই সঙ্কটের সমাধানের জন্যই মধ্যবিত্তেরই মুষ্টিমেয় এক অংশ আকৃষ্ট হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বিশ্ববীক্ষায়। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে যে দূরত্ব, শহর-গ্রামের মধ্যে যে সংযোগহীনতা তাই ভাঙবার চেষ্টা করছে এই দল। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখানে তখন মুমূর্ষু। পঞ্চাশের মন্বন্তর, ৪৭-এর দেশবিভাগ ১৯২১ থেকেই বাঙ্গালী মধ্যবিত্তর যে স্বপ্ন, তা ভঙ্গ সম্পূর্ণ করল। অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারতছাড়ো আন্দোলনের

তরঙ্গে বা নানা ধর্মঘট, সাম্যবাদী প্রচেষ্টায়, এমন কি সন্ত্রাসবাদে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্তের বিপুল সংখ্যা অংশ-গ্রহণ করছে : কিন্তু কোন ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব-বীক্ষা ছাড়াই, খানিকটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগতভাবে বা দল হিসাবে। প্রক্রিয়াটি দ্বিমুখী : একদিকে শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্তর ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ইতিহাসে দ্বান্দ্বিক বিকাশের তত্ত্ব শিকড় ছড়াতে চাইছে মধ্যবিত্ত মানসে, হিগেমনি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, কিন্তু তা ব্যর্থই হচ্ছে, কারণ শ্রেণী হিসাবে এই শ্রেণীর তখন জীবনীশক্তি নেই। প্রথমটির করুণ ঔপনিবেশিক আত্মসমর্পণে কোন ট্র্যাজেডি নেই, কিন্তু দ্বিতীয়টির বারবার ব্যর্থ হওয়া ট্র্যাজিক। ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বই এখানে যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যর জন্য সংগ্রাম, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ তা ত্যাগ করতে পারছে না, সংগ্রাম ছাড়তে পারে না, অথচ লক্ষ্য সিদ্ধ হওয়ার ব্যর্থতাও প্রকট। আবার যে বৈপ্লাবিক কর্মকাণ্ডে দ্বন্দ্ব হয়ে উঠতে পারে চূড়াস্পর্শী, তা এখনও বাস্তব নয় ; এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামগ্রিক বিনাশ ছাড়া বোধহয় এই লক্ষ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই সামগ্রিক ভাঙ্গনের পটে মধ্যবিত্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার ব্যর্থতা সম্পর্কে ট্র্যাজিক বিশ্ববীক্ষার বিষ্ণু দে-র কবিতা হয়ে ওঠে রূপক, প্রতীক—সময় তাঁর কবিতায় আসে এই বিশ্ববীক্ষার সূত্রে। আবার ট্র্যাজিক বীক্ষায় জগৎ পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন থাকে না, কিন্তু বিষ্ণু দে-র ট্র্যাজিক দৃষ্টি যেহেতু শ্রেণীভিত্তিক ও বৈপ্লবিক, শ্রেণী তথা দেশই তার নায়ক, সেহেতু এ বিশ্ববীক্ষায় পরিবর্তনের প্রশ্ন থাকে। সেটি এখনও স্বপ্ননির্মাণই হয়তো, তবে সামগ্রিক ভাঙ্গনের পটে ঐ প্রকৃতি-প্রেম সময়কালের জীবন-নির্ভর স্বপ্নই সঞ্জীবনীমন্ত্রের মত মূল্যবান।

উনিশের শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয়ের প্রথম পর্বেই কয়েকজন ব্যক্তির আত্ম-সচেতনতায় ও তাদের আশ্রয় করে যে ব্যাপ্তি দেখা দিয়েছিল, তার টানে সময় স্রোতবান হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত বীরত্বে ও সাহসে, যে-ভাবেই ধরা যাক মধ্যবিত্তর একটি অংশ আলো ছড়িয়েছিল নানাভাবে। লিখিত ভাষা মুখের ভাষায় নতুন ব্যাপ্তি-মাত্রা আনায়, শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সচেতন কর্মে বা সীমাবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামাজিক বোধের ও নীতির উজ্জীবনে কলকাতাকেন্দ্রিক এই বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু তখনও সংসদীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতালাভের বিশ শতকের প্রথম পর্বীয় স্বপ্ন থেকে অনেক দূরে। দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা, এই দুয়ের পরিচয়ই বিদ্যাসাগর,

রামমোহন, অক্ষয়দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ রেখেছিলেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যে আস্তিক্যবোধে বা নৈতিকমূল্য বোধে নিজেকে বেঁধেছিল, তা মূলতঃ এ'দেরই কর্মৈষণার আলোকে—অবশ্য ১৮৯০-এর দশকেই এই পর্ব চলে গিয়ে মধ্যবিত্ত প্রচেষ্টা ক্রমশঃ সামাজিক দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে সংসদীয় স্বায়ত্তশাসনের চোরাবালিমুখী হয়—এক রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার স্বয়ম্ভর বিকাশের 'তবু শূন্য শূন্য নয়ের' অসমসাহসিক প্রতিরোধ—ব্যক্তিগত সংগ্রামই আলো জ্বালিয়ে রাখে। বিষ্ণু দে তাঁর সময়ের স্মৃতির ঐশ্বর্যে এই যুগের কীর্তিকে নিশ্চয়ই মনে রাখেন : এই সময়ের ভগ্নস্তূপে তাই তিনি বারবার স্মৃতির প্রসঙ্গ আনেন, অতীত-বর্তমানের সংযোগের সূত্রেই বা বিষঙ্গের তুলনায়। কিন্তু বিষ্ণু দে-র ভবিষ্যৎমুখী চিন্তায়, স্বপ্নে সেই স্মৃতি মেশে আগামীতে :

আমার স্মৃতির মর্মে আহত বধির প্রতিভার
অবাক মনের অগোচর
তবু শ্রুতিধর সমগ্র সত্তার দুর্নিবার আনন্দ সঙ্গীত।
কলকাতার নিশুতি ঘুমের মধ্যে ঘর মুখোর টানে
রাত্রির মায়ায় শুদ্ধ প্রশস্ত উদার পথে
জীবনের সচ্ছল ময়দানে
নিস্তব্ধ বাড়ীর ছায়া পাশে ফেলে,
মনে হল চলে গেছি অথবা এসেছি
ঘরমুখো টানে নেই কালে,
যেখানে সমস্ত আণবিক অতীতের স্বপ্ন মিশে যায়,
সেই দেশে যেদেশে সম্ভত এ দেশের পৃথিবীর
দীর্ঘ ইতিহাস,
আমাদের হৃদয়ের গ্রানিটে যে গান
ইতিহাস গড়েছে ভাস্কর সত্তায় সত্তায় মানবিক
সংলগ্ন অথচ অন্তহীন আমাদের ভবিষ্যতে।

(শতমুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়/
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ।)

এ দেশের, ভারতবর্ষের, পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়ের বিকাশই এই সময়ের যাত্রায় ভবিষ্যৎমুখী কল্পনায় মিলে যায়। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের

ত্রিভুজ আকাশেই বিষ্ণু দে-র সময় চেতনা দাঁড়ায়। কাব্যজীবনের প্রথম পর্বেই বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন—'সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে।' জানেন, "এখন সাপের বাসা ঐশ্বর্যের গৌরব গৌড়। কিম্বা যতেপুর কিম্বা হরপ্পার বিস্তীর্ণ প্রাসাদ। ভূমিসাৎ ভগ্নস্তূপ।" কিন্তু সময়ের থলির চিত্রকল্পটি ভেঙ্গে যায় যাত্রায় নদীর স্রোতস্বিনীতে,—'দেশকাল এনেছি মাটিতে বাহুতে মুঠিতে প্রত্যক্ষ ভাস্বর।' বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমান ইতিহাস জেনেও রাশি রাশি বেলমল্লিকায় বিহ্বল আজ কালেরই বাগান দেখেন। অন্বিষ্ট কাব্যগ্রন্থে কালের বাগান চিত্রকল্পটি কয়েকবারই আসে : এলসিনোরেতে "কালের বাগানে মিনতি আমার শোনো।" সময়ের থলি, কালের বাগানের ব্যাপ্তিতে পৌঁছে গেছে। আর কালের বাগানই আরও গতি পায় কবি যখন বলেন, 'শতমুখনদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়ে' : 'ব্যক্তির বয়স বাড়ে দিনে দিনে বছরে বছরে। পৃথিবীর আকাশের সময়ের পরিক্রমা দীর্ঘায়িত থেকে যায়।' অবশ্য আজ দেখছেন, নিজেরই মতন আকাশ জরিষ্ণু সাদা। অর্থাৎ যে ট্র্যাজিক ব্যর্থতার কথা আগে বলা হয়েছে, সেটিই সময়ের বোধে কবি দেখেন। বলেন, 'মনে হয় মানুষের আশা নেই। এই দেশে ভাষা নেই সাধারণ মানুষের।' কারণ ইতিহাসের,

> উৎস লুপ্ত। সে কোন্ শতকে আলালের ঘরে জন্ম।
> সুয়োরাণী দূর স্বপ্ন আজকে, সৎমা বলে না দুলাল,
> পলাশীর ঘোর কেটে গেছে কবে, যন্ত্রণা আজ তন্ময়
> শূন্য আকাশে, উড়ে চলে গেছে বুলবুল।
>
> (দিনগুলি রাতগুলি/নাম রেখেছি কোমল গান্ধার।)

অথচ আশাও মরে না, "না আমার মনে হয় আশা আছে। এদেশেও হবে জানি এদেশেই আমাদের রাত্রি হবে ভোর।" আপন সময়ের আকাঙ্ক্ষা যে বারবার ভেঙ্গে যাচ্ছে, পরিবেশের দেশজ ভগ্নস্তূপে, এটি শুধু ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়। দেশেরই ট্র্যাজেডি, আর এই ট্র্যাজেডির ঐ আশা, ভোরের স্বপ্ন। বিষ্ণু দে যে বারবার স্রোতের, যাত্রার চিত্রকল্প নিয়ে আসেন, তার কারণই হল ভবিষ্যতের আবেগে কাটাতে চান বর্তমানের নরককে : অতীতের দীর্ঘশ্বাসে নয়, নয় স্থিরবিন্দুর স্থানুকেন্দ্রে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের দীর্ঘ-বিকাশে, হয়ে ওঠায়, আপনসত্তা, মানুষ-প্রকৃতির ঐকতানে তিনি বাঁধতে চান সময়কে। "আমাদের স্থান আর কাল। আমরা রচনা করি হাতে।"

আমাদের বিরাট সময়
বিশ্বগ্রাহী তাই কৌতূহল,
আমাদের উপমেয় নদী,
স্রোতে স্রোতে চলে নিরবধি। ..
আমাদের স্থান আর কাল
আজ শুধু সন্ধ্যাসকাল
ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে
দেখ আছি আমরাই দূরে।
তোমাদের নৃত্যের নূপুরে
বুক পেতে কারা দেয় তাল
দেখো চেয়ে কালের মুকুরে।

('অন্বিষ্ট'/অন্বিষ্ট)

সময়ের জটিল স্রোতকে ধরতে চান বলেই বিষ্ণু দে বারবার সংহত বিস্তৃত কবিতার পরিসরে যান: বিভিন্ন ছন্দের অর্কেস্ট্রায় সময়ের আশা-নিরাশা, নরক-স্বর্গ, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ঐকতানে কালের ভেরী শোনেন। কেমন করে সময়কে নির্দিষ্ট কবিতার গঠনে তিনি ধরেন, তা 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ' নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতাটির বিশ্লেষণেই বোঝা যায়। কবিতাটি আরম্ভ হচ্ছে এই ভাবে:

তোমরা নবীন, এ উদাস
বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা?
স্মৃতি হানে আদি মহীদাস,
ভূমিদাস স্মৃতির যন্ত্রণা
আমাদের চৈতন্যে আকাশ।

এই স্তবকে 'উদাস', 'বিষাদ', 'ভূমিদাস', 'স্মৃতির যন্ত্রণা' উল্লেখযোগ্য শব্দাবলী।* ক্রেসিডার শেষ লাইন "স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি"র হানে শব্দটি আরও ব্যাপকভাবে এল, তৃতীয় ছত্রে। বর্তমানের উদাস বিষাদে প্রায় মৌলিক স্মৃতির যন্ত্রণাই চৈতন্যে আকাশ। কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে

*মহীদাস শব্দটিতে পৃথিবী যেমন আভাসিত, তেমনি ভূমি দেবতার বরে ইতরার পুত্র ঐতরেয় মহিদাসের ব্রাহ্মণ্যকাণ্ডের পৌরাণিক কিংবদন্তীও স্মরণীয়।

স্মৃতি শব্দটি ঘুরে এল, প্রবাস শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হল। বর্তমানের যা আবার ভবিষ্যতেরও, সংযোগ সম্পর্কে সংশয় থেকেই এল প্রথম তিন স্তবকের পাঁচটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন—চতুর্থ স্তবকের শেষে যেন এই সংশয় কাটে, নবীনদের উদ্দেশ্যে হার্দস্বরে বলতে পারেন, "তবু জেনো, আমরাই চেনা।"

সংযোগের এই ভূমিকাটুকু করেই, কিংবা বলা যায় স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যতের মূল ধরতাইটুকু দিয়েই কবিতাটির দ্বিতীয় পর্বে কবি চলে আসেন বর্তমানের বর্ণনার চিত্রকল্পে : ব্রেখটের "অ্যাস্ফল্টের জঙ্গলের" মতই তিনি এখানে দেখেন :

জিরাফ তুলেছে যেন গলা কিংবা এক টিরানোসরাস,
আশেপাশে জলহস্তী, কুমীর, গোখ্‌রা, হায়েনা, শেয়াল
পেতেছে দপ্তর গদী গোমস্তা ফরাস খাসা,
বেখাপ্পা বেয়াড়া বিশ্রী
কলকাতার কপালের গেরো।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় অরণ্য ও অন্ধকার বিষ্ণু দে-র কাছে নঞর্থক নয়, বরঞ্চ জীবন-সংলগ্ন। সেই অন্ধকারই তিনি চান :

থেকেছি সে অন্ধকারে, সেই অন্ধকার চাই শরীরে, হৃদয়ে;
সেই বনে হিংস্রতাও স্বাভাবিক সৃষ্টিময়, মধুর দয়াল,
মৃত্যু নয় দীনহীন, আপতিক, নয় সামাজিক ভয়ে
অথবা হাজার জন্তুর দন্তুর নখী মানবিক শোষণে ভয়াল।
(সেই অন্ধকার চাই।)

কিন্তু, এ অরণ্য নয়, জন্তুগুলোর চিত্রকল্পেই কবি জানিয়ে দেন এ জঙ্গল পাটোয়ারী ধূর্ততার, মনুষ্যত্বনাশক, চরিত্রহীন।

আলোচ্য কবিতার পরের স্তবকেই বর্তমানের সূত্র ধরে অতীতে চলে যান : এ যেন সেই তন্ময় গায়কের সঙ্গীতের মত, সুরে সুরে গেঁথে নিচ্ছেন জটিল গঠনটি, বিভিন্ন স্বরের সমন্বয়ে বিস্তার করছেন তাঁর রাগটি। ঔপনিবেশিক বিকাশের যুগের সীমা, পঙ্গুতা, অদ্ভুতত্ব প্রকাশ করেন স্থাপত্যের চিত্রকল্পে; এইদিকে নকল গথিক ঐদিকে কবিন্থীআয়ন ডোরীয়। কে'লসনের ইংরেজী খেয়াল। তবু উনিশের শতকেই যা কিছু আবেগ, বুদ্ধি সামাজিক দায় দায়বদ্ধতার পলি পড়েছিল মধ্যবিত্ত ইতিহাসে :

সরু ফালি কলকাতার জোলোমাটি দিয়েছিল তবু কিছু রস, কিছু রৌদ্র

শচীশকে বিনয়কে তবু গোরা আরো বহু স্বদেশী ছেলেরা
কলকাতাকে চিনেছিল, সুস্থ হতে চেয়েছিল সম্পূর্ণ স্ববশ।

পরের স্তবকে আবার কবি বর্তমানে চলে আসেন: অতীত-বর্তমানের দোলায় টেন্‌শনে কবিতা এগোয় : গায়কের মতই টেন্‌শন ও রেজোলিউশনের মূলনীতি ধরে কবি চলছেন। "আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার। আর অন্য দিকে নাটুকে প্রলাপ নির্বোধ নিষ্ঠুর অমানুষিক অভদ্র।" অতীত-বর্তমানের টেন্‌শনকে কবি দাঁড় করান এই স্তবকেরই শেষ তিন ছত্রের প্রার্থনায় :

রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্য আকাশ
এই নিত্য অপঘাত দূর করো,
এর চেয়ে দক্ষিণে এনে দাও সালানপুরের যুগান্তের ভূশণ্ডী প্রান্তর।

কবিতাটির তৃতীয় পর্বে আবার জন্তু-সরীসৃপের চিত্রকল্প ফিরে আসে। সেই অন্ধকার চাই-য়ের তৃতীয় স্তবকের, "বহু জন্তু সরীসৃপ কাজ করে, করে বিকিকিনি," বা শেষ স্তবকের আমাদের উদ্ধত হিংস্রতাও স্বাভাবিকের সূত্রে ফিরে আসে। ঘৃণা যে কেবল নঞর্থক নয়, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকবিকাশে অনেক সময় পবিত্র ঘৃণাই যে আনতে পারে জীবনের উদ্ভাস, কারণ ন্যায্য ঘৃণা তো আসলে ভালোবাসারই অন্য নাম ; অন্যায়ের প্রতিবাদে দ্বান্দ্বিকচিন্তায় বিশ্বাসী কবি ন্যায্যতই তা মানেন। কিন্তু ঘৃণা করবেন কাকে : ঐ সাপ বিছা, জোঁকদের ?

ঘৃণার পাতা হাওয়ায় ঝরে. ঘৃণার মাটি প্রখর ভালবাসা
সেই শিকড়ে জীবন বাঁধি, তাই—
মানুষ তো ছার, সিংহও নয়, মানব কাকে, শিরদাঁড়া নেই,
দেবনা ওকে ঘৃণারও অভিশাপ।

দ্বিতীয় পর্বে পয়ারে ইতিহাসবীক্ষা, অতীত-বর্তমানের যাতায়াত এসেছিল স্বচ্ছন্দে, তৃতীয় স্বরবৃত্তে তার চাল পালটান। ব্যঙ্গ এবং ঘৃণা চমকে ওঠে এই ছন্দে। চতুর্দিকের চরিত্রহীনতার প্রতি তীব্র অবজ্ঞা এই ছন্দেই প্রকাশ পায় অনায়াসে।

কবিতাটির চতুর্থ পর্ব আরম্ভ হল "এ নরকে"। 'শতমুখী নদ খাড়ি'র 'মনে হয় মানুষের আশা নেই', প্রায় আক্ষরিক ভাবে ঘুরে এল, এই কবিতায়। বিষ্ণু দে-র নরক প্রসঙ্গে দান্তে অবশ্যই স্মরণীয়—কারণ জীবনবীক্ষার এমন সমগ্রতা খুব কম কবিতেই পাওয়া যায়, নরক-পুরগাত্তোরিও—

পারাদিসোর সামগ্রিক অভিযান, উত্তরণই বিষ্ণু দে-র বৈপ্লবিক ট্র্যাজিক বীক্ষাকে প্রচলিত ট্র্যাজেডির শেষ বিনাশের পরিণতি থেকে বাঁচায়। তাছাড়া এরিক অয়ারবাখ যেমন বলেন, দান্তের মহাকাব্যেই প্রথম বোধ হয় ব্যক্তি এল দূরের কিংবদন্তীর নায়ক হিসাবে নয়, নয় একটি নৈতিক আদর্শের বিমূর্ত উদাহরণের প্রাণহীনতায়, ব্যক্তি এল তার প্রত্যক্ষ প্রাণময় ঐতিহাসিক বাস্তবতা সমেত তার সমগ্রতার ঐক্যকে নিয়ে। এখানে বিষয়ে ঐক্যেই বিষয়ীর তাত্ত্বিক ঐক্য মিলে যায়। শুধু তাই নয়, বাইরের চার্চ ও সাম্রাজ্যের দুর্নীতি তাঁর ইটালীর অসহনীয় দীর্ণতা ও চরিত্রহীনতা, ভেতরে সত্তার সংকটের পটেই দান্তের নরক আসে। ডিভাইন কমেডির প্রথমেই যাত্রার উপমাটি আসে, তাতেই এই নরক উত্তরণের, শুদ্ধতায় আত্মজ্ঞানের পথে, বহুস্তরে তাৎপর্যপূর্ণ পুরগাতোরিওতে উত্তরণের দীর্ঘ পরিক্রমা আভাসিত হয়। যদি একটু উদারতা নিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে এযাত্রা শুধু ব্যক্তির নয়, ইতিহাসের: এই যাত্রার চিত্রকল্পটি যে বিষ্ণু দে বারবার ব্যবহার করেন সেকথা আমরা আগেই বলেছি। দান্তের এই যাত্রার উপমাতেই ছায়া ফেলে ঈনিয়স ও পলের কিংবদন্তীর যাত্রা। অন্য জগতে এই যাত্রার রূপকের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রাগৈতিহাসিক বীরদের যাত্রা, যাতে থাকে rites de passage, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানা স্তর আভাসিত সেরিমনিস অব ইনি শয়েশনে। আদি ট্রাইবের জ্ঞানে, প্রজ্ঞাতেই ডিভাইন কমেডির ইনিশিয়েশন। বিষ্ণু দে তাঁর যাত্রার চিত্রকল্পেও সময় সম্পর্কে, এই লোকজ ইতিহাসের আদিম শক্তিটি ধরে রাখেন, যাত্রার উপমাটিকে বহুভাবে ব্যবহার করে জীবনের সময়ের অবিরত চলার, গভীরতর অর্থে অন্বিত হওয়ার কথা বলেন। তবে দান্তের স্বপ্নে মৃত্যুান্তরের পুরগাতোরিও যতটা বাস্তবময় ছিল, বিষ্ণু দে-র কাছে তা হতে পারে না। বিয়াত্রিচের সেই ব্যক্তিগত শুদ্ধতার অবলম্বনের মত ক্রেসিডা-ওফেলিয়া-মহাশ্বেতার অবলম্বন-আশ্রয়ও নিঃশেষিত। এর থেকে বড় কথা দান্তে নরকের দাহ দেখেছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু দে তাঁর চারপাশে যা দেখেন তাতে নরকও নেই, আছে তার বিকার— এখানে কান্নাই মৃত, চৈতন্যে মড়ক। তাই অন্বিষ্টে 'নরকের পরে এ রচনা' বলে জানিয়েছিলেন তা সময়ের ক্রূরতায় এই প্রার্থনায় ফিরে গেল: "নরকের দাহ দাও নরকের আত্মগ্লানি হে যম জীবন। অশ্রু দাও প্রাসাদে প্রাসাদে বসতিতে মজ্জায় মজ্জায় অবসাদে। যন্ত্রণার বাণী দাও মর্মে দাও সজল

শিকড় ফুলে ফলে শাখায় পল্লবে।"

দ্বিতীয় পর্বের সূর্যের প্রার্থনার পর যেমন স্বরবৃত্তের উৎক্ষেপ আসে, তেমনি এই প্রার্থনার পর প্রথম পর্বের নবীনেরা ফিরে আসে সাতমাত্রার দোলায়, রাজার মেয়ে রাজার ছেলের আধুনিক রূপকথা। মনে পড়ে অন্বিষ্টের সেই বন্দিনী রাজকন্যার কথা : কিন্তু এখানে রূপকথাটি আপিস, পার্ক ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে রূপকথার পরিবেশ থেকে বর্তমানে এসেছে আরও প্রত্যক্ষভাবে, কারণ 'অন্বিষ্টে' যে নরকের পরের কথা কবি বলেছিলেন, দেখলেন, আসলে নরকই নেই, আছে শুধু মুমূর্ষু বিকার। আধুনিক রাজার ছেলে মেয়ের [গ্রামসীর আধুনিক রাজপুত্রর] ভবিষ্যতেই বর্তমানের বিকার কাটবে :

এরা যে ভালবাসে, তাই তো ঘৃণাতে
আগুনে জ্বালে দেহমন।
এদের অভাবের অগ্নিবীণাতে
জীবন পেল যৌবন।

আর উত্তরণের এই উজ্জীবনের স্বপ্নেই কবিতাটির পরের পর্বে ভবিষ্যতের জ্ঞান ও বাস্তবে এক বিন্যস্ত জীবনের কর্মের প্রাণীন ক্লান্তির কথা কবি বলেন : কবিতাটির চালে ঐ রাজার ছেলে রাজার মেয়ের ভালবাসা-ঘৃণা-অগ্নিবীণার টানেই 'ক্লান্তিতে কিসের ভয় ?' —এর স্রোতসঞ্চারের দোলা লাগে। এখানে আবার সেই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টি : ক্লান্তি এখানে জীবনের বিপরীত নয়, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভুর' ক্লান্তি নয় ;

ক্লান্ত হব দিনের কিনারে,
কলঘরের কাজ তুরপুণ র‍্যাদার কিংবা তাঁতের
মিহি, মোটা হাতের সন্তোষ
সম্পূর্ণ দিনের ক্লান্তি···
আদিগন্ত মাঠে ট্রাকটরের দীর্ঘ অভিসারে
মাটির যেমন ক্লান্তি আসন্ন ফসলে
সেই ক্লান্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত, মহাশয়।

সময় এখানে সঙ্গীতের মূল রাগের মত কবিতাটির ঐক্য বজে আছে। বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীতের কাটাকুটিতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কবিতাটির

কোন ঐক্য নেই ঃ যেমন ওফেলিয়া, ক্রেসিডাকে মনে হয়। কিন্তু ওফেলিয়া-ক্রেসিডার চালটি ছিল দ্রুত, এখানে চালটি একটি পর্বের সমগ্রতায় ধীর, কিন্তু সময়ের ঐ চেতনায় ঐক্যে সংহত। 'ওরে ভাই। চাই সেই ক্লান্ত অবসরে'র আকুলতার পরই গদ্যের ঢঙে বলে ওঠেন কবি কবিতাটির সপ্তম-পর্বে ঃ রবীন্দ্রনাথের গল্প সবাই জানেন। রবীন্দ্রনাথের রূপকেই বিষ্ণু দে দেখেন আমাদের জীবনের ছবি ঃ সব কিছু প্রস্তুত, বরযাত্রীও এসে গেছে (তবে, "হয়তো বা ওরা বরযাত্রী নয়/সব বরযাত্রী নয়। ওই ভিড়ে আছে চোর, জুয়াচোর গণ্যমান্য অথবা নগণ্য/ভিখারীও নানান রকম, কেউ বাবু, কেউবা সাহেব/আত্মার দুয়ারে মনের রাস্তায়/সমাজের আস্তাকুঁড়-সাফাই লরীতে সত্তার ভিখারী") এই রূপকটি, এর আগেও ব্যবহার করেছেন কবি ঃ

এ যেন বিরাট এক বিবাহ সভার আড়ম্বর—
শুধু নেই বধূ, নেই, সে গিয়েছে আউষের বিলে,
বর নেই, বর কোথা জগদ্দলে মুণিষ মিছিলে—
শূন্য রথযাত্রা ঈদ, শূন্য যেন বিবাহ বাসর।

(রথযাত্রা ঈদ্ মুবারকে।)

তবে বরকে সত্তার প্রতীকে ভাবা, বা সর্বদেশব্যাপী পটভূমিকায় কেন্দ্রে স্থাপন করা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারের', এই কবিটাটিতে ছিল না। বিচ্ছিন্নতা, অভিজ্ঞানহীনতা, সত্তাহীনতা প্রসঙ্গ আসে সময়ের ঐতিহাসিক পটে আর এ প্রশ্ন এর আগেও বিষ্ণু দে-র কবিতায় এসেছে অন্বিষ্ট পর্বে ঃ বর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয়। নরকের ব্যঙ্গ-চিত্রের সময়হীনতার সূত্রেই, স্থানু বদ্ধতার, ইতিহাসহীনতার টানেই এল সত্তাহীনতার প্রশ্ন ঃ বিষ্ণু দে-র কাছে সত্তা কোন ভাববাদী নির্দিষ্ট বিমূর্ত সারসত্তা নয়, তা মানুষ প্রকৃতির অর্কেস্ট্রায় হয়ে ওঠার ব্যাপার। আর এই হয়ে ওঠায় দেশের মত কাল, সময়ও একটি বড় উপাদান। মাটিতে রৌদ্রে জলে শিকড়ে শাখায়—এই সত্তার মূল নিহিত। ব্যক্তিতে, সমাজে, দেশে রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপমা-রূপকের বহুমুখী বিস্তার কবি জানান প্রায় আলাপের ভাষায়। অন্বিষ্ট, জলদাও—এলসিনোরের কালের বাগানের চিত্রকল্পটি আবার ফিরে আসে।

দেশ, ভাবো, সুজলা সুফলা এই মলয়শীতলা মাতা দেশ,
ছিন্ন ভিন্ন, অথচ প্রাচীন পরিচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী

প্রজ্ঞায় সংহত স্মৃতির শিকড়ে ধন্য কালের বাগানে।

ফিরে আসে লালনীল কমল, ফিরে আসে স্মৃতি : বিধবার দেশে অরক্ষণীয়ার সুন্দরীর বর নেই, সত্তা নেই। অন্বিষ্টের বন্দিনী রাজকন্যা, বিধবা-অরক্ষণীয়ার রূপান্তরিত সমগ্র দেশেই এই উপমায় বিধৃত। ইতিহাসের বিকাশকেই কবি ব্যাখ্যা করেন, এই সত্তার স্বপ্নের সূত্রে—যে সত্তার স্বপ্ন দেখে মানবসভ্যতা চিরকাল আদিম গোষ্ঠীর যুগ থেকে সাম্রাজ্য অবধি। সত্তার সূত্রেই, বস্তুতঃ ভবিষ্যতের অন্বেষণের সংগ্রামেই কবি অতীতের লোভের, আত্মাভিমানে চলে যান : সত্তা সংকট, সংহত সত্তার যন্ত্রণার বিকারেই আসে নাৎসি দুঃস্বপ্ন, এরই লোভে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের বৃটিশ কল্পতরু।

আমাদের ট্রাজেডি আরও ভয়াবহ : আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে। এই জ্ঞানই তো সত্তা আবিষ্কারী, আর এই জ্ঞান নেই বলেই, বিবাহ সভার প্রচ্ছন্ন নরকে বর নেই। কিন্তু এখানেই কবির ভবিষ্যৎ-মুখী সময় চেতনা থামতে পারে না, তাই কবিতাটির শেষ চার লাইনের সমাপ্তিতে, তাঁর উত্তরণের ইঙ্গিত আনেন :

অথচ রাজার মেয়ে এবং রাজার ছেলে নরকের দেউড়িতে
রাস্তায় প্রস্তুত আছে স্বাগতের প্রতীক্ষায়,
শুধু স্বভাবে প্রতিষ্ঠা চায় প্রতিবাদে
প্রাণ মান চায় বরাভয়, তারাই যে বরকনে।

কবিতাটির পঞ্চম পর্বে রাজার ছেলে-মেয়ের পুনরায় প্রত্যাবর্তন ঘটে দুর্জয় আশায়, ভবিষ্যতের, সময়ের বিস্তারে।

বিষ্ণু-দে-র দীর্ঘ কবিতাগুলিতে সঙ্গীতের মুভমেন্ট ব্যবহার একটি উল্লেখ-যোগ্য দিক। বস্তুতঃ এর সঙ্গে কিন্তু লিরিক কবিতার সাদৃশ্য কম। এ ক্ষেত্রে এলিঅটের দি ম্যুজিক অব পোয়েট্রি-ম্যুজিকাল পোয়েমের ধারণাও খুব বেশী সাহায্য করে না। শব্দ ব্যবহারে কেমন করে সঙ্গীত আসে, সেটি বুঝতে এলিঅটের প্রবন্ধটি অবশ্যই কাজ দেয় : পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শব্দগুলির সম্পর্কেই, বিভিন্ন অর্থের কনটেক্‌স্‌ট—অ্যাসোসিয়শনেই শব্দের সঙ্গীত আসে। কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিতায় সঙ্গীত কেবল শব্দের নয়, সমগ্র কবিতার গঠনেই এই সঙ্গীত আসে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দীর্ঘ বিস্তার বা সংহতি বা পাশ্চাত্য ফুগের জটিল বিন্যাসই তার দীর্ঘ কবিতাগুলিকে ঐক্য

এনে দেয়। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের দীর্ঘ বিস্তারে দেখা যায় সঙ্গীতের নোটের পর একটা বিরতির মতই পর্বে পর্বে বিরতির স্পেস : ফুগের মতই দুটি থীম কবিতাটিতে প্রায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সুরের মিশ্রণে বিকাশিত হয়েছে। যে কন্ট্রাপুনটাল স্ট্রাকচার ফুগের বৈশিষ্ট্য, আমাদের পর্বে পর্বে ভাগ করে কবিতাটির বিশ্লেষণে নিশ্চয়ই তা স্পষ্ট হয়েছে। ফুগে যে প্রথম ভয়েসটিতে বিষয়টি জানান হয়, তেমনি স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যতের প্রথম পর্বেই আজন্ম প্রবাসী, স্বদেশী স্মৃতি, অনাত্মীয় নব্য প্রতিভাস – বিভিন্ন শব্দাবলীতে ও নবীনদের উদ্দেশ্যে কথা বলায় মূল বিষয়টি উত্থাপিত হল। দ্বিতীয় ভয়েসটি এল এরই সূত্র ধরে অতীতের স্মৃতিতে বর্তমানের ক্লিষ্টতায়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে 'প্রাণ খুলে যে করব ঘৃণা'-থেকে 'কালবৈশাখীর আন্দোলিত রবে' পর্যন্ত প্রথম দুটি স্বরেরই অংশের বিস্তারে। ষষ্ঠ পর্বে আর একটি স্বর শোনা যায়— তারপরই সপ্তম পর্বে কবিতাটির দ্বিতীয় থীমটি আসে—সত্তা সংকটের থীমটি। মাঝখানে ফুগের মত মূল বিষয়ের অংশ হিসাবে রাজার ছেলে—রাজার মেয়ের এপিসোডটি। এই এপিসোডটিই কবিতার বিকাশে সহায়ক হয় : শেষের ছ-লাইনের স্ট্রেটো এপিসোডটির সাহায্যেই গঠিত। একাধিক মেলোডির মত একাধিক সুর একাধিক তালে কবিতাটিতে আছে। কোন কোন ফুগের মতই কবিতাটি ক্রমোন্মচন ভয়েসের ১, ২, ৩, ৪-এর নির্ধারিত-ভাবে হয়নি, বিষয়টিকে ধরিয়ে দেবার জন্য একটু আপাত-বিশৃঙ্খলায় আসে হয়ত ২, ১, ৪, ৩-এ বা অন্যভাবে। কবিতাটির বন্দীশে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাদী-সংবাদী স্বরের স্থাপত্য কেমনভাবে গড়ে ওঠে, তাও স্পষ্ট বিশ্লেষণ করতে পারেন সঙ্গীতজ্ঞ। বিষ্ণু দে-র দীর্ঘকবিতা আসলে সঙ্গীতের মতই স্বর ও সময়ের প্রাণময় স্থাপত্য। সেই কারণেই তাঁর কবিতায় স্বরের যে উঠানামা, তা কেবল শব্দনির্ভর নয়, কারণ তাঁর আলাপের যে কথ্য চাল তার সঙ্গীত অনেকটাই সময় নির্ভর। সঙ্গীতবিদের মতই তাঁকে ভাবতে হয় মাত্রার বিরতির মধ্যে কটা স্বর তিনি আনবেন। উপজ অংশ কেমন ভাবে বিস্তৃত হবে লয়ের সাহায্যে। কটি তালের বৃত্ত নিতে হবে। তাই দেখা যায় বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতায় বারবার বিরতির স্পষ্ট চিহ্ন বা স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের মত স্পেস। এই বিরতি তাঁর কবিতায় অসীম তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণেই যে তিনি সঙ্গীতের ধ্বনিনির্ভর জগতকে কবিতার শব্দ-চিত্র নির্ভর জগতের সঙ্গে মেলাতে চান। আর সঙ্গীতমুখীনতার জন্যই সময় তাঁর

কবিতার অন্যতন স্থায়ী উপাদান হয়ে ওঠে। চিত্রকলার যে দেশচেতনা তাঁর কবিতার চিত্রকল্পে, প্রতীকে, বর্ণনায় থাকে, তেমনি সঙ্গীতের কালচেতনা তাঁর কবিতায় আনে অন্য মাত্রা : কবিতার শব্দকে তিনি চিত্র ও সঙ্গীতের দেশ-কালমাত্রিক একই সঙ্গে স্থির ও গতিময় করে ব্যবহার করেন। এর মূলে রয়েছে, সমাজ ইতিহাসচেতনা সমৃদ্ধ তাঁর সময়ের বোধ : বর্তমান সময়ে তিনি সত্তাকে খুঁজে পান না, দেখেন নরকের বিকার, মনে হয় স্থানু এসময় বিকাশহীন, কিন্তু ভবিষ্যতের স্বপ্নে একে গতিময় দেখেন উত্তরণে, প্রতিবাদে। অতীত-ভবিষ্যতের ধারাবাহিক বোধে তিনি বর্তমানের কালের বাগান ছারখার দেখলেও, অপেক্ষায় থাকেন, বিশ্বাস রাখেন ঐ রাজার ছেলে মেয়ের ওপর।

বিষ্ণু দে ও পুরাণ

লিলিয়ান ফেডার তাঁর এনশ্যেন্ট মিথ ইন মর্ডন পোয়েট্রি নামক গ্রন্থে মিথ বা পুরাণ সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা দেবার প্রচেষ্টায় জানিয়েছেন, মিথ অচেতন অভিজ্ঞতার দুটি মূল অঞ্চলের ন্যারেটিভ স্ট্রাক্চার বা বর্ণনাত্মক গঠন। প্রথমত, পুরাণ মজ্ঞানির্ভর তাড়নাকে, অবদমিত কামনা, ভীতি বা তা থেকে সঞ্জাত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। পুরাণের থীমে এসব স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, ফিলজেনেটিক বিকাশের প্রথম স্তরে ব্যক্তিচৈতন্যের অশেষত্ব পুরাণের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই সংজ্ঞা নিশ্চয়ই সর্বজনগ্রাহ্য নয় : তবে পুরাণে, ঐতিহাসিক বিকাশের বিবর্তনের একটি স্তরের বাস্তব ও কল্পনা মেশে, সে কথা এই সংজ্ঞায় স্বীকৃত। লিলিয়ান ফেডার যথার্থই বলেন, পুরাণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রায় প্রতীকী আকারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনুভূতির বাহন। পুরাণের চরিত্রগুলি হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই অমর দেবদেবীরা,উপদেবতা বা অতিমানব, কিন্তু তাদের বর্ণনার উপাদান চরিত্রের দ্বন্দ্ব-উল্লাস-বিষাদ সবই মানসিক কাঠামোর মধ্যে। মানব সভ্যতার বিশেষ একটি স্তরের জীবন-মৃত্যুব চক্রের ভীতি ও সম্ভ্রম পুরাণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। মানুষের অসহায়তা পুরাণ যেমন স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি তার কল্পনার, কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের দিগন্তও বিস্তৃত করে। মিথের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যবহারিক কর্ম : যে রিচ্যুয়াল বা আচার অনুষ্ঠান, নৃত্য, উৎসর্গানুষ্ঠান, নাটক পুরাণের অঙ্গাঙ্গী, তাতে এই প্রশ্নই ওঠে, আমার জীবনের কি কোন মূল্য আছে? ক্ষমতা বা অমরতার প্রতি আমার যে আকাঙ্খা তা কি বাস্তবভিত্তিক? এই রিচ্যুয়ালের মধ্য দিয়েই মানুষ সদর্থক উত্তর পায়। ভূমিকর্ষণ, বীজবপন বা ফসল কাটার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের কথাই ঘোষণা করে, তেমনি পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠন মানুষের ভিতরের আরও রহস্যময় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের দিকে নিয়ে যায়। বাস্তব ও কল্পনা, নিজ সীমাবদ্ধতা ও অমরতার আকাঙ্ক্ষার টেনশন মিথে বা পুরাণে থাকে বলেই সর্বযুগে মিথ কবিদের আকর্ষণ করেছে : বাস্তব কল্পনার জটিল রসায়নে মিথ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও গ্রহণে, কখনও বর্জনে, বিরো

ধিতায় পুরাণ সর্বদাই প্রত্যক্ষ পরোক্ষে কাব্যচেতনায় উপস্থিত থেকেছে, কখনও সচেতনভাবে, কখন সামূহিক স্মৃতির অচেতন প্রয়োগে। তবে বিশ শতকে এসে পুরাণ কবিদের হাতে পেয়েছে অন্য যাথার্থ্য—যদিও এর পটভূমিকা উনিশ শতকের রোমান্টিকদের হাতে। আসলে টেকনোলজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পৌরাণিক চরিত্ররা সচেতন ব্যক্তির চেতনায় তাদের ধর্মীয় বা পূজ্যরূপ হারিয়েছে। কিন্তু তাদের বিচ্যুয়াল কনেকশন বা অনুষ্ঠান-গত তাৎপর্য হারায় নি। বিশ শতকে এই পুরাণ কবিতায় স্বাভাবিক ভাবেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে: টেকনোলজির অস্বাভাবিক বিকাশ, সভ্যতার একপেশে বিকাশ কিন্তু মানুষকে স্বাধীন করে নি, করেছে অসহায়, নিজ সীমা-বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন, অথচ মানবকীর্তির নানা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য চতুর্দিকে ছড়ানো, মানব ক্ষমতার চিহ্ন বিকীর্ণ: এই দুয়ের আততিতে স্বাভাবিক ভাবেই মিথ আসে—বর্তমান-অতীতের সন্নিধিতে, সভ্যতার উষাকালের বাস্তকল্পনার সেই নায়কেরা, থীমসমূহ আসে, যাদের উল্লেখে, ব্যবহারে, চিত্রকল্পে—প্রতীকে বর্তমানই ধরা পড়ে। আমাদের দেশের কবিরা অবশ্যই এই টেকনোলজির পরিচয় পান খানিকটা ঘুরপথে, বিকারের মধ্যদিয়ে, ঔপনিবেশিক কাঠামোয় বা লুম্পেন বিকাশের অরাজকতায়। অথচ উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় আন্দোলনে পরোক্ষে হলেও একটা স্বাধীন ব্যক্তিত্বের চর্চা আরম্ভ হয়েছিল: তার সীমাবদ্ধ সার্থকতা, ব্যর্থতার পটেই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাসের সূত্রে পুরাণেরা এসেছে কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানীতে স্বাধীন ব্যক্তির উচ্চারণ যেমন স্পষ্ট, তেমনি পুরাণের কাঠামোতেই তার অসহায়তা, শেষ সার্থকতার অভাব ঔপনিবেশিক পরিবেশের রুদ্ধশ্বাস চাপে তেমনি পরিষ্কার। এই ঔপনিবেশিক যন্ত্রণাই আসে রক্তকরবীর ভূমি, পৃথিবী-মাতা ইত্যাদির মিথিক্যাল স্ট্রাকচারে। কর্ণ কুন্তীসংবাদের নাট্যকাব্যে মূল বিচ্ছিন্ন, নিজ হিগেমনি প্রতিষ্ঠায় অক্ষম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সচেতন যন্ত্রণা. অসহায়তা ধরা পড়ে। ভ্রান্ত উপমায় পীড়িত মধুসূদন যখন উপনিবেশের মাটিতে, তাঁর কল্পনার স্ফূর্তিকে বিকশিত করতে পারেন না, তখন বিরাট বর্ণচ্ছটার জন্য ফিরে যান পুরাণে, উল্টিয়ে নেন পুরাণের তাৎপর্য: ব্যক্তিগত কালগত দেশগত পটভূমিকায় ট্র্যাজিক চরিত্র রাবণই হয়ে ওঠে তাঁর মূল চরিত্র, মেঘনাদ বধই হয়ে পড়ে কাব্যের বিষয়। অন্যপক্ষে ইউরোপামেরিকার যন্ত্রসভ্যতার তির্যক বিকাশে মানুষ আত্মহারা, বিচ্ছিন্ন, তখনই অতীতের সঙ্গে

যোগে বর্তমানের পোড়োজমির পুনরুত্থানের ব্যাখ্যায় বারবার পুরাণ দেখা দেয় নানাভাবে নানারূপে, কখনও প্রত্যক্ষ স্পষ্ট উল্লেখে, কখনও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সামগ্রিক থীমে। কোন অ্যালিগরি, কোন অলঙ্কার হিসাবে নয়, সচেতনভাবে পুরাণের আচার আনুষ্ঠানিক ব্যবহারিক প্রকাশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই পুরাণ আসে। বস্তুতঃ এলিঅটের ঐতিহ্যচেতনা যেমন ব্যক্তির স্বাধিকার প্রমত্ততাকে, বিশৃঙ্খলাকে যুগের কেন্দ্রচ্যুতিকে রোধ করে, তেমনি তাঁর পৌরাণিক প্রয়োগও নৈরাজ্যের মধ্যে আনে নিয়ন্ত্রণ। সবকিছু যখন ভেঙ্গে যাচ্ছে তখন তার অভিজ্ঞতাকে মূল্যবান করার জন্যই, ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যই পুরাণ ফিরে ফিরে দেখা দেয় আত্মসচেতন কবির কবিতায়। ক্ষণভঙ্গুর বর্তমানের প্রতিপক্ষ চিরায়ত্বকে বাঁধবার তাগিদেই ঐতিহ্যিক প্রতীক এসে যায় — যাতে স্থায়িত্বকে পুনরায় সংগঠিত করারও স্থিরতার প্রতি আবেগ ধরা পড়ে। এলিঅটে বা ইয়েটসে মিথের ব্যবহার এক অর্থে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কাব্যিক প্রতিরোধই। আর এ ব্যাপারে জটিল যুগের জটিলতা বহন করার ক্ষমতা পুরাণেরই আছে: কারণ মিথ একই সঙ্গে সত্য ও মিথ্যা: পুরাণের সেই দেবতা বা অতিমানবরা কল্পনাই। এক অর্থে মিথ্যাই। কিন্তু এই কল্পনাতেই প্রতিবিম্বিত হয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-উল্লাস। বিশ শতকের ভয়াবহতা নিদারুণ সত্য, তাকে অস্বীকার করা যায় না, এই সত্যকে উত্তরণ করতেই হয়: এই না ও হ্যাঁ মিথেই পাওয়া যায়। অসহায় মানুষ এভাবেই অসীম বিস্তারের দিগন্ত পায়। বর্তমানে অচেতন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা মিথের আছে, কারণ মিথ একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক, বস্তুগত ও ভাবগত। বিষ্ণু দে-র পুরাণ ব্যবহার মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপট এবং ইয়োরোপীয় আধুনিক কবিদের প্রয়োগ-পদ্ধতি, দুই-ই উপস্থিত থাকে। তাঁর কাব্যজীবনের বিকাশের নিজ উত্তরণের পর্বান্তরে পুরাণের প্রয়োগের ক্ষেত্র ও ধরনও পাল্টায়।

বলাই বাহুল্য, বিষ্ণু দে-র মত আত্মসচেতন কবি যখন পুরাণ ব্যবহার করেন, তখন সচেতনভাবে দেশ-কালমাত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েই করেন। এই দেশ-কালচেতনার প্রাথমিক ভূমি মধ্যবিত্ত শ্রেণী— বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের উত্থান, বিকাশ ও অবক্ষয়ের অনিবার্য পটভূমি বিষ্ণু দে-র সমগ্র কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, পুরাণেরব্যবহারের ক্ষেত্রেও তেমনি স্মরণীয়। ফিলিপ রাহ্‌ভ

যেবলেন, বর্তমানের শিল্পসাহিত্যের প্রায় মিথ-পূজা আসলে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও বিকাশ থেকে পালিয়ে যাওয়া, বিষ্ণু দে-র মিথ ব্যবহারে সে আপত্তি টেঁকে না। পবিত্র ও গুপ্ত কোনো রহস্যনির্ভর তাৎপর্যে পুরাণ বিষ্ণু দে-র কাছে আসে না, বা কোন আর্কেইজমের ঝোঁকও বিষ্ণু দে-কে নিয়ে যায় না পুরাণের উল্লেখে। যেহেতু বর্তমান ইতিহাস সমাজের পটেই বিষ্ণু দে-র প্রেম-প্রকৃতি চিন্তা, আর যেহেতু প্রেম-প্রকৃতির সমগ্রতাতেই বিষ্ণু দে আস্থা রাখেন, সেহেতু তাঁর মিথ ব্যবহারেও প্রেমের যন্ত্রণা ও বর্তমানের শ্রেণীগত সমাজগত পট উপস্থিত থাকে: আসলে তাঁর প্রেমের প্রতীকী অবলম্বন ও বর্তমানের প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচবার আশ্রয়ে বারবার পুরাণই ব্যবহৃত। আর এক্ষেত্রে পরোক্ষে, মিথের মৌল রিচুয়াল শিকড় সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চয়ই তিনি রাখেন, কিন্তু যে সব মিথ বিভিন্ন যুগে সোফোক্লিস, শেকসপিঅর, চসর ইত্যাদির ব্যবহারে প্রাণ পেয়েছে, বাণভট্টের কাদম্বরীতে ব্যবহৃত হয়েছে বা হেলেনীয় ভারতীয় মহাকাব্যে সভ্যতার উষাকালের প্রতীক হয়েছে, বিষ্ণু দে-র হাতে সেই মিথগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে নবতাৎপর্যে ও মাত্রায়। সমসাময়িকের, ইতিহাসের সচেতনতায় তাঁর পুরাণনির্ভর চরিত্রাবলী হয়ে উঠেছে বর্তমানেরই যন্ত্রণার আশ্রয় বা আধার। এলিঅটের পোড়োজমির "আমি"র মতই বিষ্ণু দে-র কবিতার "আমি" নিজ শূন্যতা, পোড়ো জমি সম্পর্কে সচেতন কিন্তু পুনর্জন্মের আশাকে অনৈতিহাসিক ভাবে না। অভিজ্ঞতার সত্য সর্বদাই উপস্থিত। সেই জন্যই যখন ক্ল্যাসিকোত্তর ট্রয়লাস ক্রেসিডার সাহিত্যিক মিথকে অবলম্বন করে তাঁর প্রেমের প্রতীককে উপস্থিত করেন, তখন সবকিছুর পরেও তিনি শোনেন, 'এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবু ওড়ে কথা ক্রেসিডার', পাখির চিত্রকল্পটি এখানে অব্যর্থ অসীম শূন্যতায় তার প্রতিবাদী পাখা ঝাপটানি, ওড়ার মধ্যেই কালোত্তর যাত্রা, এই চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে, বিষ্ণু দে-র চলিষ্ণু প্রেম চেতনায় এই যাত্রার চিত্রকল্পটি বারবারই ঘুরে ফিরে আসে। ক্রেসিডা কবিতার প্রথম চারটি হ্রস্ব ছত্রেই এসময়ের স্বপ্ন ও প্রেমের প্রায় অসম্ভাব্যতার কথা ভূমিকা হিসাবে তিনি জানিয়ে দেন: তার পরের তিনটি নাতিদীর্ঘ ছত্রে বিষ্ণু দে-র নায়ক বৈতরণী বালুকাবেলায় ও বাতাসের হাহাকারে নিজ পোড়োজমির কথা বলেন। তারপরই ইতিহাসের নানা ঝঞ্ঝার মধ্যেও, 'ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়।' ক্রেসিডাকে বিজয়ী প্রেমের প্রতীক বা আধার

হিসাবে কল্পনা করার কারণই হল, যুগে যুগে বিভিন্ন কবি ক্রেসিডাকে অবলম্বন করেছেন : ইতিহাসের আরেক যুগান্তরে চসর বা শেকসপিঅরও ট্রয়লাস-ক্রেসিডার আধারেই প্রেমের যন্ত্রণার রূপকে দেখেন। বিষ্ণু দে-র মিথের সেই দিকটির প্রতিই মনোযোগ বেশী, যে দিকটি ইতিহাসের নানা যুগে নানা কবির কল্পনার ঐশ্বর্যে নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ওফেলিয়ায় আপাত আকস্মিকতায় কবি যে বলেন,

দেবযানী! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে
শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে-পাকে এই সাধনা আমার।

তাতে ক্ষমা, শাপমোচনের সুরভি ইত্যাদি শব্দে রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানীর উত্তরাধিকারই বেশী ক্রিয়াশীল, মূল পুরাণের দেবযানী নয়। যখন বিষ্ণু দে প্রসার্পিনা বা পেরেসফোনের মিথটি ব্যবহার করেন তখন মনে পড়ে যায়, ইংলণ্ডের এক তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ যুগে স্বর্গ হতে বিদায়ের দিনে মিলটনও প্রসার্পিনাকে দেখেন কুসুম চয়নে : এই সূত্রেই স্মরণীয় কুসুমচয়নরতা প্রসার্পিনাকে হেডিস হরণ করে নিয়ে যায় পাতালরাজ্যে। ওফেলিয়াতেও এলসিনোরের নরক : প্রসার্পিনা কুসুমে ছায়, বৈতরণী পাশে ছড়ায় আহা! অন্যদিকে মহাশ্বেতা বিষ্ণু দে-র কবিতার একটি স্থায়ী প্রসঙ্গ-উল্লেখ, তাঁর জীবনের নানাপটে এই প্রতীকটি ঘুরে ফিরে আসে, বিষ্ণু দে-র হাতে পৌরাণিক চরিত্র সামূহিক চেতনা বা স্মৃতির কল্যাণে একেবারেই প্রতীক হয়ে উঠতে পারে, চিত্রকল্পের উপমান-উপমেয়ের নির্ভরতা থাকে না। বাণভট্টের কাদম্বরীর পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার কাহিনী জন্মান্তর, পুনর্মিলন, পুনরুজ্জীবনের ছকে পৌরাণিকই। হ্যামলেট বা ট্রয়লাসের মত পুণ্ডরীকের নাট্যোক্তি বা স্বগতোক্তির গঠনগত পরিপ্রেক্ষিতেই মহাশ্বেতা কবিতাটি লেখা। এখানেও কবি তাঁর নায়িকার কাছে, আসলে প্রেমের আকাশেই মুক্তি চান। ১৯২৬-১৯৩৭-এর মধ্যবিত্ত ভাঙ্গনের সূচনাপর্বেই আসে :

পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্ত-ফণা তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা?

শূন্যতা বোঝাতে, বিস্মরণ ও বালু-তীর বিষ্ণু দে প্রায়ই ব্যবহার করেন। সমাজের লোকচেতনায় বিস্মরণ বিষ্ণু দে-র কাছে একটি তীব্র শূন্যতার

অভিজ্ঞতা, আর বালি, পোড়ো জমি অস্তিত্বের চিত্রকল্প হিসাবে বার বার তাঁর কবিতায় এসেছে : ঘোড়সওয়ারের চোরাবালি যার বিখ্যাততম উদাহরণ। মহাশ্বেতার শেষ স্তবকের এই বিস্মরণ বালুতীরের প্রতিপক্ষে কিন্তু আসে দ্বিতীয় স্তবকের : 'অমৃতের বারি মদির ওষ্ঠাধারে। স্মৃতি-বিস্মৃতি শরতের ধারা ঝরে।' এই স্তবকের 'অচ্ছোদনীরে করো তুমি যেই স্নান। স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসীতে,' প্রায় আক্ষরিকভাবেই মূল কাহিনী বজায় রাখা হয়েছে। 'আজ কি আমাকে ভুলেছো মহাশ্বেতার' প্রশ্নও বাণভট্ট অনুসারী, কিন্তু শেষ স্তবকে ঐ সাপের চিত্রকল্পটিতে, এই পৌরাণিক-প্রসঙ্গ আধুনিক হয়ে উঠেছে, হয়তো খানিকটা মনোবিদ্যার হাত ধরেই। মহাশ্বেতাকে ভুলে যাওয়াটাই কবির কাছে বিমুক্তি, প্রেম থেকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা : সামূহিক চেতনার যুগান্তব্যাপী দেশ-সমাজগত শিকড়ের প্রতীকেই মহাশ্বেত আসে, নিজ শ্রেণীগত উদ্‌ভ্রান্তিতে তাই কবি আশ্রয় খোঁজেন মহাশ্বেতায়। কাদম্বরীর মহাশ্বেতায় তাপসীরূপে পৌরাণিক মহাদেবাশ্রয়ী দুর্গার যে আভাস আছে তারই ইঙ্গিত বাজে মহাশ্বেতা কবিতার 'মুদ্রিত বরাভয়, তামসীকে কর খণ্ডন' তৃতীয় স্তবকের এই শব্দাবলীতে : দ্বিতীয় স্তবকের শারীরিক প্রেমের তৃতীয় স্তবকের অমৃত জ্যোতিতে উত্তরণ ঘটে। দ্বিতীয় স্তবকের শেষ ছত্রের 'স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী' তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় ছত্রে রূপ নেয়' 'ক্রান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রান্তি-বলয়ে : শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে সংযোগে হিগেমনি সৃষ্টিতে, না, বিচ্ছিন্ন আত্মমগ্নতায় পতনের পথকে ত্বরান্বিত করায় কোনদিকে তার গতি, এই ক্রান্তিতে 'শিহরায় ক্রন্দসী' : আকাশ-পৃথিবী কেঁপে ওঠে। কিন্তু চতুর্থ স্তবকের প্রথম তিন ছত্রে, মূল কাহিনীর সূত্রেই, নিজ শ্রেণীগত ভাঙনের ছবিই স্পষ্ট হয়, তবে কবির ভবিষ্যতমুখী মনন একে স্বীকার করতে পারে না, মহাশ্বেতার সঞ্জীবনী প্রতীকেই মুক্তি খোঁজেন : দেহদুর্গের রক্ষায় মোরে আনো। তোমার প্রাকৃত বাহুতে মহাশ্বেতা। দেহ দুর্গ ও প্রাকৃত বাহুর বিপরীতধর্মী চিত্রকল্পে একই সঙ্গে আশ্রয় এবং কর্মৈষণা কবি চান। প্রকৃত-পক্ষে চতুর্দিকের চূড়ান্ত অরাজকতা বিমুক্তিতে ক্রেসিডা-মহাশ্বেতা প্রেমের, জীবনের পুনরুজ্জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। কিম্বা প্রসার্পিনার সূত্রে বীজ বপন, শস্য বেড়ে ওঠার পৌরাণিক রিচুয়াল নির্ভর তাৎপর্যকেই কবি আনতে চান তাঁর পোড়োজমির পরিবেশে। ওফেলিয়া যেখানে কবির নায়িকা

সেখানেও কবি হেডিসের, নরকের পৌরাণিক উল্লেখ করেন : "শালতরু হারিয়েছে সাড়। রক্তহীন আর্তনাদে এ-আঁধার হেডিসের মতো হৃদয় ধরেছে চেপে।" হেডিস শব্দটিতে বিস্তৃত পৌরাণিক কাহিনীর অনেকান্ত তাৎপর্য অবশ্যই আভাসিত : কেবল হোমরের হেডিস নয়। এই নরকেই কবির প্রার্থনা : বহ্নিতর দিক্ দীপ-শিখা। তুলে দাও, ছিঁড়ে দাও জীবনের কৃষ্ণ যবনিকা। তাঁর চতুর্দিকের নরক ও তার প্রতিপক্ষেই এই ক্রেসিডা, ওফেলিয়া, মহাশ্বেতা বিষ্ণু দে-র কাব্যজীবনের প্রথম পর্বের নায়িকারা দাঁড়িয়ে থাকে, আর এর আততিতেই তাঁর পৌরাণিক ভিত্তিভূমি তাৎপর্য পায়। হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই, কিন্তু আমার হৃদয় ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা—এই বৈপরীত্যেই পাশ্চাত্য হেলেন ও প্রাচ্য শবসাধনা, ঘটাকাশের তান্ত্রিক আরাধনার ইঙ্গিতের সমন্বয়েই বিষ্ণু দে-র মিথ্ ব বহারকে করেছে নাট্যাবেগে চঞ্চল। লক্ষণীয় যেখানে প্রত্যক্ষতঃ প্রায় সমগ্র একটি থীমের মত বিষ্ণু দে মিথ্ ব্যবহার করেন সেখানেই নাটকীয় স্বগতোক্তি, প্রেমের তীব্রতায়, যা চূড়াস্পর্শী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রেমের এই তীব্র আবেগ শেষ পর্যন্ত প্রচলিত তাৎপর্যহীনতা এড়িয়ে যায় তার কারণ, কবির পুনরুজ্জীবনের আশা ও বাস্তবই এই প্রেমের মধ্য দিয়ে রূপ পায়, হয়তো পরোক্ষে ব্যক্তির বন্ধ্যাভূমির উর্বর হয়ে ওঠার মিথ, উর্বরতা কাল্টই তলে তলে কাজ করে। তবে ক্রেসিডা পর্যন্ত দেশ-কাল-শ্রেণীর পটভূমি থাকলেও বিষ্ণু দে মূলত ব্যক্তির ওপরই জোর দিয়েছেন : প্রেমের প্রতীক যন্ত্রণায় ব্যক্তির পুনরুজ্জীবনের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে য়ুং-এর আর্কেটাইপের ভাবনা হয়তো কার্যকর থাকে বিষ্ণু দে-র কাব্যচিন্তায় : এই আর্কেটাইপ মুক্তি, পুনরুজ্জীবন বা নিরাপত্তার বাণী বহন করে। মহাশ্বেতা বা ক্রেসিডার মিথে, ওফেলিয়ার প্রায়-মিথে, পৃথিবী-মাতার কন্যা প্রসার্পিনার উল্লেখে বিষ্ণু দে সমাজবদ্ধ ব্যক্তিগত মুক্তির কথা বলেন। উর্বশী কবিতায় তিনি যে বলেন 'আমি নহি পুরূরবা' কিংবা ঘোড়সওয়ারে বলেন 'হৃদয় আমার চড়',' এই আমি বা আমার ব্যক্তি প্রধান, যদিও সময়-সমাজের পটধৃত হয়ে, পরে অন্বিষ্ট বা আরও পরে এই আমিই আরও বৃহত্তর মাত্রাযুক্ত হয় ; শ্রেণী, দেশ ইত্যাদির। অবশ্য আর্কেটাইপের জটিল মাত্রা বিষ্ণু দে-র পুরাণ ব্যবহারে সর্বদাই লভ্য : ডিমেটার ও পেরেসফোনের মাতা-কুমারীর আর্কেটাইপের যুগল উপস্থিতিই তাঁর কালজয়ী প্রেমের আকাশে থাকে।

মাতা-কন্যার বৃত্তে আস্থা না রাখলে প্রেমের অমরতার বিস্তৃত পটভূমি অনায়ত্ত থেকে যায়। মহাশ্বেতা কবিতার তৃতীয় স্তবকে বিষ্ণু দে খৃষ্টীয় আলোকেই পৃথিবীমাতার মিথের অস্পষ্ট হলেও, সাহায্য নেন। এই ব্যক্তিগত বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তির প্রসঙ্গ বিষ্ণু দে'র কাব্য বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীমুক্তি, সমাজমুক্তি প্রসঙ্গে রূপান্তরিত হয়ঃ গোড়া থেকেই এই পর্বান্তরের পটভূমি থাকে, কর্মহীন অবকাশ, কর্কশ কঠিন গুমোট বা বালি/চোরাবালির চিত্রকল্পে পারিপার্শ্বিক নিশ্চয়ই উপস্থিত, ব্যক্তি-শ্রেণী-সমাজ একই সঙ্গে বিষ্ণু দে-র চেতনায় অন্বিত। তবু যেন প্রথম পর্বে তাঁর ব্যক্তিটিই মুখ্য। কিন্তু 'পদধ্বনি' কবিতা থেকেই এই ব্যক্তি আমি ক্রমশঃ শ্রেণী সমাজের নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়ঃ তারও আগে অবশ্য বিভীষণের গান, চতুর্দশপদীর পরিবৃত্তিকাল। ১৯৩৬-এই লিখেছেন কবি,

কবে যে ছেড়েছি স্বর্গজয়ের দুরাশা যত!
বক্ষে আঁকড়ি ধরেছি স্বর্ণ সীতারেই,
তেত্রিশ কোটি ছেড়ে সসাগর পিতারেই
পাকড়ি, বিষম রুদ্রের বিষ উগারি দেখি
উষার আকাশে শ্মশান গোধূলি কুয়াশাহত।

সামগ্রিকভাবেই বিষ্ণু দে, চোরাবালি পর্ব থেকে সন্দ্বীপের চর-অন্বিষ্টের পর্বে উত্তীর্ণ হচ্ছেন ঃ তারই মধ্যের কবিতা পদধ্বনি ও জন্মাষ্টমী।

এই দুটি কবিতাপ্রসঙ্গে এই প্রাথমিক তথ্যটুকু উল্লেখযোগ্য ঃ পদধ্বনিও ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েত প্রদেশ মানেরহাইম দুর্গপ্রাচীর তৈরীর সময়ে একটানাই লেখা। অর্জুনকে উল্টিয়ে। জন্মাষ্টমীর শেষ অংশের প্রথম কয়েক লাইন বছর উনিশে লেখা হয়, তারপরে হারিয়ে যায়, কিন্তু বেশ কয়েক বছর পরে এক দীর্ঘ কবিতার আবেগ আসে বাখের fugue-এর মেজাজে। কিন্তু তার মধ্যে অস্তাচলে অন্ধকার ছাড়াও উর্বশী ও আর্টেমিসের অন্ধকারে যাত্রা ও ডায়োটাইমা বা ভিয়োটিমাকে সম্বোধন এসে যায়। এই পটভূমি মনে রাখলেই, পদধ্বনির পুরাণ মহাকাব্যের সমকালীন তাৎপর্যে জটিল রূপান্তর ধরা পড়বে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের সেই ১৯১২-১৮ পর্যন্ত সুসময়ের স্মৃতি বারবার অর্জুনের নাট্যোক্তিতে ছায়া ফেলে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে 'পদধ্বনি' আলোচনায় দ্রষ্টব্য। মহাশ্বেতার বিস্মরণে বা ক্রেসিডার স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি-র ব্যক্তিকেন্দ্রিক পটভূমি

পদধ্বনিতে স্মৃতির সচেতন দেশকাল নির্ভর শ্রেণীগত পটভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের শ্রেণী হিসাবে হতাশাবিধুর পরিবেশে মধ্যবিত্তের অতীতের স্মৃতিই একমাত্র মূলধন : মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কীর্তিজয়ের ঔপনিবেশিক সাফল্যতেই শ্রেণীগতভাবে জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানা মনে হয়েছিল : কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সমর্থনে অর্জুনের সুভদ্রা হরণের মতই, এই সুভদ্রাহরণ কবিতাটিতে প্রতীকী তাৎপর্যে এসেছে। আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে অতীতের বন্ধন ছিন্ন করে, দেশজ শিকড় থেকে প্রায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতি করবার ইতিহাসটি 'পলায়ন' শব্দে চমৎকার আভাসিত হয়েছে। আর ভূমিকর্ষণের পৌরাণিক চিত্রকল্প বলরাম বা হলধরের প্রতি স্ফীতোদর শব্দটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। (মনে পড়ে প্রগতিশীল সোমপ্রকাশের উক্তি, চাষীরা পশুর পাল)। দেশজ মৃত্তিকা থেকে, এই যে পলায়ন এতে নিশ্চয়ই সাময়িক লাভ ছিল : প্রাণৈশ্বর্যে ধনী সুভদ্রাকেই তাই মনে হয় বীর জননী, এখানেও পৃথিবী মাতা ও কুমারীর আর্কেটাইপটির একত্র অবস্থিতি। কিন্তু ১৯৩৮-এ এই সাফল্য শুধু স্মৃতি : ধনঞ্জয়ের বার্ধক্যে অর্থাৎ বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের পতন প্রক্রিয়ার আবার নতুন পদধ্বনি শোনা যায় আরেক যুগান্তরের : ঔপনিবেশিক জাগরণের মধ্যবিত্ত নায়কের কাছে মনে হয়, "ওকি আসে নগ্ন অরণ্যের/প্রাক্ পুরাণিক প্রাণী? অসভ্য বন্যের পিতৃকুল?/ দানবজন্তুর পাল?" আবার পৌরাণিক চিত্রকল্প আসে "প্রচণ্ড কিরাত।" কিরাতের ছদ্মবেশে মহাদেবের (যাঁর মধ্যে আর্য-অনার্য দুই উপাদানই মেলে) অর্জুনকে পরাজিত করার কাহিনীটির উল্লেখে নতুন জনগণতান্ত্রিক জাগরণের আভাস দেন কবি : এখানে বিশ্বব্যাপী নতুন যুগান্তরের কথাই নিশ্চয়ই স্মরণে থাকে তাঁর। তার পরই এই জাগরণের ছবি :

উন্মথিত হিমশিলা, তুষার প্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীর দল,
ছিন্নভিন্ন দেওদার বন!
শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল,
চোখে জ্বলে প্রচ্ছন্ন অনল! পাশুপত ছল!
আহা সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ!
মিলে গেল নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিনাশের দ্বন্দ্বে উদার প্রসাদ মনে হলেও, ইতিহাসের একটি

স্তরে এই মহাদেবের আবির্ভাবকে স্বাগত জানালেও, আজ প্রশ্ন জাগছে "দুরন্ত মিছিল।" আক্ষেপ "হায় কালের ধারায়/নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম।/ বটের ছায়ার মতো সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়/ ছত্রধর আজ নেই সম্পূর্ণ মানব।" বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়ার সংকটে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্তর প্রায় পতনের প্রক্রিয়ায় নবশক্তির, শ্রমিক-কৃষকের ইতিহাসে কুশীলব হওয়ায়, চমকে ওঠে প্রশ্ন, "কার পদধ্বনি আসে? কার?/ একি এল যুগান্তর। নব অবতার। এ যে দস্যুদল।"

লুব্ধ যাযাবর। নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বলা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।

নতুন শ্রেণীর ক্ষমতালাভের ইতিহাসে, বিপ্লবের যুগান্তরে মধ্যবিত্তের ভীত অথচ সচেতন আর্তনাদই এই ছত্রগুলি। বিষ্ণু দে পার্থের চিত্রকল্পে সচেতন মধ্যবিত্তকে ধরেন বলেই, এই যন্ত্রণা আশঙ্কা স্পষ্ট হয়। নতুন সমাজবিপ্লবের অগ্নিরূপান্তরে ভীত মধ্যবিত্ত, ধনঞ্জয়। ট্রয়লার, হ্যামলেট, পুণ্ডরীকের মত ধনঞ্জয় এখানে আর কেবল একটি সচেতন ব্যক্তি নয়, সমগ্র শ্রেণীরই প্রতীক। বিষ্ণু দে-র কবি জীবনের প্রথম পর্বের পুরাণ ব্যবহার দ্বিতীয় পর্বে এই ভাবে আরও ব্যাপ্ত, বিস্তৃত হয়ে উঠল: একটি শ্রেণীরই হাহাকার ধ্বনিত হল 'ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, ব্যর্থ গাণ্ডীব অক্ষয়ের' হাহাকারে। বলাই বাহুল্য, বিষ্ণু দে তাঁর দ্বান্দ্বিক ইতিহাস চেতনায় পুরাণ থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। পুরাণ ও বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাসের চেতনায় আজও প্রত্যক্ষ সমান্তরালে আসে জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণের মধ্যস্থতায়। উর্বশী ও আর্টেমিস, চোরাবালির বিষ্ণু দে নতুন সমন্বয়ে অন্বিত হন এই দীর্ঘ কবিতাটিতে: চোরাবালির ব্যঙ্গ, পুরাণ নির্ভরতা, উর্বশী ও আর্টেমিসের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার, শূন্যতার পট, শ্রেণীর ইতিহাসের ব্যাপ্ত পরিসরে এল জন্মাষ্টমীতে। এখানে আর পদধ্বনির ধনঞ্জয়ের হাহাকার নেই, বরঞ্চ আছে জিজ্ঞাসা: "ঠিক জানো ধনঞ্জয়, তুমিও ছুটবে না?/ তার চেয়ে চালাও সমিতি,/ জোটাও কমিটি,/ সন্ধ্যাটা কাটবে তবু নিরাপদে, দশের সেবায়।/ তেত্রিশ কোটির মাঝে অসহায়

মনে/ ভাবো কি, কস্মৈ দেবায়/ হবিষা বিধেম?/" বাজার সরকার, বড় জোর পাটকলে পদস্থ কেরানী, জজকোর্টে উকিলই হয়তো বা এস কবিতায়, ট্রয়লাস-হ্যামলেট-পুণ্ডরীক অর্জুনের বিশাল ব্যক্তি নয়। এখানে আ ট্র্যাজিক আক্ষেপ নেই; আছে অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর/এ বুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই/কুম্ভীরক তাই।"

কাসান্দ্রা মিথটি অনেক কবিই ব্যবহার করেছেন: অ্যাস্কাইলাস, ইউরিপিডিস ইত্যাদি। স্বাভাবিক ভাবেই এই কবিকে আকর্ষণ করেছে: বিভিন্ন কবি ব্যবহৃত মিথের প্রতি বিষ্ণু দে-র মনোযোগের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। প্রিয়াম ও হেকুবার কন্যা কাসান্দ্রাকে সূর্যদেবতা অ্যাপোলো বিবাহ করতে চান। কিন্তু কাসান্দ্রা আপত্তি করায় তিনি ক্রুদ্ধ হন ও কাসান্দ্রার ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতাকে অর্থহীন করে দেন। তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা থাকলেও, কেউ বিশ্বাস করবে না। গ্রীক কিংবদন্তীর এই আশ্চর্য নারী ট্রয়ের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেনি। ট্রয়ের পতনের পর তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাথেনার মন্দিরের আশ্রয় থেকে। কাসান্দ্রা ও সূর্যদেবতার সম্পর্কটিকে জটিলভাবে, দু'ধার থেকে বিষ্ণু দে ধরেছেন তাঁর কাসান্দ্রা বিষয়ক দুটি কবিতাতে।* প্রথম কবিতাটিতে কবি কাসান্দ্রাকেই সম্বোধন করেছেন: বলো কাসান্দ্রা, এত দুর্যোগ ছিল কোথায় সকলে ভাবছি। কিন্তু কাসান্দ্রার সেই ট্র্যাজিক ট্রয় ও দুর্গত ভারতবর্ষ নয়, আর কয়জন বাদে সকলেই কাসান্দ্রাকে মুখ খুলতে বলছে তার ভবিষ্যদ্বাণীকে তারা বিশ্বাস করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এই কবিতায়, পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতায় কবি স্বাভাবিক ভাবেই কাসান্দ্রাকেই প্রশ্ন করতে পারেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাস্তব থেকেই:

আমরা কখনো হেরিনি হেলেন, সে মায়াননে
আমরা খুঁজিনি মর্ত্য রূপের ঐশী সীমা,
ইথাকায় কভু কলা কৌশলে কিনি না নাম
তবু কেন মরি ঘরে ব'সে লোভী ট্রয়ের রণে

* কবির কাসান্দ্রা (সন্দীপের) ও কাসান্দ্রা (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার) কবিতা দুটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সুদেষ্ণা চক্রবর্তী।

রাজরাজড়ার বাজারে বৃথাই মাথার ঘাম

পায়ে ফেলি, দেশে ছার জীবনের নেইকো বীমা।

তা সত্ত্বেও, বিশ্বের ভার এ ঘাড়েই কেন চাপে, ঘর থেকে টেনে আনে সংক্রাম দুঃশাসনে, যেমন, নির্দোষ কাসান্দ্রাকেই অ্যাথেনার মন্দির থেকে টেনে বার করে; 'সূর্যালোকের নগ্নতা পায় তার যত ক্ষততে' কাসান্দ্রা-অ্যাপোলোর সম্পর্ক ছায়া ফেলে। যে সূর্য কাসান্দ্রাকে ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তা তিনিই, অকেজো করে দেন। (এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ভারতীয় পুরাণ কাব্যে সূর্যেরপ্রখর দ্যুতি ও তেজ সহ্য করতে না পেরে তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞা ছায়া সৃষ্টি করে। আবার সূর্যের তেজ হ্রাস করবার জন্য বিশ্বকর্মা তাঁর দেহের অষ্টম অংশ ছেদন করেন।) যে ভারতবর্ষ সূর্য পূজার দেশ, সেই আদিপর্ব থেকে সূর্যের আরাধনা, সূর্যবংশ-জাত রাজাদের কীর্তি সেই সূর্যালোকের নগ্নতাতেই দেশের মড়ক। এই কবিতায় 'কয়জন বাদে'—কথাটি বারবার বলা আছে। সেই কয়জনা যুদ্ধ-মন্বন্তরে মুনাফা লোটে, লুটে খায়, সূর্যের ক্রোধ হানে না, তাদের কবি একটু ব্যঙ্গ করেই বলেন, 'তাঁরা হিরণ্ময়েরই পাত্রে ঢোকে'। উপনিষদের সেই বিখ্যাত শ্লোক মনে পড়ে যায়। সূর্যের দেশে মনুষ্যত্বে কিছু অভাব—ক্রোধদীপ্ত মিথিক্যাল সূর্যদেবতার কাসান্দ্রার প্রতি আচরণের অমান বক্তা যেমন প্রচ্ছন্নে এই সব ছত্রে ঘোষিত, তেমনি স্বদেশের চতুর্দিকের মড়কের নরকের কথাও উচ্চারিত। ক্রেসিডা বা ওফেলিয়ার প্রেমের প্রতীকের মত কাসান্দ্রাও এখানে মনুষ্যত্ব ও সত্যদৃষ্টির প্রতীক। 'মুখ খোলো কাসান্দ্রা, সূর্যালোকে। ঝলসিয়ে চোখ বলো কি পাপের শাসন হায়—' এই ছত্র দুটিতে কাসান্দ্রাকে কবি কেবল ভবিষ্যতের দ্রষ্ট্রী হিসাবে দেখেন নি, তাকে প্রচণ্ডভাবে ঘোষণা করতে বলছেন, এই শাসনের স্বরূপকে উদ্ঘাটন করতে বলছেন। পুরাণকে পাল্টিয়ে, কবি কাসান্দ্রার ভবিষ্যদ্বাণীকে কয়েকজন বাদে সকলেই বিশ্বাস করবে—এই কথা জানান, কারণ বিশ্বাস না করে ট্রয়ের ধ্বংস তো প্রত্যক্ষ করা গেছে। আর দ্বিতীয় 'কাসান্দ্রা' কবিতাটিতে, যেখানে কাসান্দ্রা স্বয়ং কথক সেখানে স্পষ্টই বলা হয়:

লুব্ধ সূর্য, তাই ট্রয় জুড়ে চলে

গুপ্তঘাতক মৃত্যু রুষ্ট ক্লান্ত

অমর প্রাণের মর জীবনের

ফসল ফলানো আলোর গানের

অমর সূর্য ভুলে গেছে আজ

জীবনে মরণ হেনে কতোটুকু কতোদিন কার ক্ষতি ?

বস্তুতঃ দুটি কবিতাতেই বিষ্ণু-দে দেখান কেমন করে ইতিহাসের গতিতে সমাজের তির্যক বিকাশে জীবনদায়িনী শক্তিই জীবন ধ্বংসকারী শক্তিতে পরিণত হয়। কাসান্ড্রা পুরাণের ব্যবহারে ভারতীয় সূর্যের আলোর জীবন রক্ষার যে লোক-চেতনার চিত্রকল্প তা বিষ্ণু দে দ্বান্দ্বিক চেতনায় তাৎপর্যমণ্ডিত করেন। কিন্তু পুরাণে কাসান্ড্রার পরিণতি বিষ্ণু দে গ্রহণ করেন না। এখানে সমস্ত ব্যবস্থার মড়কের অন্যায়, অসাম্যের প্রতিপক্ষে কাসান্ড্রাকে তিনি দাঁড় করান। 'তবু কাসান্ড্রা আমি। মানিনি তো আমি সূর্যের রাঙা রোখ। কাসান্ড্রা ঘুরি অতন্দ্র চোখে পথে পথে বন্ধুর'— সব কিছুকে তুচ্ছ করে কাসান্ড্রার এই ঘোরা। অজেয় তার আলুলিত বেণী, যুগান্তে সংহতি। (আলুলিত বেণীতে ভারতীয় দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা মনে পড়ে।) ক্রেসিডা বা মহাশ্বেতা বা ওফেলিয়ার মত কাসান্ড্রা এখন কেবল ব্যক্তির পুনরুজ্জীবনের প্রতীক বা আধার নয়, সমগ্র দেশই তার অবলম্বনে, প্রতীকে মূর্ত। বস্তুতঃ পদধ্বনি-জন্মাষ্টমীর শ্রেণীভিত্তিক দৃষ্টিকোণ কাসান্ড্রায় এসে কয়জন বাদে দেশভিত্তিক হয়ে উঠল। অবশ্য ক্রেসিডা-মহাশ্বেতার ব্যক্তি যেমন শ্রেণী-সমাজ বিচ্ছিন্ন নয় বা পদধ্বনি-জন্মাষ্টমীর শ্রেণী দেশ বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি কাসান্ড্রার দেশ, ব্যক্তি শ্রেণী বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু ধাপে ধাপে আবার সমান্তরালে বিষ্ণু দে-র হাতে পুরাণ ক্রমশঃ দেশের ব্যাপ্ত বিস্তৃত পটভূমির ব্যাখ্যা হয়ে উঠল। এরপর বিষ্ণু দে র পুরাণ ব্যবহার কমতে থাকে—চকিত উল্লেখ বরাবরই থেকে যায়, এমনকি আলেখ্যর আন্দ্রমিদার মত কবিতাও লেখেন। কিন্তু একটি থীমের সমগ্র প্যাটার্নে বিষ্ণু দে পুরাণকে খুব কমই আনেন—যুযুৎসুব খেদে-র মত দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। প্রায় সমসাময়িক আইসায়ার খেদ ও টাইরেসিয়সে পুরাণ ব্যবহৃত হয়েছে অন্যভাবে। আইসায়া ও টাইরেসিয়স বিষ্ণু দে-র হাতে যেন দূর থেকে ইতিহাসকে দেখছে, তাদের একজন পেনসনপ্রাপ্ত আশী বছরের বৃদ্ধ আর একজনও বয়স্ক। দুজনেই ইতিহাসের মূলগতি থেকে সরে খানিকটা মন্তব্যকারীর মত মন্তব্য করছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পতনপর্বের, ইতিহাসের প্রায় নাট্যহীন পরিণতির তারা সাক্ষীমাত্র। তাদের উক্তিও তাই প্রচলিত কথাবার্তার গদ্যে আক্রান্ত : পদধ্বনির সেই হাইটেণ্ড স্পীচ এখানে নেই।

প্রথম কাসান্ড্রা কবিতাতেই বিষ্ণু দে-র প্রথমদিকের ঐশ্বর্যময়ী বাক্‌রীতির পরিহার চোখে পড়ে। কবি বুঝেছেন, সেই ট্র্যাজিক আয়রণি বা পরিণতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিণতিতে নেই। টাইরেসিয়স অবশ্যই পরিচিত চরিত্র, পুরাণ বা হোমরের টাইরেসিয়স নয়, সফোক্লিসের টাইরেসিয়সই আমাদের বেশী জানা। ভারতীয় বুর্জোয়া বাঙালী মধ্যবিত্তর ক্ষেড়নাট্যে, লঙ্গরখানার পাশে সন্ধ্যার নৈরাশে নিজের শিশুর মুখ ও সঙ্গিনী স্ত্রীর বিবস্ত্র ব্যর্থতার সামনে টাইরেসিয়স যথার্থই বলে :

আমার দুচোখ অন্ধ, আমি শুধু দেখি ইতিহাসে
আকর্ণ বিস্তৃত তিক্ত নাট্য পরিহাস এই সধবার একাদশী
ভাদ্রের গুমোট শুধু
বৃষ্টি নেই, রৌদ্র নিরুদ্দেশ।

ভারতীয় বুর্জোয়া সম্পর্কে এই উক্তি ইতিহাস বোধে ভাস্বর :

সত্যিই ও ধনী নয় ধনী যদি বলো
রথসচাইল্ড কিম্বা মরগণ
নুন পাট দেওয়ানী আবগারী
তেজারতি দেবোত্তর ফৌজদারি চুরি বা চামারি
চাকরি দালালি
এ হাতে হারামি আর ও হাতে হালালি

এদের উদ্দেশ্যেই বিষ্ণু দে-র টাইরেসিয়স বলে :

আমার দুচোখ অন্ধ, আমি শুধু অন্ধকারে দেখি
অতীতের কাদা আর ভবিষ্যৎ রাবিশে কাদায়
বোজানো ডোবার জল
তোমাদের প্রাণের পল্বলে মানুষ বাঁধে না বাসা
স্রোতের বিস্তার নেই
মাছও নেই, কাদা, ধুলা, মরা ব্যাং
রৌদ্রে শুকায়
তোমাকে দেখেছি নেই তোমার নিস্তার।

ঈডিপাস টিরেনাসের ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিক উৎক্ষেপ নয়, কঠিন ব্যঙ্গই এখানে টাইরেসিয়সের মুখে, তবে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা মন্তব্যকারীর ভূমিকাটি ঐ পুরাণ-

নাটক থেকেই নেওয়া। অন্যদিকে আইসায়ার খেদের খৃষ্টীয় যন্ত্রণার শিরোদেশে এই উদ্ধৃতিটি : And he looked for judgement, but behold oppression, for righteousness, but behold, a crv. বিষ্ণু দে-র আইসায়ার পেনসনই পঁচিশ বছর, সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নিলীমা ভাস্বর। সে দেখেছে সব,

শুনেছি অমান্য মন্দ, তবু তো সে অমান্য উৎসবে
আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল, পেনসনের ঘর।
চাষীরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তারপর কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।

দন্তনখহীন, সামান্য চাকুরে চিরকাল বৃদ্ধ, যার জবিন উঠতি ছিল ছোটখাটো ব্যর্থতার মাঠে, সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত বিষ্ণু দে র আইসায়া তবু আশার আলো দেখে, যদিও বাড়িতে অশান্তি ঘোর সন্তানেরা শত মতামতে ভাঙ্গে ঘর :

...আবার দেখি ছোট-জন অসিধার ব্রত
যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত. বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ যুদ্ধে এনেছে ফের পাঞ্চজন্য, দারি পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক, বলে, শনিগ্রহদের কক্ষপাত
সেও নাকি মানুষের হাতে ; দেখি নয়নে ভাস্বর
তার নীল নদীবয়, দুই তট সবুজ-উর্বর।
আমার বয়স ঢের, দেখি তার পঁচিশ বছর।

বাইবেলীয় আইসায়ার মতনই, এই নতুন মেসায়া, নতুন শক্তির আভাস তিনি দেখতে পান যেটি নিয়তি বিশ্বাসী অন্ধ টাইরেসিয়সের পক্ষে সম্ভব হয় না। (আইসায়ার খেদের এই যুবকই নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে 'যমও নেয়না'র সেই নন্দিত বন্দীতে রূপান্তরিত হয়।)

ক্ল্যাসিকাল মিথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু দে লোক পুরাণের দিকে, রূপকথা লোক সাহিত্যের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠেন : তাঁর সামগ্রিক কাব্যবিবর্তনের সূত্রেই। ১৯৪৪-৪৭-এর ক্রান্তি পর্বেই রাজনীতি সমাজনীতি নতুন চেতনার প্রসারের পটেই মৌভোগ, সাঁওতাল কবিতা, ছত্তিসগড়ী গান, উঁরাও গান লেখা হয়। তার ঠিক আগেই আসে

সাতভাইচম্পার প্রতীক · ক্ল্যাসিকল মিথ ব্যবহার ক্ষীণ হয়ে, এই লোকপুরাণই বিষ্ণু দে-র কবিতার অন্যতম উপাদান হয়ে ওঠে। সাত ভাই চম্পার স্মৃতিতে হয়তো সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থাকেন। রূপকথার সাত ভাই চম্পা, এক বোন পারুলের গল্পটি বিষ্ণু দে একটু উল্টে নেন। কাসাণ্ড্রার মতই চম্পা এখানে এক বিরাট প্রতীকে পরিণত হয়েছেঃ

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই
কাঞ্চনমালা জানে না, তোমার খেই ;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণ মনে মুখ।
মুক্তি। মুক্তি। চিনি যে তীব্র সুখ,
সাতভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ।

চম্পা এখানে নিরুদ্দেশ সত্তার, মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। (কাসাণ্ড্রার হিরণ্ময় পাত্র এই কবিতায় আবার ঘুরে আসে : চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ। এ কোন হিরণ মায়ায় রেখেছো ঢেকে,/খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।) এই রূপকথা লোকপুরাণ বিষ্ণু দে-র কবিতায় জলস্রোতের মতই আসতে থাকে : অন্বিষ্টের মহাকাব্যোপম বিস্তারে, রূপকথা আসে কবিতার গঠনের অনিবার্যতায়, অবিচ্ছিন্ন কাব্যের চতুর্থ পর্বেও রূপকথা আধুনিক চেতনায় আসে : দৈত্য দানো, রাক্ষস-খোক্কস, রাজকুমার-রাজকন্যা নিয়ে সমগ্র রূপকথা জগতই বিষ্ণু দে-র হাতে আধুনিক জীবনের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। ক্ল্যাসিকাল পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে এই লোকজ পুরাণের নিকটবর্তী হওয়ায় বিষ্ণু দে-র পুরাণ ব্যবহারের ক্রেসিডা-ওফেলিয়া-মহাশ্বেতার স্তর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। কবি যতই নিজ শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষার সীমা উত্তরণ করে লোকজীবনের কাছাকাছি আসেন ততই মৃত্তিকাশ্রয়ী রূপকথা কিংবদন্তী পুরাণ তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। চৈতে-বৈশাখে কবিতাতেই এই পর্বান্তরের কথা প্রায় স্পষ্ট করেই বলা হয় :

অথচ দেখেছি আমি এ বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর নয়ন
তুষার দেবতা তারা ইন্দ্রনীল মণি জ্বলে দুচোখে যাদের
প্রাকৃত দেবতা তারা বিহঙ্গম তারা মৃত্তিকার

এবং জলের পাখী দেখেছি তাদের—

এই ভাবেই বিষ্ণু দে-র পুরাণ চেতনা বৃত্ত পূর্ণ করে : হয়ে ওঠে জীবনেরই সামগ্রিক ভাষ্য, দেশের জীবনের ঊর্ধ্বচারী ও মৃত্তিকাশ্রয়ী সমগ্রতা, তাঁর কবিতায় নিয়ে আসে সেই মাত্রা, বিস্তার, সংহতি, গভীরতা—যা মহৎ কাব্যেই লভ্য।

বলাই বাহুল্য, কেবল প্রত্যক্ষভাবে নয়, মিথের প্রচ্ছন্ন ব্যবহারও তাঁর অনেককবিতায় আছে। ঘোড়সওয়ার বা জলদাওয়ের মত কবিতায় অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত পুনরুজ্জীবনের, উর্বরতা সংক্রান্ত পুরাণ বয়ে চলেছে। অনেক কবিতার গঠনের পশ্চাতে মিথিক্যাল স্ট্রাকচারও কাজ করছে। কিন্তু একটি প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে তাঁর কবিতায় প্রথমাবধিই। সেটি নরকের প্রসঙ্গ। হোমর, ভারতীয় মহাকাব্য, সর্বোপরি দান্তে তাঁর নরক প্রসঙ্গে মোটিফের ভূমিকা নিয়েছে। এ শুধু ওফেলিয়ার কেবল হেডিসের উল্লেখ নয়, থীম মিউজিকের মতই বারবার এই নরক প্রসঙ্গ এসেছে। নরক সম্প.র্ক বিষ্ণু দে-র দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়েছে, তাঁর পরিপার্শ্বিক, দেশ-কাল-শ্রেণীগত ইতিহাসের পাঠই তাঁর নরক প্রসঙ্গে পরিবর্তন এনেছে, কারণ বিষ্ণু দের নরকও আসলে তাঁর সময়-সমাজের আর্কেটাইপ।

নরক কি এ রকম ? বাংলার গ্রাম ও শহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কেউ বেশ প্রসারে বহরে,
নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে,
রৌরব প্রাসাদে হাসে সাদা কালো গৌরব প্রহরে,
দধীচির হাড় জ্বলে, কি দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে। (১৯৪৪-৪৭)
স্বপ্নে নয়, নরকের পরে এ রচনা।
দেখেছি অনেক পাপ অনাচার মূঢ়ক্ষতি লুব্ধ অত্যাচার
নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে
আমিও শুঁকেছি শকুনের শিবার আহার
অমরার দীপ্ত মনে আমিও ধুঁকেছি, যাত্রীর খাতায়
মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কমেডিতে হাজার হাজার দেহের মনের
অপঘাতে অপঘাতে টুকেছি এঁকেছি
নরকের বহু ছবি আমাদের।...
পিছনে নরক যাত্রা, দীর্ঘ পটভূমি

নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে
হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়
(১৯৪৭-১৯৪৯)

এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে কি আমি শুধু দিশাহারা
এলসিনোরের অলিতে-গলিতে শিউরে ওঠেনি সাড়া ?
শপথ জানাই আমি তো জানাই শপথ।......
এলসিনোরের নরকে দিয়ো না বলি
তোমার এ দিনেমারে। (১৯৪৭-১৯৪৯)

এখানে অভাব মৃত্যু অনাহার অপঘাত সকাল-বিকাল
মাসে মাসে মারীর চড়ক
এখানে অরণ্য নেই, হিংস্র পশু নেই, নেই আদিম মানুষ,......
নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুরও বিকার।
নরকের দাহ দাও নরকের আত্মগ্লানি হে যম জীবন। (১৯৫৮)

নানারূপে তাই নরকের দিনরাত্রি
পদে পদে দেখি কবির ছন্দে, দৈনন্দিন যাত্রী
নরকের পথে গান ক'রে চলি মৃত্যুঞ্জয় মাত্রায়।
তুমিও বন্ধু নরকেই করো হৃদয়ের অভিযান ?......
নরকে কি শেষে রেখে যাবে একা জীবনের সঙ্গীকে ?......
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হে সখা সত্যবান,
নরকে তোমার প্রেমের কলিতে মরণও যুক্তপাণি।......
ছিঁড়ে দাও ভাঙো নরকের মায়াজাল, ...(১৯৬০)

নরক প্রকাশ্য হোক্, ইনফেরনো তখন
অঘমর্ষী উত্তরণ পুরগাতোরিওতে,
যেন হিমপদে চলে কুন্তীর নন্দন......
দুহাতে তুষার ঠেলে নিজ মুণ্ড বয়ে
প্রকাশ্যে নরককুণ্ডে, ভাবে উত্তরণ
পাবে মানবিক লোকে স্বর্গ আমরণ।

প্রত্যক্ষভাবে নরকের কথা আছে, এমন কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। তাঁর চারিদিকের দেশকাল যে নরকের প্রতিরূপ, একথা বিষ্ণু দে বারবার বলেছেন। তাঁর কবিতার প্রতিবাদই এই নরকের বিরুদ্ধে, সংগ্রামও এই নরক থেকে বাঁচবার —কখনও ওফেলিয়া ক্রেসিডা-মহাশ্বেতার উজ্জীবনে, কখনও কাসান্দ্রার রোখে, কখনও চম্পা-লালকমল-নীলকমলের রূপকথায়, কখনও বা প্রকৃতিপ্রেমের সিম্ফনিতে বারবার অস্বীকার করতে চেয়েছেন নরককে বিষ্ণু দে। দান্তের দিভিনা কম্মেদিয়ার উত্তরাধিকারই; এক্ষেত্রে বিষ্ণু দে প্রধানত গ্রহণ করেছেন: নরককে অস্বীকার করেন নি, তাকে পেরিয়ে পুরগাতোরিতে উত্তরণই চেয়েছেন, কারণ তিনি জানেন নরক থাকবেই হবে, এই নরক পেরিয়েই রাবীন্দ্রিক সুন্দর বা সত্য-সুন্দর মঙ্গলের উদার বিরাটে পাখা মেলতে হবে, যার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই মার্কসও। আর একথা জানেন বলেই বিষ্ণু দে আমাদের ইতিহাসের বিকারে, ন যযৌ ন তস্থৌ ব্যঙ্গচিত্রে নরককেও পান না: অথচ নরকের ঐ অগ্নিদাহন না থাকলে তো পুরগাতরি মেলে না। তাই বলেন নরকের দাহ দাও, বলেন নরক প্রকাশ্য হোক। নরক এই ধারণাটি বিষ্ণু দে দ্বান্দ্বিকভাবে প্রয়োগ করেন: চতুষ্পার্শে নরক তিনি চান না, কিন্তু তিনি জানেন যথার্থ নরকের হুতাশনের পরই আসে অমৃত, শান্তি, জীবন, কর্ম। তাই কুৎসিত চরিত্রহীনতায় তিনি নরককেই আহ্বান জানান। জন্মাষ্টমীর অঘমর্ষী জনতার অঘমর্ষী পুরগাতোরিতে উত্তরণ এখনও ঘটেনি। বর্তমানে নরকের ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে সেই স্বপ্নেই কবি আশা খোঁজেন, কারণ স্বপ্নও তো পলায়ন নয়।

বিষ্ণু দে ও মৃত্যুচেতনা

কোন বড় কবিই মৃত্যুচেতনাহীন হতে পারেন না। মৃত্যু যেহেতু জীবন-বহির্ভূত কোন কিছু নয়, জীবনেরই অঙ্গীভূত আর কবির মাধ্যম যেমন শব্দ তেমনি বিষয় জীবন—সেহেতু মৃত্যু তাঁর কবিতায় আসবেই। কিন্তু আসবে কিভাবে, কোন্‌রূপে, তার চারিত্র্য কি হবে, এসবই নির্ভর কবির বিশ্ববীক্ষার ওপর, কবির জীবনবোধের ওপর। বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রবল জীবনবেগে, অন্ধকার অতিক্রমণের দান্তে-রবীন্দ্রনাথের পরম্পরার আধুনিক ব্যবহারে মনে হতে পারে মৃত্যুর চেতনা তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিতার জগতে প্রবেশ করলে ধরা যায়, আদৌ তা নয়; মৃত্যুর বোধ ঔপনিবেশিক পরিবেশে, উত্তর-সাতচল্লিশ পর্বের অবসন্ন নৈরাজ্যে আসতে বাধ্য তাঁর মত আত্মসচেতন, ফলতঃ বৃহত্তর সমাজ-ইতিহাস সচেতন কবির কাছে। কিন্তু বিষ্ণু দে-র দ্বান্দ্বিক চিন্তায় মৃত্যু যেভাবে আসে, সেভাবে নিশ্চয়ই নিতান্ত ব্যক্তিগত স্তরে আবদ্ধ কবির কাছে আসতে পারে না। দ্বান্দ্বিক জীবনবোধেই তিনি জানেন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কিন্তু মানুষের হয় না। আর জন্ম-মৃত্যুর ফ্রেমে আঁটা জীবন তো এই মানুষের বৃহত্তর ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়, দৈনন্দিন জীবনের ধার অলক্ষ্য পরিবর্তনের অথবা একস্রোতে বহে চলা আপাত সাধারণ কিন্তু বীরত্বপূর্ণ সভ্যতার ভিতেই তো মৃত্যু আসে জীবনের সঙ্গী রূপে, কখনও মৃত্যুই প্রতিবাদ, ব্যক্তিগত মৃত্যুর বিষাদ অতিক্রান্ত হয় সময়ের সূত্রে, ঐ মানুষের জীবনস্রোতের গায়কীতে।

সাধারণভাবে যে মৃত্যুচেতনা কবিতায় আসে তা স্মৃতি-নির্ভর। যে বা যা চলে গেছে, তার স্মৃতি, বিনষ্টি নিয়ে আসে বিষাদ—রোমান্টিক বা প্রতীকী বিষাদে কাজ করে এই স্মৃতি। আত্ম-বিনষ্টি, আত্মহত্যার যে চেতনা তাও এই স্মৃতি-নির্ভর, অতীত এখানে বর্তমানকে চেপে ধরে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের সূত্রে নিজেকে ভাষা, অগ্রবর্তী স্বপ্ন দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করা, আশা করাই মানুষকে অনন্য করে তোলে। বিষ্ণু দে সর্ব অর্থেই তাঁর বিশ্ববীক্ষা নির্মাণ করেন, অতীত-বর্তমানের স্রোতকে ভবিষ্যৎমুখী করার লড়াইয়ে, মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে যাবার বাসনায় তাঁর মৃত্যুচেতনা তাই বাংলা কবিতায় অনন্য। তার বিবর্তন লক্ষনীয়।

এ মৃত্যুচেতনা নিতান্ত ব্যক্তিগত চেতনা নয়। এ সামূহিক দেশ কাল সময়ের ত্রিতালের সঙ্গে যুক্ত। এ মৃত্যুচেতনার রূপ নানা, তাৎপর্য বহু। কবি যখন বলেন, "পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে। আমার কামান প্রেতচ্ছায়ার বেশে। চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার," তখন স্পষ্টতঃই মৃত্যুর একবোধ কাজ করে। কিংবা মৃত্যুর যে চিত্রকল্প কবি আঁকেন :

আঁধার এখানে জমে কালো কালো পাথুরে পাহাড়।
রুদন্ত বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত
কৃষ্ণবাস বনানীকে। শালতরু হারিয়েছে সাড়।
রন্ধ্রহীন আর্তনাদে এ আঁধার হেডিসের মতো
হৃদয় ধরেছে চেপে। (চোরা বালি : পৃঃ ১৫)

তাতে শালতরু হারিয়েছে সাড়—মৃত্যুর এরকম চিত্রকল্প প্রবল মৃত্যু-চেতনা না থাকলে আসেনা। মৃত্যুর সব থেকে বড় বিরোধী প্রকৃতি, সব জরা-মৃত্যু জয় করে সৃষ্টির আদি থেকে যে জীবনের জয়ঘোষণা করছে, কেন ভাল, মৃত্যুকে জীবনের ছন্দের অন্তর্গত করে নিচ্ছে। ঔপনিবেশিক শত মারীর মৃত্যুর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই প্রকৃতিকেই তাঁর প্রধান আবেগ করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেখানে শামতরুও তার সব সাড় হারিয়ে ফেলার অর্থ সামগ্রিক মৃত্যুর উপস্থিতি। কিন্তু চোরাবালিতেই মৃত্যু শুধু অন্ধকার নয়, মৃত্যু দিয়েছে আমার হৃদয়ে মৈত্রীর বিষটিকা উদ্ধত উজ্জ্বল (পৃঃ ৫০)। এই দ্বান্দ্বিক টেনশনেই বিষ্ণু দে-র মৃত্যুচেতনা বিবর্তিত হয়েছে। মৃত্যু যে আসলে এক অর্থে বিস্মরণ এ কথা বিষ্ণু দে তাঁর কাব্য জীবনের প্রথম পর্বেই বুঝিছিলেন, মরণ চাঁদের আলোকে কালো সাপের মত কল্পনা করে জিজ্ঞাসা করেন কবি : বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা ? এর অল্প পরেই চোরাবালির শেষ কবিতায় কবি বলেন, 'তুমি চলে গেলে মরণ-মারীচ মায়াবীর ডাকে মূক। বধির ওষ্ঠাধরে।' বধির ওষ্ঠাধর—এক অভিনব চিত্রকল্প, সাড়হীন মৃত্যুর প্রতিরূপ। কিন্তু এই মৃত্যুকে খান খান করে "স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি।" যে মৃত্যুচেতনা স্মৃতিনির্ভর এখানে সেই মৃত্যুচেতনাকে অতিক্রম করছে স্মরণ। বিস্মরণ-স্মরণের এই দোলায় বিষ্ণু দে-র নতুন উত্তরণ-পর্বের মৃত্যুচেতনায় নিয়ে আসছে আরও ব্যাপ্ততাৎপর্য।

পূর্বলেখর পরিবৃত্তিকালীন পর্বেই মৃত্যুর তমসাতীর-এর মত প্রসঙ্গ আসছে। "ধুয়ে গেল রক্ত স্রোত, পাণ্ডুর সান্ধ্যায় নেমে এল মৃত্যুহিম মৌন

গাঢ় নীল"—রংয়ের চিত্রকল্পটিতে মৃত্যুর বর্ণনা। আসলে বিষ্ণু দে-র মৃত্যু-চেতনায় আমি বা বিশেষ ব্যক্তি বড় হয়ে ওঠে না, বড় হয় দেশ, বৃহত্তর একক। "গ্রাম তো হাপর। হাঁপ ধরে সেই মরা ঝরে পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপে ঝাড়ে"—এই বৃহৎ বিনষ্টি, মৃত্যুর বোধে তাঁর চেতনার বিস্তার বলেই, আমাদের রোমান্টিক প্রতীকী কাব্য বোধের অভ্যস্ততায় মনে হয় মৃত্যুচেতনা তাঁর নেই।* অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রবল প্রতিবাদী দৃষ্টান্ত রয়েছে। মৃত্যুর বোধ যে কত গভীর বিষ্ণু দে-র বীক্ষায় তার প্রমাণ এ ধরনের উক্তি: "জলেস্থলে অন্তরীক্ষে ক্ষাত্রমৃত্যু খুঁজে পায় মিতা। রক্তবীজ ব্যাসিলাসে, নিত্য শুনি মরণ সংহিতা।" যে কবি নিত্য শোনেন মরণ সংহিতা, তাঁর মৃত্যুর চেতনা নেই। এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই।

দেশ-সময়-কালের থেমে যাওয়া, বিনষ্টিই বিষ্ণু দে-র কাছে মৃত্যু।

চাকীরা ফিরেছে ঘরে, শূন্য ক্ষেতে খামারে ইঁদুর
সোনালি সূর্যাস্ত শেষ, গোধূলির বিচ্ছিন্ন বিবাদ
পাহাড়ে জমাট, ছোট নদীপথে গ্রামের বধূর
রোমান্টিক ছবি নেই, থেমে গেছে গানের নিখাদ।
পাহাড়ের দিকে ওড়ে শব্দময় অদৃশ্য বাদুড়।
বাংলোয় ব'সে একা নামহীন প্রত্যাশাবিধুর। (একুশ বাইশ পৃঃ ৬৯)

শব্দময় অদৃশ্য বাদুড়—এই চিত্রকল্পেই মৃত্যু ধরা দেয়। গোধূলির বিচ্ছিন্ন বিষাদ পাহাড়ে জমাট—পাহাড় বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রকৃতির উজ্জীবনের অংশ। সেখানে বিচ্ছিন্ন বিষাদ জমাট হওয়ার অর্থ মৃত্যুর সর্ব-ব্যাপকতা, এ এক এমন সময়, দেশ, যখন-যেখানে "স্বপ্নেরা চরম ভয়ে দীপা-বলী কেবল নিভায়।" আবার এই বাদুড়ের পাখার ঝাপটের বিষাদের প্রতিপক্ষেই কবি মৃত্যুর অন্য রূপ দেখেন, "হে কমরেড, মৃত্যু দাও স্বাভাবিক শয্যায় সহজে। স্বাচ্ছন্দ্যে স্বচ্ছ ও সমসমাজের কঠিন কোমল। শিয়রে৷ঘ্রাণ-শিরোধানে। সংসার, দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিকতায়, মৃত্যু আসে অন্য রূপে। মৃত্যুর মধ্যেও তাই থাকে উজ্জীবনের সূচনা:

*বিষ্ণু-দের অনুরাগী কবি মনীন্দ্র রায়ও যেন অভিযোগের সুরেই বলেন "বিষ্ণু দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় মৃত্যু সম্বন্ধে নীরব। বাঙালী প্রগতিপন্থী কবিরা মৃত্যুকে এড়িয়ে গেলেন কেন? মৃত্যুচেতনা ছাড়া জীবনবোধ সম্পূর্ণ হয়?"

আজকে যেখানে জীবন মরণে বাঁধে সেতু
দিক দিগন্তে প্রাণহন্তারা চক্রচর,
শিবির কিনারে নীড় বাঁধে সেথা মীনকেতু।
মরণের তীরে জীবনোল্লাস অগ্রসর। (একুশ বাইশ পৃঃ ৭৯)

কিন্তু চতুর্দিকের বাস্তব মৃত্যুকীর্ণ। জীবনোল্লাসে নিজেকে বাঁধতে গিয়েও কবি পারেন না :

যন্ত্রণার অন্ত নেই, জীবনের মরণে-মাতাল
নীলে নীল যে আকাশ প্রহরীর মিনারে তোরণে।
মরণের যন্ত্রণাই নির্ণিমেষ উৎকর্ণ শিকারী
গবাক্ষে গবাক্ষে, চোখ, মোড়, গলি, রোয়াক, চাতাল
গুপ্ত মন্ত্রণায় কাঁপে যন্ত্রণায়…" (একুশ বাইশ পৃঃ ১২৭)

মরণের যন্ত্রণাকে উৎকর্ণ শিকারীর চিত্রকল্পে বেঁধে নেন কবি—দেখেন "মরিয়া শহর জাগে পৃথিবীর মুমূর্ষু বাতাসে। মরা বাড়ী, মরা পথ"। মরা বাড়ী, মরা পথ, এই চিত্রকল্পেই বিষ্ণু দে-র ঘন মৃত্যুচেতনার বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়। ব্যক্তিগত বিষাদ বা মৃত্যুর রহস্যক্ষমতা নয়, মৃত্যুকে ঘিরে বিপন্ন বিস্ময় নয়, চতুর্দিকের সামগ্রিক মৃত্যু হানে তাঁকে। বাড়ী পথ সবই মরা। অবশ্যই এই মৃত্যুকে কখনোই কবি মেনে নেন না—প্রকৃতির উজ্জীবনেই আশ্রয়েই শুধু অতিক্রম করতে চান না মৃত্যুর যন্ত্রণা শূন্যতাকে, আরও বলেন :

তোমার আমার আজীবন দেহের মনের
কবে তার আমরণ-সম্মিলিত গান
মরিয়া শহরে বর্ষার আকাশে জীবনের মরণের নরকের প্রান্তে তবু
আমাদের দুও কনচেরতান্তে
প্রাণের তরঙ্গে গায় বাদী প্রতিবাদী চরণে-পরাণে বাঁধে ফাঁসি
একান্ত সম্পদে তোমার আমার। (একুশ বাইশ পৃঃ ১২৮)

দাঙ্গার বাংলার বীভৎস মরণেও কবি 'তবু শুকতারা'র কথা বলেন। শুধু তাই নয়, "আগুনে তুষারে নরকের সাদায় কালোয়। ভালো মন্দ জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রণার" সত্তার সংহতিতে কবি পৌঁছাতে চান "মানুষের পরম্পরায়।" বস্তুতঃ মানুষের পরম্পরায় বিষ্ণু দে-র অন্বিষ্ট থাকে বলেই তাঁর কাছে মৃত্যু ব্যক্তি ইতিহাসের মত অত তীব্র ধ্বংসবাহী হয়ে ওঠে না। মৃত্যুচেতনার নানারূপে তিনি স্পৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, কোন রোমান্টিক বিষাদ,

বিনষ্টির বোধ তাঁকে গ্রাস করে না। মৃত্যু তাঁর কাছে জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় আততিতে গৃহীত হয়ে যায়। "ধূর্ত অন্ধকারে ঘৃণ্য মৃত্যুর ধিক্কার"—এড়াতেই তিনি প্রকৃতির অবলম্বনে নিজেকে বাঁধেন ঃ

আমি বাংলার লোক, ছিন্ন ভিন্ন আমার জীবনে,
রৌদ্রময় সামুদ্রিক এই রক্তে, এই নদী এই মাঠ আম জাম বনে
ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষার নূতন নূতন হর্ষে বলিষ্ঠ বিস্তার।

(একুশ বাইশ পৃঃ ২৭৯)

এই দ্বন্দ্বময় মৃত্যুচেতনাই ধীরে ধীরে বিষ্ণু দে-র কাব্যে নতুন অর্থ পেল। জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বময়, মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনকে আঁকড়ে ধরা নয় মানুষের প্রকৃতির পরম্পরায়, এবার দেখা গেল অন্ধকার ও মৃত্যু এক নতুন চেতনায় বিধৃত। অন্ধকার ও মৃত্যু আর নঞর্থক কিছু নয়, নেতি নয়। যখন কবি দেখেন, তাঁর বাস্তব অবসন্ন চরিত্রহীন বাস্তব, এ নরকও নয়, এখানে আশা নেই, জীবনের ভাষা নেই, এখানে অবিরত মড়ক, তখন মৃত্যু, অন্ধকার, নরক আর তাদের নঞর্থক অনুষঙ্গে আসে না। তখন তারা হয়ে ওঠে সদর্থক। কবি তাই নরককে প্রার্থনা করেন, "জীবন-মৃত্যুর এই গোধূলি"তে তিনি নরকের রৌদ্র, মৃত্যুর কালবৈশাখী চান। কোণাক দেউলে তিনি দেখেন "ভিতরে কিছুই নেই, মৃত্যুও বিলীন।" 'মৃত্যুও বিলীন' শব্দ দুটিতেই বোঝা যায় মৃত্যুও সদর্থক, শূন্যের উদ্‌ভ্রান্ত দেশব্যাপী অন্ধকারকেও তাঁর মনে হয় কার প্রতিবাদ? আসলে ভারতীয় বাস্তবের গোধূলি পর্যায়ে, ন যযৌ ন তস্থৌ বিকারে মৃত্যু কোন সর্বনাশ নয়, বরঞ্চ বাস্তবকে সঠিক চেনবার মাধ্যম। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন তার চেহারাকে স্পষ্ট করে পায়। মৃত্যুর অশ্রুই মজ্জার অবসাদকে ভাঙতে পারে, যন্ত্রণার বাণী ছড়াতে পারে সজল শিকড়ে, রূপান্তরে আনতে পারে প্রাণ, প্রতিবাদে স্পষ্ট বাক্ করে তুলতে এই চরিত্রহীন অস্তিত্বকে, বিপ্লবের কালে যেমন মৃত্যু আসে জীবনেরই করতাল বাজিয়ে। "পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্র মৃত্যুর সীমায়", দামিনীর প্রতীকে উত্তরণের এই অন্বেষা বিষ্ণু দে-র বীক্ষায় বরাবরই। কিন্তু এটা তব শূন্য শূন্য নয়ের সংগ্রাম, মৃত্যুর সদর্থক প্রতিবাদী দিকটি তাঁর কবিতায় স্পষ্টভাবে উপস্থিত হতে থাকে ক্রমশঃ, কিন্তু এর অর্থ এই নয় তিনি মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে গেছেন, মৃত্যু চেতনাহীন। সে ব্যক্তির কথা তিনি বলেন যে "ভিনদেশী অদ্ভুত, তাই দৈনিক সে দিয়ে

যায় দাম মৃত্যুর মোদক কিনে।" আসলে একটি জীবনের অবশেষই বিষ্ণু দে-র কাছে মৃত্যু নয়। দামিনীকে যে কবি বলেন :

আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্ত তোমার শরীরে।

(স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ পৃঃ ১০১)

এ মৃত্যুতো বাঁচাই। সমুদ্রে যেন মরি, আসলে তো জীবনকেই বড় করা। সার্থক জীবনের ছন্দময় পরিণতি তো মৃত্যুই, এ মৃত্যু জীবনের সহোদর। বিষ্ণু দে-র মৃত্যুচেতনা আরও ব্যাপ্ত: অনম্বয়, ভবঘুরে সমাজের ক্লান্তি, অবসাদ, বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কশূন্যতা তাঁর কাছে মৃত্যু। বাঁচবে না তবে গ্রামের মরাই মরবে শহরতলী—এই মৃত্যুর চেতনাই বিষ্ণু দে-র বীক্ষায় বড় হয়ে দেখা দেয়। জন্ম-মৃত্যুর দোলা তাঁর কাছে স্বাভাবিক, অন্ধকার আলোর বিরোধী নয়, সেই অন্ধকারই তিনি চান। আলো-অন্ধকারের দ্বন্দময় কালের মন্দিরায় যে জীবন বাঁধা, শুদ্ধ অন্ধকার যে আসলে জীবনেরই বিস্তার, সে কথা বিষ্ণু দে জানেন। ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে, যিনি লেখেন, তাঁর কাছে মৃত্যুর অভিধা ভিন্ন—ট্র্যাজিক উল্লাস, এই প্রচলিত চিন্তাবিরোধী শব্দবিন্যাসে ধরা পড়ে তাঁর জীবনবীক্ষার তাৎপর্য। সমগ্রের দুরূহ সাধনায় তিনি পেরিয়ে যান ব্যক্তিনির্ভর মৃত্যুচেতনা। মৃত্যু আসে নানা মাত্রায়—ব্যক্তিকে যেহেতু তিনি প্রকৃতি, অন্য মানুষ, দেশ-ইতিহাসের ত্রৈমাত্রিক পটে সংলগ্ন করে দেখেন, সেহেতু মৃত্যু তাঁর কাছে দেশ-সমাজ-সময়-ইতিহাস-মানুষ সব মিলিয়ে। বিচ্ছিন্ন মানুষের মৃত্যুর বিষাদ তাঁর কাছে অন্ধ ঝোঁক :

যে মনে মানুষ খোঁজে অন্ধকার স্নায়বিক ঘোরে
মৃত্যু, একঘেয়ে ঘোরে ভাবে আত্মহত্যাই কেবল
তার সমাধান, ...
লক্ষ্য একেবারে ভ্রষ্ট, রৌদ্রের সার্বতোভদ্রে তাই লক্ষ্যহীন
মৃত্যু কিংবা আত্মঘাত চেয়েছে সঙ্গীন।

(স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ পৃঃ ১০৪)

এই ঝোঁক বিষ্ণু দে-র বীক্ষায় কাটতে পারে, সেই শালবনের কন্দরে ঘরের দাওয়ায়, যেখানে "ঘনিষ্ঠ আদরে গৃহস্থেরা সুখী হোক দুটি পাখি ডাকে এক স্বরে।" গৃহস্থের জীবন, বিষ্ণু দে-র কাছে ক্লান্ত অবসন্নতার প্রতিরূপ

নয়, এ সেই জীবন যাকে আজ নতুন ইতিহাস চেতনায় ভিত ভাবা হচ্ছে জীবনের পরিবর্তনের—এ সেই সুখদুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর ছন্দময় মেটেরিয়াল লাইফ। বর্তমানের লোভ, মৃত্যু সেটাই যা "গৃহস্থের আম জাম শেষ ক'রে আজ মারে বন।" এই জীবনের, প্রকৃতি লগ্ন জীবনের বিপক্ষেই তো মৃত্যু :

অথচ শহর কিবা আমাদের ? অপ্রাকৃত, কৃত্রিম আদিম,
প্রকৃতি বিরোধী, শুধু বিকৃত বর্বর।
স্তব্ধ মরণের তলে আমার শুনিয়া নয় হিম,
আমাদের এই শোক, প্রতিদিন সে গাঁথে কবর।

(স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ পৃঃ ১০৯)

আর এ মৃত্যু আমাদের বিকৃত শহুরে উৎসবেও।

"কে জানত গানেই চিত্ত খান খান, মগজের শিরা
ছেঁড়ে, ভেঙে যায় হনু ?...
সুরকে অসুর করে ভূতুড়িয়া সংস্কৃতি বিলায় লাউড স্পীকারে।
পাড়ায় পূজায় কিংবা বিয়ে কিংবা ভাতের উৎসবে
ভয় পাই, কারণ জীবন তাতে পিছু হাঁটে, মৃত্যুকেই ডাকে,
চৈতন্যের মৃত্যু চায় গালে কিংবা বোমায় পটকায় মত্ত কলরবে।

(স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ পৃঃ ১১৯)

এই চৈতন্যেই মৃত্যুই বিষ্ণু দে-র কাছে ভয়াবহ, মারাত্মক। বস্তুতঃ বাংলা কবিতার পরম্পরায় এই অভিনব মৃত্যুচেতনা বিষ্ণু দে-কে অনন্য করেছে : দ্বন্দ্বময় জীবনের সমগ্র সন্ধানী এ চৈতন্যের প্রারম্ভ সূত্র নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র আগে বাংলা কবিতার একমাত্র দ্বান্দ্বিকবীক্ষার কবি, অবশ্যই মহাকবি। বিষ্ণু দে-র সমগ্র মৃত্যুর চেতনাতে মাঝে-মধ্যে প্রায় উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন :

"একী অভিশপ্ত দেশ, তিক্ত রৌদ্রে শূন্য মরুভূমি।
চৈতন্যেও নিরুদ্দিষ্ট নির্মীলিত নিরাকার ঘৃণা।
কালবৈশাখীর নিত্য নিয়ন্ত্রিত প্রতিবাদ বিনা
ঈশান উমার বিয়ে সে কোন্ শ্মশানে তা জানি না ;

(স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ পৃঃ ১৫০)

সুদীর্ঘ বেঘোরে ঘোরা আর কাজ করা—
কিন্তু কিবা কাজ ? বাঁচা ? প্রাত্যহিকে মরা ?

(চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর পৃঃ ১৫)

এই প্রাত্যহিকে সবাই বিষ্ণু দে-র মৃত্যুচেতনায় বিনষ্টি, ধ্বংস, অবসন্ন শেষ হওয়া।

অবশ্যই বিষ্ণু দে-র বীক্ষায় এ মরা শেষ কথা নয়। তাঁর কবিতার মহাসমুদ্রে নব নব অভিযান এ মৃত্যুর প্রতিবাদেই, তাৎপর্যপূর্ণ মৃত্যুও এ সবার বিরুদ্ধে উদ্যত থাকে তাঁর কবিতার জগতে। চতুর্দিকের অভিশপ্ত মৃত্যুর মাঝখানেও বিষ্ণু দে জ্বালিয়ে রাখেন দামিনীর বাঁচবার সাধের আলো, জ্বালিয়ে রাখেন মৃত্যুর অন্ধকারের শুদ্ধ পরিণতি, জ্বেলে দেন জীবনের প্রকৃতির উজ্জীবনের শিখাটি। এ ঠিক মূলহীন আশাবাদ নয়, সব মরার শেষে ভাল কিছু হবে, এ ধরনের প্রচলিত আস্তিক্য নয়। দেশ-সমাজ-ইতিহাসের সঙ্গে লগ্ন ব্যক্তির ক্লিন্ন মৃত্যুকে অতিক্রমণের বীরত্বপূর্ণ কবির প্রচেষ্টা এই বীক্ষা—নরকও এই অতিক্রমণের সহায়ক। "ধোঁয়ায় দূষিত শতাব্দীরা তাই বুঝি মরে, ঝরে উড়ে যায়!/ ইতিহাস কেন এই কলুষিত ভুল, স্থূল, ভুল?"—এ প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িত থাকে ট্র্যাজিক কিন্তু পুনরুজ্জীবনের বীক্ষাটি। প্রশ্নটি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে প্রায় টেস্টামেন্টের মত—

এ কি এ মৃত্যুর আলো? জ্যোৎস্নারাতে কলুষের গ্লানি?
ভয় পাও? মানবিক মন চায় মৌলিক সত্তার
কলুষিত মধ্যরাত্রি? নাকি চায় প্রাগুষার শান্তি?
শান্তি কি কেবলমাত্র জীবন-মৃত্যুর ঘোলা ক্লান্তি?
আলো প্রায় অন্ধকার, তাও শুচি অন্ধকার নয়,
যেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পক্ষপাতে জীবন্মৃত,
গ্লানির ক্লান্তিতে পঙ্গু, মূঢ়, একা মূলত আত্মহা।

(চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর, পৃঃ ১১)

জীবনমৃত্যুর ঘোলা ক্লান্তির বিপক্ষেই তো কবি চান প্রণয়, যে প্রণয় নিশ্চয়ই মৃত্যুহীন নয়, কিন্তু সে মৃত্যু মহীয়ান, ক্রান্তির গুণগত উজ্জীবনে উজ্জ্বল:

বলি: ছবি আঁকো দাদা, প্রলয়ের পতন-উত্থান
আকাশ-পাতালে জোড়া, পূর্বে ও পশ্চিমে
আগ্নেয়গিরির শোনো দেখ ঐ গান,
উত্তর-দক্ষিণ-জোড়া অগ্নিঢালা হিম।

(চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর পৃঃ ১৪)

গেণিকার পরের যে চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর তাতেই আসতে পারে ঘোলা

মৃত্যুর ক্লান্তির অবসান। স্পষ্টই তিনি বর্তমানের আশাহীন ভাষাহীন জীবনের প্রাত্যহিককে বলেন :

মড়কে না, প্রচ্ছন্নে না, পাশার সভায়, নরকের
নগ্নদাহে সমাধান চাও। আর সেই ধর্মের বকের
মতো ওঠো অগ্নিকুণ্ডে, আর উজ্জীবনে ডোবো, নাচো।

(চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর পৃঃ ৩৫)

নরকের নগ্নদাহে যে সমাধান প্রার্থিত, তা কিন্তু বৃহত্তর মৃত্যু চেতনার অঙ্গীভূত। এ মৃত্যু, সেই বাস্তবের পরিপন্থী, যেখানে "সারাদিন গৃহহীন ঘোরে খেদানো কয়েক পাল জারজ কুকুর।" আসলে মরা ও মৃত্যুর এই দ্বৈতরূপ—খিন্ন অবসন্ন চরিত্রহীন মরা, আর তার প্রতিবাদে উজ্জ্বল মৃত্যু—তার, দ্বান্দ্বিক বীক্ষাতেই বিষ্ণু দে মৃত্যুচেতনা স্বকীয় তাৎপর্য পায়। একটিতে থাকে প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত দুস্থ মরে যাওয়া, আর একটিতে জীবনেরই উল্লাস, প্রতিবাদ। এর সঙ্গে থাকে বাঁচার অন্যমন্ত্র :

ভিজে হাওয়া ওঠে, নামে, ক্ষ্যাপে, ছোটে মেঘ অবিরাম।
মাঠে যেতে শোনা যায় : বহুত বহুত আজ কাম।

(চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর পৃঃ ২২)

কৃষকের এই কর্মিষ্ঠ আবেগেই কাটতে পারে অবসাদগ্রস্ত মৃত্যুর সীমা। বন বা বাগান দুইই মরা, মাঠ প্রান্তর উলঙ্গ—গ্রাম একপক্ষে মৃতপ্রায়। কিন্তু এর মধ্যেই "শোনা যায় সেই মানুষই আসছে কার্ভঙ্গে সীতা; যন্ত্রণার নন্দিত বৈভবেই এই মরা অস্তিত্ব কাটে। বর্তমানের গোরে বা শ্মশানে ও স্বদেশে কিংবা বিদেশে কবি আশা রাখেন "হয়তো-বা অতলান্ত সাগরের ঝড়ে ঝড়ে বেঁচে যাবে সাহসী নাবিক।" এ আশা কোন ব্যক্তিগত নয়, ব্যক্তিতে ও নৈর্ব্যক্তিকে নৈরাশের পরপারে ক্ষয়হীন আশার কথাই তিনি বলেন, মাঠে ক্ষেতে বহুত বহুত কামের সংগ্রামী আবেগ যার ভিত্তি।

এ যেন বা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, রচে নব্য নব্য কুরুক্ষেত্র।
ভূগোলে ও ইতিহাসে অস্থিসার অতীতে না, দৈনিকের
বর্তমানে, আর যেন দেখা যায় সমাসন্ন ভবিষ্যতে।...
তাই আশা চেতনায় যুক্তিযুক্ত। বিংশোত্তর বিশ্বে বাঁচে প্রাণ।

(চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর পৃঃ ৫৭)

সমগ্র দ্বান্দ্বিক বোধেই বিষ্ণু দে চতুর্দিকের ভগ্নস্তূপেও তাঁর মৃত্যুচেতনাকে,

জীবনাবেগকে বিনষ্টির ধ্বংসের, মরে যাওয়ার প্রতিপক্ষে দাঁড় করান। ইতিহাস, স্বকাম যেন দৃপ্ত্ আবেগে বলে ওঠে :

দিনগত পাপক্ষয়—পাপ কার ? যতই নিষ্ঠুর হোক
প্রাত্যহিক মৃত্যু শতবেশে
যত গ্লানি যত লজ্জা দুঃখশোক
নানা ছলে ছড়াক না আপাতত হতাহত দেশে,
তবুও মানব না গ্লানি এই হোক দেশব্যাপী রোখ,
গোটা বিশ্বে প্রকৃতিস্থ হব ব্যর্থ কান্না ছিঁড়ে হেসে।
তাই শূন্য শূন্য নয়।
তাই ব্যথাময় বাষ্পে পূর্ণ রক্তাক্ত গগন।
একা একা এ অগ্নিতে বহুলোকে দীপ্তগীতে
জ্বলি জ্বালি—যদি শূন্য পূর্ণ অংশুমালী হয়,
যদি তবে সৃষ্টি তূর্ণ কথা কয়
নন্দিত ষড় ঋতু সমাগমে—
স্বপ্নে যা প্রকৃতই প্রাত্যহিক মানবজীবন।

এ ভাবেই বিষ্ণু দে-র মৃত্যুচেতনা নিয়ে যায় রক্তাক্ত গগনের লড়াইয়ে, শূন্য পূর্ণ অংশুমালী হয়ে ওঠে, স্বপ্নের প্রাত্যহিক জীবন দ্বার খোলে—মড়ক, মরে যাওয়া, বিকারের ওপারে আর এক জগৎ আসে, দেখা দেয়, যে জগতে মৃত্যু অঙ্গীকৃত, যে জগতে মৃত্যুই প্রতিবাদ আবার জীবনাবেগে ইতিহাসের পরম্পরায় উত্তীর্ণ।

বিষ্ণু দে ও এলিঅট

যে-কোনো সৎ শিল্পী, সাহিত্যিক বা কবিকে জীবনের প্রতি একটি দৃষ্টিভঙ্গি একটি অ্যাটিট্যুড গড়ে তুলতেই হয়— স্থানু না হলেও একটি তত্ত্ব-সংগঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হয়তো সেই তত্ত্ব মাঝে মাঝেই কবির কাজে ভেঙে পড়ে, চলিষ্ণু কবি আবার তাকে বাঁধেন নতুন করে, কয়েকটি আবেগে, পুরুষার্থে। কবি ও জগতের, শিল্পী ও বিষয়ের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কে আত্তীতে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে বিশিষ্টতা দেয়, তাৎপর্যপূর্ণ করে। যুগ ও সমাজের চাপ এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়াতে নিশ্চয়ই কার্যকর—এমন কী:আপাতভাবে অকিঞ্চিৎকর, অন্যের কাছে অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বা জগৎই কোনো কবির সৃষ্টিময়তায় কাজে লাগে, তার পক্ষে হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। এলিঅটের কাছে ধর্ম যেমন বিষয়ীর আত্মবিসর্জনের নৈর্ব্যক্তিকতায় নিয়ে গিয়েছিল, যার সমর্থন তিনি নাকি তাঁর ধর্মীয় অথচ অসামান্য শিল্পব্যাখ্যায় পান কিংবা আরও বড় উদাহরণ আমাদেরই রবীন্দ্রনাথ—উনিশের শতকের কলোনির অষ্টাবক্রতায়, বাস্তবের আপাত-চরিত্রহীনতাতেই তিনি কয়েকটি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধের আবেগে বাঁধেন তাঁর কালের দ্বন্দ্বময়তাকে, দোলাচলকে। তাঁর তত্ত্ববিশ্ব ও শিল্পসাহিত্যকর্মে যেমন বড় রকমের একটা মিল, তেমনি একটা অনিবার্য বিরোধ উহ্য, যদিও থেকে-থেকে কম বা বেশি দেখা যায় তাঁর কবিত্বে এবং প্রায়শই তাঁর চিত্রপ্রেরণায় আর প্রবীণ বয়সের স্বাধীন বা স্বাভিভাবক বহু গানে ও গীতিনাট্যে তত্ত্ব যায় হেরে। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে এই তত্ত্বসংগঠন না করলে রবীন্দ্রকীর্তি থাকত অনেকাংশে মূক, অপ্রকাশিত। বস্তুতঃ এই তত্ত্বসংগঠন ও শিল্পের প্রকাশের তাগিদে তার অতিক্রমণ— প্রাণময় কবিরই কাজ। কিন্তু মহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে ঐ আবেগ, ঐ জগৎনির্মাণ, ঐ তত্ত্বসংগঠন অবশ্যম্ভাবী। এই জগৎনির্মাণেই, তত্ত্বগঠনেই কবি চতুর্দিকের বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচেন জীবন ও শিল্পের দুমুখো শিং দুটিকে ধরেন—অবশ্য যদি ঐ তত্ত্ব ও আবেগ দেশ কাল চেতনায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়, দ্বন্দ্বময় হয়। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী বাঙালী কবিদের ক্ষেত্রেও তাঁদের মানসজগতের, মুখ্য আবেগের তত্ত্বসংগঠনের খোঁজ নিতে হয়। বিশ শতকের কুড়ি-তিরিশের দশকে বাঙালী কবিদের এলিঅট-চর্চা এই তত্ত্বসংগঠনেরই অঙ্গ—

এরই কাব্যের মুক্তি সন্ধানের প্রচেষ্টা। অন্ততঃ একজন কবির ক্ষেত্রে—যিনি শেষ অবধি দেখা গেল সর্বাপেক্ষা চলিষ্ণু ও প্রাণময়—এলিঅট-চর্চা তাঁর তাত্ত্বিক জগতের টানেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ তাঁর অর্থাৎ বিষ্ণু দে-র তত্ত্ববিশ্বই চতুর্দিকের বিশৃঙ্খলার মধ্যে, কবির আত্মরক্ষার ও আত্ম-বিস্তারের আবেগেই এলিঅটমুখী, এলিঅটের ঐতিহ্য-চিন্তামুখী তাঁকে করে তুলেছিল। যে দ্বন্দ্বময়তায়, সংহতি বিস্তৃতির দ্বন্দ্বে মানুষ সমাজ ও প্রকৃতির আততিতে কবি তাঁর আবেগকে বাঁধলেন সে আবেগেই তিনি এলিঅটকে পেলেন অগ্রজ হিসাবে, আশ্চর্য, উভয়ের মতামতের মেরুপ্রমাণ ব্যবধান সত্ত্বেও। তাঁর তীব্র আত্মসচেতনতায় এলিঅট-চর্চা আধুনিকতার চর্চার আরেক দিক হিসাবেই দেখা দিল বাংলা দেশে।

বিশ শতকের কুড়ির-তিরিশের কোনো সচেতন কবির যে মানসজগৎ তৈরি হয়, যে আবেগে তিনি তাঁর কবিতাকে বাঁধেন, তাতে অনেক কোণ, দেশকালের চাপে তা অনেক বক্র, প্রায়শই দীর্ণ। কূপমণ্ডুক ব্যক্তিগতর দেয়ালেও তিনি বাঁধা পড়তে পারেন, বাঁধা পডতে পারেন উচ্চকণ্ঠ শ্লোগানে —বহির্জগৎ থেকে, বাস্তব্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্লান্ত নীড়সন্ধানীও হওয়া অস্বাভাবিক নয়, আবার লোকদেখানো 'প্রেম ঈশ্বর মানিনা' কিশোরোচিত বিদ্রোহেও মাততে পারেন। বিষ্ণু দে এই সব ভ্রান্তিই এড়িয়ে যান তাঁর মানসজগৎ নির্মাণের তাঁর তত্ত্বসংগঠনের যাথার্থ্যে—স্পষ্টই বলেন যে-কোনো ব্যক্তি যাই হোক না কেন, সিরিয়স লেখক বা শিল্পী বা নিছক ফেবিআনদের বা আরো কোন কুসংসর্গে পড়া ভালো একজন মানুষ, তাকে তো জীবনের বাস্তবতার মধ্যে ডুব দিতেই হয় এবং তদুপরি লেখক সর্বকালেই একজন সামাজিক মানুষ। যতই অস্বচ্ছভাবে বা এমনকি স্ব-বিরোধী ভাবে হোক একজন কবি বা শিল্পী বিকাশের নিয়মকানুন তো বোঝেন, যা তাঁর বিশেষ প্রতিভা তাঁর সামাজিক সম্বন্ধ অর্থাৎ তাঁর সমগ্র সত্তা তাঁর কাছেই দাবি করবে দূরদৃষ্টি ও নিয়মানুগত্যের নিজস্ব লজিকে। বাস্তবিক নিজের সত্তার গভীরে বাস্তবের যন্ত্রণাবোধ নিয়েই যাত্রা শুরু করতে হয় নিজের সত্তা আবিষ্কারের পথে অবিরল বিমূঢ়তা ও শক্তি অর্জন করে, এবং সেই আবিষ্কারই তো মানুষের অহম্ ও তার সামাজিক জীবনের ফসল। বিষ্ণু দে আরও বিস্তারিত করে বলেন যে, তত্ত্বগতভাবে আমরা সকলেই জানি যে, এই সত্তাকে বিকশিত করা যায় কিংবা অর্জন করা যায়, যদি আমরা নিজেদের সক্রিয়তায় সংলগ্ন

করে দিই সেই মানবিক দৃশ্যে যার মধ্যে আমরা জন্মেছি ও সেই সামাজিক দৃশ্যে যেখানে আমাদের ইতিহাস এবং আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং যা বাস্তবিক পক্ষে সৌন্দর্য ও আমাদের বিশ্বলোকের বদান্যতা ও ঐশ্বর্যের বাদপ্রতিবাদে সক্রিয়। স্পষ্টতঃ সক্রিয় দ্বন্দ্বময়তায় সামাজিক ও মানবিক দৃশ্যের সংলগ্নতায়, বাস্তবের যন্ত্রণাবোধ থেকে সত্তা আবিষ্কারে বিষ্ণু দে গঠন করেন তাঁর তত্ত্বজগৎ, যেখান থেকে তাঁর কবিতাই জল হাওয়া পায়। এই তত্ত্বসংগঠনই আরও স্পষ্ট হয় : মনে প্রশ্ন জাগল তাহলে মুক্তির পথ কোথায়? চিন্তার সংহত জগৎ নিঃসন্দেহে আমাদের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু সেই দেশকে আমাদের বহু শোষিত ও বিমূঢ় সমাজে হৃতমানবিকতার স্তরের দারিদ্র্যের মধ্যে কোনো কালোচিত অর্থে আধুনিক বা উপযুক্ত বিশ্বতত্ত্বই আমাদের জীবনকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি। আমরা অনুভব করেছিলাম যে ইতিহাস মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড জগতের জন্যই কাজ করে, কিন্তু একই গতিতে বা একই পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই নয়। কারণ—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ যা বাস্তবজীবনের উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত না করুক, অন্ততঃ আকার দান করে, তার তারতম্য ঘটে এবং ফলতঃ তার রূপ ভিন্ন হয়। ঠিক তেমনি মানুষের ভূমিকারও উপাদানে বিভিন্নতা ঘটে। শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে এই তত্ত্বসংগঠন এই প্রজ্ঞাই তাঁর জগৎ গঠন করে। তাঁর স্থান-কাল-চেতনা বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের আততিজনিত কাব্যবোধ ও কাব্য-প্রয়াসের ভিত্তিও নির্মাণ করে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্পষ্ট করে : মার্কসের চিন্তা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না, অনুকরণও করা যায় না। মার্কসের চিন্তার মধ্যে বাস করা, তা নিয়ে কাজ করা তাকে আত্মসাৎ করার চেষ্টাই শুধু করা যায়। আমাদের অন্ততঃ সীমান্তের মুখোমুখি হতে হয় : আমাদের চার-পাশের প্রকৃত জটিল জীবন এবং যে সাংস্কৃতিক পরিবেশে আমরা কাজ করছি তার বাইরের রূপ, একজন লেখকের সাংস্কৃতিক ও বিশেষভাবে সাহিত্যগত অতীত ও বর্তমানের অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ সমস্যাবলী। নিজের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বোধের অন্তস্তলে নেমে যেতে না পারলে নিজের ভাষায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য করা তো সম্ভব নয়—বিদেশী গুরুর ভাবধারা প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল যাই হোক না কেন, তাকে অনুসরণ করে বেশি দূর যাওয়া অসম্ভব। বাগর্থ ও নন্দনতত্ত্বের সার্বভৌম নিয়মগুলো প্রয়োগের বেলায় বাহ্যিক-গঠনের দিক থেকে স্থানগত ও জাতিগত প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই

বোধই, বিষ্ণু দে-র মার্কসীয় ভাবনাই বর্তমান ও অতীতকে স্পষ্টরূপে, প্রক্রিয়ার মৌল স্থায়ী দিকগুলোকে যথাযথ চিনে নিতে সাহায্য করেছিল। এই ভাবেই বিষ্ণু দে তাঁর জগৎ, তাঁর তত্ত্ববিশ্বকে নির্মাণ করলেন – ভারতবর্ষের, তার এক প্রদেশের সামাজিক দৃশ্য, মানবিক দৃশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যে, বিষ্ণু দে দ্বন্দ্বময় সংলগ্নতায় তাঁর আধুনিকতার ভিত্তি গড়ে তুললেন— নিজের সত্তার গভীরেই এক যন্ত্রণাবোধ থেকে। সরলীকরণে নয়, মনের প্রস্তুত ভাবের সক্রিয় অবস্থায় তিনি জটিল দেশ ও কালকে রূপ দিতে চাইলেন। অথচ বিপদ ছিল। একদিকে শিল্পের জন্যই শিল্পের, রাজনীতি নয় শুধু সংস্কৃতির শৌখিনতায় তখন বাংলাদেশে অনেকেই ভাসছেন, আবার উল্টোদিকে রাজনীতিতে মার্কসবাদ যতটা দ্রুত রূপ পায়, শিল্প-সাহিত্যে সেভাবে পায় না। এখানে সরলীকরণের ঝোঁক প্রবল থাকে কার্যকারণের সব কিছু তাল-গোল পাকিয়ে যায়। এই দুই ঝোঁকের বিরুদ্ধে বিষ্ণু দে-কে প্রায় একাকীই সংগ্রাম করতে হয়—'রাজায় রাজায়' প্রবন্ধে যার পরিচয় রয়েছে। অথচ তিনিও জঁা পল সার্তর-এর মতো বুঝেছেন বিশ শতকে জ্ঞানের দিক থেকে তত্ত্বের দিকে মার্কসবাদের ওপারে যাওয়া যায় না। এই আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানকে অস্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শিল্প সাহিত্যে তার বিড়ম্বনাও চোখে পড়ছে—মার্কসবাদের নামে নানা ভ্রান্তিতে। সেই সময়েই সুধীন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গেই এলিঅটকে পেলেন, মার্কসবাদীর দৃষ্টিতেই কাব্যের মুক্তি, সাহিত্যের গতিতে এলিঅটের যাথার্থ্য তাঁর কাছে ধরা পড়ে, এলিঅটের করুণ রাজনীতি সত্ত্বেও। বিষ্ণু দে-র এলিঅট-চর্চায় এঙ্গেলস-এর বালজাক-সম্পর্কীয় মন্তব্যের প্রজ্ঞাই উদ্ভাসিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের, আত্মসচেতন কবিদের রবীন্দ্রনাথের আত্মস্থতা লভ্য নয়। "...যে কারণেই হোক সে আত্মস্থতা হল দ্বিধান্বিত, প্রশ্নদীর্ণ, লজ্জিত, সংকুচিত। ব্যক্তি ও বহির্বিশ্বের সম্বন্ধের মননে যে দ্বন্দ্বময়তায় বা মার্কসীয় ডায়ালেকটিকসে আত্মসচেতনতার তীব্রতা, সে ক্রান্তিময় সম্বন্ধেই এল যুগান্তর, এল জিজ্ঞাসু আত্মসংকোচন, যায় ফলে কণ্ঠ হল কথা উচ্চারণের পক্ষে উপযুক্ত প্রাত্যহিক, রূপকলেখায় আত্মপ্রত্যয় আর রইল না, দিব্যবাসীর ঋষিসম্ভব নিশ্চিত হল সুদূরপরাহত।" বস্তুতঃ এর পরে এলিঅট ন্যায্যতই আসেন—কারণ তিনি আত্মসংকোচনের সমন্বয়কার খণ্ড-চৈতন্যেরই মহৎ কবি। কিন্তু এলিঅট কেন? "মনে পড়ে মার্কস-এঙ্গেলসকে

অনুধাবন করার পর টি, এস, এলিঅট আমাদের এই অনুসন্ধানে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন—সমকালীন পশ্চিম ইয়োরোপের যন্ত্রণাবোধ এই সুকবির মধ্যে ছিল এবং সমালোচক হিসাবে তিনি সজীব সৃষ্টিশীলতা ও তার পক্ষে প্রয়োজনীয় শিকড়ের গঠনকার্যের সূক্ষ্ম সমাস্যাকে চকিত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছিলেন।" অন্যত্র লেখেন, "বিষয়ের বা বস্তুসত্তার অনুরাগে অন্তত সেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি আসে, যাতে জীবনের বহুব্যাপ্তি সমগ্রতার আভাস পায়, যাতে শিল্পরূপ ও শিল্পবস্তু একটি সক্রিয়তার দুটি দিক বলে বুঝি। ইংরেজী সাহিত্যে এলিঅট প্রায় পেয়েছিলেন এই বিষয়-সমাধি।" আরও স্পষ্ট করেই বলেন, "খণ্ডচৈতন্যের এমন একাগ্র উপলব্ধিও এমন কাব্যসমৃদ্ধ রূপ এবং তার থেকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কাব্য-জগতে এলিঅটের দান।" বাস্তবিক মার্কসবাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কেই স্পষ্ট লেখেন তিনি, "…যারা এক দাগ ওষুধের মতো পাঁজির বর্ষফলের মতো মার্ক্সিসমের চটক ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন, তাদের নিজেদের মনগড়া ছক্ থেকে দূরে যাবার প্রতিবিপ্লবী ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এলিঅটের নৈর্ব্যক্তিকতার তীব্র চেষ্টা এর চেয়ে প্রগতিবান। তাঁর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ব্যক্তিগত বিশৃঙ্খলা বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষে দানা বাঁধতে পারে। সে কৈলাস-ভাবনা থেকে তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিস্তার আনা সম্ভব, দৃশ্যটা অন্ততঃ আয়ত্তে আসতে পারে।" স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বিষ্ণু দে-র এলিঅট-চর্চা নিতান্ত খাম-খেয়ালি বিদেশী কবি ভালোলাগা মন্দলাগা নয়—তিনি যে বিশ্ব নির্মাণ করেন তারই তাগিদে কাব্যের মুক্তি আভাসিত হয় এলিঅট-চর্চায়। এলিঅটের কাব্য যে, দ্বন্দ্বময় জীবন ও শিল্পের দ্বৈতাদ্বৈতে এযুগে মার্কসবাদীর সহায়ক, সহায়ক কাব্যে আধুনিকতার স্বরূপ নির্মাণে—এ কথা বিষ্ণু দে তাঁর তত্ত্ববিশ্বের, বোধের যাথার্থ্যেই বুঝলেন। এই এলিঅট-চর্চায় বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা দেশের কাব্যবোধ, কাব্যপ্রয়াস ও আধুনিকতার চেতনা অঙ্গাঙ্গিভাবে-সম্পৃক্ত—তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেন এলিঅটকে। আর এলিঅট-ভাবনা তাই বাংলা কাব্যের এ যুগের সংকট ও তার অতিক্রমণের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের কাব্যবোধে আত্মসচেতনতারই এ এক অধ্যায়। কারণ বিষ্ণু দে-র ভাষায়: "এলিঅট আত্মসচেতনতারই মহাকবি।" এই উক্তিটির বিষ্ণু দে-র বিশ্বে একটি বিশেষ মূল্য আছে। কারণ আত্মসচেতনতা বিষ্ণু দে-র কাছে আধুনিকতার মৌলিক

লক্ষণ। ঐতিহাসিক কারণে যতই মানুষের ব্যক্তিসত্তা সমাজাতিরিক্ত, যতই সমাজবিচ্ছিন্ন বা বিরোধীই হয়ে উঠেছে, ততই আত্মসচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আত্মসচেতন আধুনিক মানসেই কবিতার আর ব্যাখ্যা দরকার হয় না, আধুনিক কাব্যে কল্পনা রূপকীকৃত না হয়ে প্রতীকোৎসারী হয়ে ওঠে। এই সঙ্গেই বিষ্ণু দে লেখেন, "কাব্যের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের চেয়ে ব্যক্তি-সমাজের নিহিত ভাষা-বিনিময়ের আভতিই হচ্ছে আধুনিক কাব্যের মৌলিক লক্ষণ। এবং এর নির্মাণের লৌহভিত্তি আত্মসচেতনতার অভ্যাসে প্রোথিত, তেমনি এর প্রত্যাশা হচ্ছে যে, পাঠকও রাখবেন সচেতনতার অভ্যস্ত সদাজাগ্রত মনন। বলা বাহুল্য এই আত্মসচেতনতা কবিতার জগতেই নিঃশেষ নয়, আধুনিক জগতের সর্বক্ষেত্রে আজ মননের এই বৈশিষ্ট্য—এখন পর্যন্ত মোটামুটি এক বোধ হয় রাজনীতিতে ছাড়া।" সম্প্রতি তিনি লেখেন, "...জিজ্ঞাসাটা আপনাদের কাছে তুলতে চাই, আধুনিকতার সঙ্গে আত্ম-সচেতনতার মৌলিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে, যে আত্মসচেতনতা অর্জন করতে পারে কিছুমাত্র সার্থকতা।" এই আত্মসচেতনতা-অর্জনে বিষ্ণু দে তাঁর ডায়ালেকটিকস্ থেকেই বুঝতে পারেন দেশ কাল পরিবেশ সবই ক্রিয়াশীল, যেমন রবীন্দ্রনাথে। এলিঅটের আলোচনায় বিষ্ণু দে এই আত্মসচেতনতা বা অধুনিকতারই ওপর জোর দেন : চৈতন্যের সন্ততি ও একতার প্রশ্নই জীভূত কর্মজীবন মানসিক সক্রিয়তার তাগিদ। এলিঅটের আত্মসচেতন ভারসাম্য পাবার বারংবার চেষ্টাই এর প্রমাণ। এই আত্মসচেতনতাই আবার ভঙ্গিতে, বিকৃতিতে নিয়ে যেতে পারে—কিন্তু এলিঅটের শিকড়-সন্ধান, ঐতিহ্যের বোধ ও তার সঙ্গে সম্পর্কময় ব্যক্তিগত প্রতিভা এর হাত থেকে বাঁচায়—বিষয়-বিশ্বের কাছে বিষয়ীর আত্মবিসর্জনে, প্রায় নিজব্যক্তিত্বের নির্বাণে। আর বিষ্ণু দে-র তত্ত্বজগৎ দ্বন্দ্বময়তা ভঙ্গিসর্বস্বতার, বিকারের খামখেয়ালিপনার প্রচণ্ড প্রতিবাদ।

অন্য একটি প্রবন্ধে বিষ্ণু দে লেখেন, "ব্যাপারটাই নাটুকে—বাংলা দেশে এলিঅট।" বাংলা সাহিত্যে এলিঅট মার্কসবাদের মতো সৌরবিবর্তন নয়, তবে "একটা চাঁদনী রাত বটে।" বস্তুতঃ আগে যে কথা আমরা দেখেছি—বিষ্ণু দে-র তত্ত্বসংগঠন, তাঁর মানসজগতের ভিত্তি নির্মাণ প্রসঙ্গে সেটিই তাঁব এ প্রবন্ধে স্পষ্ট করে পাই : "মার্কসের পুঁথিপত্রে এল সারা ইওরোপ, ইওরোপেব আন্দোলনে এল সারা দুনিয়াই আমাদের মনের জীর্ণ বিশ্বে, ভারতবর্ষই এল

সেই নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। সেই ব্যাপ্ত বিশ্বের যোগাযোগে সাহিত্যের যে সব কুঠুরি খুলল, তার একটি হচ্ছে কাব্যচর্চার তীব্র শুদ্ধি ও বিজ্ঞানবদ্ধ বোঝবার চেষ্টা।" এলিঅটও এলেন এই আবিষ্কারে। বস্তুতঃ ইয়োরোপীয়, বিশেষতঃ ফ্রান্সের মুক্তির চেষ্টাই সাহিত্যিক দিক থেকে এল এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়। নেতির সংযমে শিক্ষা শুরু হল, ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হল কর্মিষ্ঠ, সচল, ব্যাখ্যা থেকে পরিবর্তনের, ভেঙে পুনর্গ্রহণের নির্মাণের। এলিঅট জানালেন কাব্যে বড় বিবেচ্য ঐ মানসের জলবায়ু, জানালে রচনাবস্তুর স্বতন্ত্র ও গভীর বিকাশের বিষয়ে সজ্ঞানতার প্রাথমিক সার্থকতা। "এলিঅটের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মুখ্যতঃ আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্মসচেতনতা হয়ে উঠল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন।··· অজ্ঞাতসারেই এলিঅটের সমালোচনায় মার্কস অঙ্গীভূত, তাঁর কাব্যের মুক্তিতে সাম্যবাদীর আরম্ভ, যদিও হয়তো সে সত্য তিনি জানেন না বা মানেন না।" বস্তুতঃ এলিঅটই শেখালেন কেমন করে সাহিত্যে ঐতিহ্যকে ব্যবহার করতে হয়, মাইকেল রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনীয়তা, তার সীমা, তার রূপায়ণের দ্বন্দ্ব। এলিঅটের নির্দিষ্ট দান সার্থক, তাই রামমোহনের ঐতিহ্যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের অভিজ্ঞতা ও পুরুষার্থের গণ্ডী বিস্তারে এবং তারই সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্রতর করায়। সর্বোপরি এলিঅটের কবিতাই এল বিষ্ণু দে-র অনুবাদে আমাদের জীবনের রূপক হয়ে: জ্ঞানে আমরা হলাম গেরোনশন থেকে ওএস্টল্যাণ্ডে উপনীত। মীরাটযুগে এরিএল কবিতাবলি এল, ভদ্র অসহযোগের নৈরাশ্যে এল অ্যাশ ওএডনেসডে, যন্ত্রণার মুঠিতে এল আস্থা আর হাজার কাটাকুটিতে আঁকা আশা। বিষ্ণু দে অপূর্ব বলেন, "প্রতীকী রীতির নিহিত স্বাধীনতার বশেই রাজর্ষিদের যাত্রার মতো ক্রিশ্চিয়ান কবিতা গান্ধীজীর দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদ সম্ভাব্যতা পায়, কোরিওলান পায় ইনটেরিম সরকারের কালে, গেরোনশন হঠাৎ এসে যায় অবলম্বন-অনুবাদের মিশে যাওয়া গোধূলিতে যখন কলকাতার উন্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজী অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে শোভাযাত্রায়।" এই ভাবেই বিষ্ণু দে এলিঅটকে, তাঁর কবিতাকে মিলিয়ে দিলেন আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে। বাস্তবিক বিষ্ণু দে-র চর্চায় এলিঅটই এলেন আমাদের আপন হয়ে—ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন জগৎ সত্ত্বেও তাঁর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কময় প্রয়াসে এলিঅটই নতুন অর্থ পেলেন বৃটিশের

কলোনিতে। ভারত-পথিক ইংরেজ কবি অ্যালন লুইসের পরিণতিহীন ভারতবর্ষের, বৃটিশ কলোনির কবি হিসাবেই এলিঅটকে পেলাম আমরা আমাদেরই কবিতার মুক্তিতে। বিষ্ণু দে-র এলিঅট-চর্চা তাই এলিঅট নামক কবির ওপর পণ্ডিতী টীকাভাষ্য নয়। একজন স্থান-কাল-আত্মসচেতন কবির নিজস্ব মানসজগতের তাগিদেই, যে মুক্তি যে আধুনিকতা তিনি তত্ত্বসংগঠনে, জ্ঞানে অর্জন করেন তাকেই কাব্যে ধরার, চারিয়ে দেওয়ার এ এক অসামান্য প্রয়াস। তাই বিষ্ণু দে-র অনুবাদেও এই স্থানকালের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি—গেরোনশন বা জরায়ণে, কোরিওলানে, কর্ণের খেদে, বাংলা দেশই জেগে উঠে। আর এখানেই বিষ্ণু দে-র এলিঅট-চর্চায় সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সেই নিজবাসভূমে পরবাসী এলিঅট-চর্চার তফাৎ।

তবে বিষ্ণু দে-র আধুনিকতায়, তাঁর মানসজগতে এলিঅট আসেন গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ায়। তাঁর ডায়ালেক্‌টিক-এ তাঁর সামাজিক মানবিক দৃশ্যে আধুনিকতায় এলিঅট যতটা প্রাসঙ্গিক, ততটাই তিনি গ্রহণ করেন। প্রাবন্ধিক ও তাত্ত্বিক এলিঅটের প্রথম দিককার রচনাই মূলতঃ তিনি কাব্যের মুক্তিতে আনেন, যদিও এলিঅটের কবিতায় তিনি শেষপর্যন্ত অনুরাগী পাঠক। বিশেষতঃ অলিঅটের রাজনীতি ও ধর্মভাবনা বিষ্ণু দে-র আধুনিকতায় প্রথমাবধিই অগ্রাহ্য হয়েছে। ব্লেকের সম্বন্ধে এলিঅটের আপত্তিই তিনি তোলেন এলিঅট প্রসঙ্গেই—এযুগের আধুনিক মন বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে হয় না। গীডিয়ন (স্পেস, টাইম অ্যাণ্ড আর্কিটেকচারে) যাকে চিন্তা ও অনুভবের, থিঙ্কিং ও ফিলিং-এর সামঞ্জস্য বলেছেন, তার অভাব নিশ্চয়ই পীড়াদায়ক। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের, জীবন ও বাস্তবের কর্মিষ্ঠ প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বময়তায় সচেতন বিষ্ণু দে এই সামঞ্জস্য চান—তিনিই 'পরিবর্তমান এই বিশ্বে' লেখেন। শিল্পবিপ্লবের একপেশে ঝোঁকে টেকনোলজি ও বিজ্ঞানের উন্নতি নিশ্চয়ই আমাদের অনুভূতি-সংলগ্ন হয় নি—তাই রোমান্টিকরা, আরও অনেকেই জীবনের থেকে ফিরতে চেয়েছেন, বাস্তবকে বিরোধী ভেবেছেন। কিন্তু আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে যিনি মানসজগৎ গড়ে তোলেন, তিনি স্বভাবতঃই এই দ্বি-চারিতায় থাকেন না—তিনি অতীত ও বর্তমানকে একই প্রক্রিয়ায় দেখে অতীতের ধর্মে আশ্রয় খোঁজেন না। বর্তমানকে, আধুনিক বিকাশকে বাস্তব হিসাবেই গ্রহণ করেন, কবিতা-সংলগ্ন করেন। সেই কারণেই বিষ্ণু দে এলিঅট-সম্পর্কে আপত্তি তোলেন : কিন্তু

তিনি বিজ্ঞানে নিরুৎসাহ ; বিজ্ঞান সব মানুষের মূল্য স্বীকারে আজ তৎপর বলেই কি ? অথচ "আধুনিক মননে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিচারমানই সর্বগ্রাহ্য বিশ্বজনীন সত্য।" এই বৈজ্ঞানিক বিচারেই রবীন্দ্রনাথ যাকে নিরাসক্তি বলেছেন তার প্রকৃতি হয়েছে স্বচ্ছ, সে হয়েছে স্বয়ংসিদ্ধ, স্বাধীন ও সক্রিয়। এলিঅট ফিরে পেতে চান ধর্মের মালমশলার ফর্দ—এই ধর্মসমাজঘটিত দর্শনেই এলিঅটের পরিণতিও হয়ে পড়ে তির্যক, এই পুরাতনের জন্য দীর্ঘশ্বাসই তাঁকে নিয়ে যায় আধুনিকের পক্ষে বেখাপ্পা এক রাজতন্ত্রে। এলিঅটের ঐতিহ্যবোধও খানিকটা এই পশ্চাদপসারণের জন্য, যেখানে এই ধর্মাদির প্রাণ ছিল। এখানে শেলী বা ব্লেকের মতোই চিন্তা, আবেগ ও দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা জড়িত—কবির পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যেখানে কবির প্রয়োজন মেটেনি। এলিঅটের কাছে তাই অর্থনীতি ও যন্ত্রশিল্প একটা খটকা মাত্র—অথচ যেটা না থাকলে এলিঅটের কবিতাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁরও যন্ত্রণা এই ধনতন্ত্রপ্রসূত খণ্ডচৈতন্যের—কিন্তু এর উত্তরণের জন্য এলিঅট বাস্তবের সম্মুখীন হতে চান না—অসম্বদ্ধ মুহূর্তে শান্তি খোঁজেন। ফাঁকি দেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বরূপের মতবাদে। সেই হেতু মানবচৈতন্যের সমগ্রতা, যা বিষ্ণু দে পান তাঁর বিশ্ববীক্ষায়, তা তাঁর কল্পনায় নেই। জড়প্রকৃতি বা সমাজে সম্ভব যে মানুষের নিয়ন্ত্রণ তা তিনি মানেন না। আসলে বিজ্ঞান বিরোধী এলিঅট ডায়ালেকটিকস্-এর হাল ধরতে পারেন না। বিষ্ণু দে বাস্তবতঃ এলিঅটের সাহিত্যিক দিকটি, কাব্যিক মুক্তির দিকটিই নিজের ও বাংলা কাব্যের তাগিদে ধরেন নচেৎ স্পষ্টভই বলেন—এলিঅটের ডগ্‌মা অবশ্যই আমাদের অগ্রাহ্য। ভৌগোলিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক স্থূল কারণেই অগ্রাহ্য, আমাদের জীবনে ও জীবিকাতেই এলিঅটের ডগ্‌মার অসারতা স্পষ্ট। এলিঅটের ঐতিহ্যবোধের ভিত্তি যে কৃষ্টি বা কালচার সংক্রান্ত, ওয়ে অব লাইফ-সম্বন্ধে মতবাদ, শ্রেণীহীন সমাজের প্রতি বিরূপতা, তা অনাধুনিক, অর্থাৎ সার্ত্র যাকে বলেন প্রাক্-মার্কসীয়—বিষ্ণু দে-র কাছে তা ন্যায্যতই অসার। আসলে বিষ্ণু দে-র কাছে কবি ও কবি-প্রাবন্ধিক এলিঅটই মূল্যবান—নোটস টুওর্ডস এ ডেফিনিশন অব কালচার বা আফটার স্ট্রেঞ্জ গডস-এর এলিঅট নয়। তার কারণ, যে-ডায়ালেকটিকসে, যে-টেনসনে সমাজ-ইতিহাস-চেতনায় বিষ্ণু দে আস্থাবান, তা ই কাব্যের জগতে, আধুনিকতায় তিনি পেয়েছিলেন এলিঅটে। যন্ত্রণাময় টেনসন বা আতীতিকেই এলিঅট ভারসাম্য দেন

ঐতিহ্যবোধে -টেনসন তো কেবল কনফ্লিক্ট নয়, আরও কিছু। এলিঅটের ঐতিহ্যবোধেই অতীত ও বর্তমান যে একই প্রক্রিয়া, তার কাব্যিক প্রকাশ দেখতে পান। ঠিকই এলিঅটের ইতিহাস-চেতনা মাঝে মাঝেই ইতিহাস-হীনতারই নামান্তর—তথাপি যখন তিনি বলেন ইতিহাসচেতনায় সেই অন্তর্দৃষ্টি জড়িত যাতে অতীতের অতীতত্ব নয় তার বর্তমানত্বই ধরা পড়ে, তখন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রজ্ঞাই অবচেতনে তিনি প্রকাশ করেন, যেমন ইতিহাস দর্শনে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন কলিংউড। বস্তুতঃ এই চেতনাই লেখককে তার সময় তার কাল সম্পর্কে সচেতন করে। অন্যদিকে এলিঅট সামাজিক পরিবেশ, যাকে বিষ্ণু দে বলেন সমাজদৃশ্য তার প্রভাবও মানেন—এমন কি তিনি ঘোষণা করেন কাব্যরূপে মৌলিক পরিবর্তন ব্যক্তি ও সমাজের গভীর পরিবর্তনেরই লক্ষণ। এই সমাজচেতনা বিষ্ণু দে-র মানসজগতের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই তাৎপর্যময়। এলিঅটের মতে কবির কাজের যাথার্থ্যও পাল্টায় পিরিয়ড বা কাল পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে—কখনও বচনের সঙ্গে, পদ্যের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সংযোগ সংগীতময়তায় আবিষ্কারই বড় হয়ে ওঠে, কখনও বা কথ্যভাষার পরিবর্তনকে ধরতে হয়। আসলে ইদানীং কাব্য-আলোচনায়, কাব্যবোধে যে ডায়ালেকটিকসের প্রাধান্য স্বীকৃত হচ্ছে, সমাজ-সংলগ্নতার কথা প্রাধান্য পাচ্ছে—এলিঅট তার অন্যতম পুরোধা। সুতরাং বিষ্ণু দে যে, তাঁর কাব্যের মুক্তিতে কাব্যবোধে এলিঅটকে অগ্রজ সঙ্গী হিসাবে পাবেন এতো স্বাভাবিক। যদিচ তখনকার প্রচলিত মার্কসবাদে, এমন কি এখনও এলিঅট অপাংক্তেয়।১ বিষ্ণু দে-র কাব্যবোধের, ইতিহাসের বোধের মানসজগতের এমনই প্রাণময়তা যে তিনি প্রচলিত মার্কসবাদীর ভ্রান্তি এড়িয়েই এলিঅটকে স্বাঙ্গীকৃত করেন– এলিঅটের রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজভাবনার উচ্চকিত ঘোষণা সত্ত্বেও। সঙ্গে সঙ্গে আগেই দেখেছি এলিঅটকেও বিচার করেই, তীক্ষ্ণ সচেতনতাতেই গ্রহণ করেন। এমন কি এলিঅটের রোমান্টিকতা-বিরোধিতার কথা জেনেও তাঁর নব্য ক্লাসিকতা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে এলিঅট-বিষয়ে বহু বক্তব্যের একটি বসাতে চান - এলিঅটের কাব্যে যে বেদনা, যে রোমান্টিক যন্ত্রণা —তার কথা- এই যন্ত্রণাতেই এলিঅট এত নাড়া দেন, সেই বেদনার আবেগেই চিত্রকল্পগুলি প্রতীক হয়ে ওঠে। এমন কি এলিঅটকে তিনি শেষ রোমান্টিক বলেন। বস্তুতঃ রোমান্টিকদের সঙ্গে এলিঅটের সম্পর্ক নিয়ে ইদানীং আলোচনা হচ্ছে—রোমান্টিসিজমএর

গভীরেই প্রোথিত সমস্যাবলি এক সমাধান চায় বা পায় এলিঅটে, এই চিন্তা এখন প্রায়ই নানা আলোচনায় দৃশ্যমান। কিন্তু বিষ্ণু দে বহু আগেই তাঁর অতীত-বর্তমানের, স্বকীয়তা ও একই প্রক্রিয়ার বিকাশের দ্বন্দ্বের বোধে এলিঅটকেও রোমান্টিকদের ধারাতেই, তারই প্রতিবাদে অথচ সংলগ্নতায় দেখেন—এলিঅটের সুদূরের পিয়াসী মনের একপেশে বিরোধিতা সত্ত্বেও। আসলে বিষ্ণু দে-র জগতে এলিঅটের বাধাও এই একপেশেমি—তা না হলে এলিঅট ইয়োরেপীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যের মূল উপাদান শেয়ারড ট্র্যাডিশনে—গ্রীস রোম থেকে উদ্ভূত ঐতিহ্য ও ক্রিশ্চিয়ানিটিতেই পান, আর বিষ্ণু দে, যাঁর যাত্রা একালের বাস্তবের যন্ত্রণা থেকে, সমগ্র বাস্তবকেই ধরতে চান—লোকজীবনের স্রোতেই চান জীবনের অবগাহন। তাঁর কাছে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান বা যন্ত্রশিল্পের যুগ কেবল ডিসোসিয়েশন অব সেনসিবিলিটির, মৌলিক পাপ ও গ্রেসের প্রয়োজন থেকে ক্রমাবনতির কাল নয়, তাই তিনি সামন্তবাদী রাজশক্তির কল্পনায়, বা গির্জা কিংবা মন্দিরের সপক্ষে তাঁর হৃদয়বেদনার সমর্থন খোঁজেন না, বা তাঁর ঐতিহ্যবোধকে করে তোলেন না এডমণ্ড বর্কের দৃষ্টান্তে আধুনিক-বিরোধী রক্ষণশীলতার তত্ত্ব। আধুনিক জগতের বীভৎসকে, কর্কশকে, বিকারকে তিনি বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতাতেই গ্রহণ করেন—নিরাসক্তের দৃষ্টি আর বৈজ্ঞানিক মমতার আবেগেই তিনি তাঁর কাব্যকে করে তোলেন ভবিষ্যৎমুখী, মানবিকবাদী। সেই কারণেই এলিঅট যখন রাজশক্তির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তাঁর জাঁকানো কবিতার ছত্রে, তখন বিষ্ণু দে, হয়তো ভারতবর্ষে তিনি এর সুযোগও বেশি পান, লোকসংস্কৃতিতে, লোকজীবনের, মাটির মানুষের চলিষ্ণুতায় সঙ্গী হন, ছত্তিশগড়ী গানে কান পাতেন। নিজেরই কবিতায় বাঁধতে চান তাকে জ্যাবদ্ধ টানে। আবার এই লোকসংস্কৃতিই যেখানে আত্মসচেতনতায় আধুনিক হয়ে ওঠে সেখানেই বিষ্ণু দে মানসজগতের উন্মুক্ত দ্বার দেখেন—যামিনী রায়ের শিল্পকীর্তিতে। ঘুরে ফিরে বারবারই এই সহশিল্পীর প্রসঙ্গে তাই ফিরে আসেন তিনি।

বিষ্ণু দে, যেহেতু, চলিষ্ণু দ্বন্দ্বময় জগৎ নির্মাণ করেছেন তাঁর কবিতার তাগিদে, সেহেতু বাস্তবের সঙ্গে চৈতন্যের সাযুজ্য সন্ধানে তিনি অক্লান্ত। এলিঅটীয় মনীষা একদা কাব্যের মুক্তিতে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আবার তার সীমাবদ্ধতার দিকটাও তাঁর দ্বন্দ্বময়তায় ধরা পড়ে তখনই—আমরা

দেখেছি। সেই কারণেই বিষ্ণু দে এলিঅটের মিলটনীয় ভ্রান্তি এড়িয়ে যান। অনায়াসেই মাছিমারা কেরানীর মতো মিলটন ও তার জগতের এলিঅটকৃত ব্যাখ্যার অনুকরণে আমাদের মাইকেল ও উনিশের শতকের বাংলা দেশের বিচার করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতা, তাঁর দেশ-কাল-কাব্যসাহিত্যের বিকাশের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক-কাব্যিক চেতনা এক দুর্লভ বোধের পরিচয় দেয়। বিষ্ণু দে-র ঐতিহ্যবোধের অনন্যতা স্পষ্ট। আমাদের পূর্বসূরীদের বিচারেও তা যেমন অব্যর্থ তেমনি সমকালীন কবি সমর সেন সম্পর্কেও এই ঐতিহ্য-চেতনা তেমনি ফলপ্রসূ। সমকালীন নবীন কবিকেই অভিনন্দন জানান সমর সেনের কবিতায় আলোচনায় - সেখানে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যই একমাত্র বিচারের মানদণ্ড এমন উক্তিতে না ভেসেই। বস্তুতঃ বিষ্ণু দে যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞানকে এলিঅটের মতো ত্যাগ করেন না, সেহেতু বিজ্ঞান এমন কি মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিকাশের প্রতি তিনি আগ্রহী। তাঁর সমাজ-সচেতন মনোবিজ্ঞানের নতুন অন্তর্দৃষ্টিতে বিষ্ণু দে-র দ্বান্দ্বিক জগৎ ও ব্যক্তি-পরিবেশের জঙ্গম সম্পর্কময়তা পরিপূর্ণ হতে চায় আধুনিক বিজ্ঞানেরই সাঙ্গীকরণে। রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর সাম্প্রতিকতম প্রবন্ধে তারই প্রয়োগ দেখি - যদিচ ডায়ালেকটিকস সেই সমাজ ইতিহাস-চেতনা সম্পূর্ণ বজায় থাকে। এখানেও মূল জিজ্ঞাসাটা থাকে আধুনিক আর্তির প্রসঙ্গেই। সংকটযন্ত্রণা ও উত্তরণের পর্বপরম্পরা কেমন করে ব্যক্তি সমাজ ইতিহাসের অর্থে অতিক্রম করে – তাই রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতার সমস্যায় বোঝান বিষ্ণু দে। তাঁর তত্ত্বজগৎ বা মানসজগতের ভিত্তিতেই, দ্বন্দ্বময়তাতেই সমাজ সংলগ্ন এরিক এরিকসনের মনোবিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি আসে। এরিকসনের সাইকোসোস্যাল তত্ত্বাবলি বিষ্ণু দে-র ডায়ালেকটিকসকে, ব্যক্তিসত্তার আবিষ্কারকে আরও সমৃদ্ধ করে, যেমন আন্তনিও গ্রামসির অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞা প্রচলিত মার্কসবাদের জাড্য ভেঙে দেয় মানুষের সংকল্প ও উপাদানসংগঠনের বৈশিষ্ট্যের দিকনির্দেশে। ব্যক্তির জীবনের নানা মন-সামাজিক স্তরের পরম্পরা চিত্রিত করেন এরিকসন। তিনি ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিকাশের ক্ষেত্রে ইগো এবং সমাজ উভয়ের উপরই জোর দেন। ব্যক্তিকে সমাজের, তার ঐতিহ্যগত প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসাবেই দেখেন তিনি। তিনি পরিষ্কারই বলেন যে ব্যক্তি যে তার নিজস্ব বিকাশের সংকটের উত্তরণ ঘটায়, তার ধরন, তার চারিত্র তার সমাজের দ্বারাই প্রভাবিত।২ এলিঅট ও তাঁর

ঐতিহ্য বা ধার্মিক মারিতা। একদা যে বিষ্ণু দে-র শিল্পভাবনায়ও সাহায্য করেছিল, এরিকসনও তাই করলেন। যদিচ বিষ্ণু দে জানেন : শিল্পসাহিত্যের সমালোচনা মনোবিজ্ঞানওনয়, ইতিহাস-বিজ্ঞানও নয়, কিন্তু দুই সতিনের সঙ্গে তার হাত বাঁধা —কারণ একই কবিতা অনেকভাবে ব্যাপ্ত পটভূমিতে পরিণতির অনেক স্তরে উপভোগ্য। বস্তুতঃ এরিকসনের লেখায় বিষ্ণু দে ব্যক্তি ও সম্পর্কময় সত্তার স্বীকৃতিকে একটা পুরাতন দ্বৈত ভঙ্গিতে দেখেন : মনোবিকলনশাস্ত্রে ও তার চর্চায় বোধহয় সবচেয়ে অবহেলিত প্রশ্ন হচ্ছে কর্মজীবনের প্রশ্ন ; যেন আইডিয়ার ইতিহাসের ডায়ালেকটিক মনোবৈজ্ঞানিকের চিন্তায় এমন একটি ন্যায়ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যাতে ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী কীভাবে যে জীবিকা নির্বাহ করে তা সে কিছুতেই জানতে চাইবে না, যেমন আবার মার্কসবাদ মানে না মনসমীক্ষণের সার্থকতা এবং মানুষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকেই তার কাজকর্ম ও ভাবনাচিন্তার একমাত্র অবলম্বন ভাবে এই দুই অসম্পূর্ণতার দূরীকরণই বিষ্ণু দে দেখতে পান এরিকসনে, যেখানে হয়তো জ্ঞানে বা অচেতন ভাবেই মনসমীক্ষণে মার্কসীয় দৃষ্টি মেলে।৩ এই অসামান্য বোধেই বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের বিশাল বিকাশ তাঁর মাহাত্ম্যকে দেশকালের পটে তাঁর ব্যক্তিত্বের সংকট ও তার উত্তরণের আত্মকৈবল্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেন—আধুনিকতার আলোচনার প্রসঙ্গে। এই ব্যাখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা স্পষ্ট হয়—রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে যে পাউণ্ড বা এলিঅট সহজে স্থান পান না, সে বাছবিচারের অসহিষ্ণুতা যেমন ঐতিহাসিক দিক থেকে স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক তৎসত্ত্বেও তাঁদের মতো ইয়োরোপীয় কবিদের সঙ্গে আবার তাঁর একটা ব্যাপ্ত অর্থে যুগগত শতাব্দীগত তুলনীয়তা। আমাদের এখানে তিনিই আধুনিকতার আর্কেটাইপ। এরিকসনীয় এই বিচারে এলিঅটের কাব্যের মুক্তিভাবনা নিশ্চয়ই মিশে যায়, কিন্তু এলিঅট আধুনিক বিজ্ঞানে, মনোবিজ্ঞানে সায় দিতেন না। তাঁর কবিতায়, প্রুফ্রকে ফ্রয়েডের ছায়া থাকলেও মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে এলিঅট বিরূপই। অথচ বিজ্ঞানে নেই বিষ্ণু দে-র আস্থা। অবশ্য বিষ্ণু দে এরিকসনের মার্কসবাদ-সংক্রান্ত ভ্রান্ত উক্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। এই সচেতনতাই, শৈল্পিক বোধই—যে বোধে তিনি এলিঅটকে পান, তাঁকে কবিনির্বাচনে সতর্ক করে। তাই উইলিয়ম কার্লস উইলিয়মস-এর ইদানিং-এর প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও, তার এক তরফা দৃষ্টি অপেক্ষা ওয়ালেস স্টীভনসকেই তিনি গুরুত্ব দেন বেশি যদিও স্টীভনসের গৌণতা

শৌখিনতা প্রাদেশিকতা তাঁর চোখ এড়ায় না। স্টীভনস এর তাৎপর্য কোথায় তা আরও বোঝা যায় নর্থপ ফ্রাই-এর এক বিখ্যাত আলোচনায়।৪ স্টীভনস যে তত্ত্ববিশ্ব নির্মাণ করেন তা তাঁর কবিতা থেকে পৃথক নয়। এলিঅটের কবিতায় যেমন বিষ্ণু দে পান আধুনিক বিশ্বের অস্থির হাওয়ায় ব্যক্তিসত্তার যন্ত্রণা ও অসম্পূর্ণ হলেও, নিরাকরণ প্রয়াসের এক মহৎ দৃষ্টান্ত—তেমনি চৈতন্যের নগ্ন অর্থাৎ ভাবালুর সাজসজ্জাহীন কাব্যে যে আধুনিক কাব্যরূপের সাক্ষাৎ শুদ্ধ হতে পারে, তারই প্রতিধ্বনি পাই স্টীভনস-এর উক্তিতে যে কবিতার তত্ত্ব কবিতাই, নগ্ন কবিতাই। বস্তুতঃ হয়তো তত্ত্বে, ফলত খানিকটা কাব্যেও, এলিঅটে যে দ্বিত্ব দেখা যায়—যেন এক আবেগী হৃদয় এক দার্শনিককে, দেকার্তীয় ভূতেরই সন্ধান করছে কোরিলেটিভের জন্য তার প্রতিপক্ষে স্টীভনস দাঁড়ান। বিষ্ণু দে-র উক্তি—শিল্পী ও শিল্পবস্তুর সম্বন্ধটা তো উভয়ত জঙ্গম, উভয়ত প্রভাব পরিবর্তনময়—সমর্থনই পায় স্টীভনসের বিষয়-বিষয়ীর ঐক্যে। আধুনিক কাব্য নামক মজাদার কবিতায় আধুনিক মনকেই এইভাবে ধরেন স্টীভনস।

আর আধুনিক ইয়োরোপের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের পরিণতি যে, একদিক থেকে শুদ্ধতর—এই সিদ্ধান্তে বিষ্ণু দে আসতে পারেন তাঁর এবিংসনীয় চিন্তার স্বাবলম্বনে। নব্যরাগীরা বা এলিঅট, ভালেরি, রিলকে শেষপর্যন্ত আমাদের মহাকবির মতো আধুকিতার আধিসংকটকে তার প্রকৃত অর্থাৎ ব্যক্তিসর্বস্বের অতীত পরিণতির প্রাণময় সচল তত্ত্বের আততিতে সংলগ্ন করেন না। বিষ্ণু দে-র এই তুলনা তাঁর আধুনিকতার অন্বেষাতেই প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সেই মহীয়ান তরুণ বা তরুণ মহীয়ান ব্যক্তি, যার জীবনে এক শতাব্দীই আধুকিতা পায়—তার পাশে ইয়োরোপের আধুনিকরা ঐ মাত্রায় শেষ অবধি থাকেন না—প্রচণ্ড আরম্ভ সপ্তপর্বের ফল ফলাতে না পেরে আশ্রয় খোঁজেন আত্মভুক সর্পে, আকস্মিক তীব্রতায়, বাস্তবের বিপ্রতীপে রাজনীতিতে ধর্মে, সহজ নিরাপত্তার তন্ত্রেমন্ত্রে। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতাবোধ, আনন্দলোকে সত্যসুন্দরমঙ্গলের একীকরণ, পরবর্তীদের আয়ত্তাধীন নয়, তার সীমাও লক্ষণীয়। বস্তুতঃ তাঁর অধুনিকতাই পূর্ণতা পায় ব্রেখটে—সাবেক আস্তিক্যের অবক্ষয়ের নেতির চরম উপলব্ধি, এই শিল্পীর সত্তাকে সংগঠিত করে একালের ইতিহাসসংগত একাধারে তত্ত্বে ও সাহিত্যসৃষ্টিতে বিকাশ লাভ করার প্রক্রিয়ায়। বিষ্ণু দে-র তত্ত্ব ও সাহিত্য-সৃষ্টির বিকাশও আমাদের দেশের ইতিহাসসংগত—তাই এলিঅট, রিলকে,

ভালেরি, মালার্মের কবিমানসের তীব্রতা ও মানবিক আবেদনের আকৃতিকাব্য-রূপের চূড়ান্বিত আবেগের, সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রয়োগদক্ষতায় মনোযোগী অনুরাগী হয়েও সেখানেই স্থির থাকেন না তিনি—ব্রেখটের অসমসাহসিক আন্তর্জাতিক সভ্যতায় আসেন। রবীন্দ্রনাথের অ্যান্টি-থিসিস হিসাবেই ব্রেখটকে তিনি আনেন। ব্রেখটের কাছেও তত্ত্ব ও কাব্য অবিচ্ছিন্ন, উভয় উভয়কে রক্ষা করে। জীবন ও কাব্যের স্রোতস্বিনী এক আবেগে বাঁধে। জ্যাবদ্ধ টানে সমগ্র চৈতন্য বিস্তারী হয়। তাই তিনিই দেখেন ব্রেখটে কেবল বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখা নয়, আধুনিক মননের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিই (এলিঅটের ধর্মীয় বিষয়সমাধি নয়) বিকাশের পর্বে পর্বে খুলে দেয় অন্য অভিযানকে। ব্রেখট দেখান বস্তুকে জ্ঞানের প্রয়োজনসাধনের আয়ত্তে আনার মানবিক কর্তৃত্বের পরিবর্তনের প্রয়াস। শিল্পী ও শিল্পবস্তুর জঙ্গম সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ব্রেখট হয়ে ওঠেন আধুনিকতম। আর এই জঙ্গম সম্পর্কের চেতনাতেই বিষ্ণু দে তত্ত্ববিশ্ব নির্মাণ করেছিলেন এখানে, যার যাত্রা অ্যালন লুইসের স্বেদাক্ত বাস্তবেই। তাই বিষ্ণু দে-ই লিখতে পারেন কবিকাহিনীর বাঙালীকবির সংকটবেদনা জর্মনির পীড়িত দীর্ণ হিংস্র জীবনের নগ্নতার মুখোমুখি হয়ে সম্পূর্ণ করল বিশ্বমানবিক ও সাহিত্যিক পরিণতির বৃত্ত। সংকট ও উত্তরণের তত্ত্ব, অভিজ্ঞতা জঙ্গম, আততির রূপান্তর, ব্রেখটে সজ্ঞানভাবেই স্বীকৃত হয়। বিষ্ণু দে-রও বিশ শতকের বিশ-ত্রিশ দশকের আধুনিকতার সন্ধান, এলিঅটের চর্চা, তাঁর কাব্যমুক্তির বিস্তার, প্রয়োগপরিণতি পেল এরিকসনীয় চিন্তার প্রয়োগে, রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার চর্চার মধ্যে দিয়ে ব্রেখটে। এর প্রাথমিক স্তরে এলিঅট নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু দে তাঁর আধুনিক বৈজ্ঞানিক মননে, দ্বন্দ্বময়তায়, প্রক্রিয়ার বিকাশেন চেতনায় অনেক পিছনে ফেলে এলেন এলিঅটের সীমাকে—তাঁর এই বিকাশও বাংলা সাহিত্যে, মননে আধুনিকতারই বিকাশ। যে রবীন্দ্রনাথ ১৩৪০-এই বিষ্ণু দে-র আধুনিকতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আমাদের দেশে সেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতাও পরিণতি পাচ্ছে এই মহৎ কবির তত্ত্ব ও কাব্যের অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসে।৫

---

১. বামপন্থী রাজনীতিতে এলিঅট প্রথমাবধিই খারিজ হয়েছিলেন—সে খারিজ একেবারে বিনা বিচারেই। এলিঅটের ঐতিহ্যচিন্তার তাৎপর্য সাহিত্যে কতটা তার চিন্তা তাঁরা একবারও করেন নি। বরঞ্চ চালু রাজনীতির

ঝোঁকে প্রতিক্রিয়াশীল, অবক্ষয়ের প্রতিনিধি, এই সব বিশেষণ এলিঅটকে দেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য এলিঅটের সাহিত্যিক চমৎকারিত্বের কথা বলেছিলেন। তাই বিষ্ণু দে-র এলিঅট-চর্চা তাঁর মার্কসবাদের অনন্যতা, গভীরতাকে দেখায়।

২. এরিক এরিকসনের চাইল্ডহুড অ্যাণ্ড সোসাইটি, ইয়ংম্যান লুথার, ইনসাইট অ্যাণ্ড রেসপনসিবিলিটি আমাদের আধুনিক জীবনের ব্যাখ্যায় অসামান্য সাহায্যকারী গ্রন্থাবলী। এ ছাড়া সাইকোলোজিক্যাল ইস্যুস-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় তাঁর আইডেনটিটি অ্যাণ্ড লাইফ সাইক্‌ল্ শীর্ষক নির্বাচিত রচনাও উল্লেখযোগ্য—এ ছাড়া আরও অনেক প্রবন্ধ তো আছেই; গান্ধীবিষয়ক সাম্প্রতিক গ্রন্থটিও আমাদের কাছে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ঐ সাইকোলজিক্যাল ইস্যুস এর একটি ভূমিকায় ডেভিড র‍্যাপাপোর্ট এরিকসনের মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেন।

৩. অথচ ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে মনোবিজ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশে বিষ্ণু দে আস্থা রাখতে পারেন না। সেখানে কোনো উত্তরই খুঁজে পান না—সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত এক চিঠিতেই, যা ১৯৪৪-এ ছাপা, এ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করে লেখেন। আসলে ফ্রয়েড বিষ্ণু দে-র দ্বন্দ্বময় জগতে সম্পৃক্ত হতে পারেন না তাঁর একপেশে ঝোঁকের জন্যই, ব্যক্তিকে সমাজসংলগ্ন না করায়—অবশ্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যাত্রা ফ্রয়েডেই। কিন্তু এরিকসনদের প্রচেষ্টাতেই মনোবিজ্ঞান সাবালক হচ্ছে—অন্যদিকে কারেন হর্নি বা এরিখ ফ্রমরাও চেষ্টা করছেন। তাই ১৯৪৪-এর ফ্রয়েডবিরোধিতা এরিকসনের ক্ষেত্রে আর থাকে না।

৪. নর্থপ ফ্রাই ওআলেস স্টীভন্‌স্ সম্পর্কে চমৎকার লেখেন: **His poetic vision is informed by a metapysic; his metaphysic is informed by a theory of knowledge; his theory of knowledge is informed by a poetic vision**

৫. রবীন্দ্রনাথ ১৩৪০, ১লা শ্রাবণের এক চিঠিতে জানান, যে একরকম নূতনত্ব আছে যেটা কায়দার নূতনত্ব, কিন্তু বিষ্ণু দে-তে তিনি পান অন্য নূতনত্ব যেটাতে মানুষেরই নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়।

॥ পরিশিষ্ট ॥ বাংলায় এলিঅট : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"বদলেয়র ও তাঁর অনুবর্তী ফরাসী কাব্যসাধনা; গতিএ, র‍্যাবো, মালার্মে, লামর্গ, ভালেরি অবধি কাব্যাদর্শের যে বিপ্লবপ্রয়াস—তার প্রভাব এদিকে আমেরিকার এজরা পাউণ্ড এলিঅট থেকে ওদিকে প্রথম বিপ্লবী কবি মায়াকফস্কি ও পাস্তেরনাক পর্যন্ত প্রসারিত।……এই ইওরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিকে প্রতিভাত হল দেরিতে, বলা যায় প্রায় টি. এস এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়। কলকাতার প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা সেই ছাত্রসভার বৈঠকে যা পরে ছাপা হল কাব্যের মুক্তি নামে। সেই এলিঅটের প্রবেশ বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়, মুখ্যত ১৯২৫-এর কবিতাবলি এবং দি সেকরেড উড আর ক্রাইটেরিঅন পত্রিকা সমেত।" ঐ কাব্যের মুক্তিতেই সুধীন্দ্রনাথ আমাদের জানালেন "কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে", "সময়-রূপ চতুর্থ আয়তনের মার্গে শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যতক্ষণ মিলতে না পারছে, ততক্ষণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতান্ত মূল্যহীন" এবং "ব্যক্তি যখন বিশ্বমানবের মধ্যে নিঃশেষে ডুবে যায়, তখনই পিঞ্জরিত ব্যক্তি-স্বরূপ পায় মুক্তি।" শুধু তাই নয় কল্লোলমার্কা বিদ্রোহ-র মধ্যে তাঁর সাবালক উক্তি, "রূপ আর প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ সঙ্গমেই কাব্যের জন্ম।" কাব্যের মুক্তি প্রবন্ধ শেষ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এলিঅট অনুবাদে—এই সমাপ্তিও ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথের এলিঅট স্বীকৃতির সূত্রেই—তাঁর 'আধুনিক কাব্য' সত্ত্বেও কাব্যের মুক্তি স্বীকার করে নেওয়া হল।

বিশ শতকের বিশের বা তিরিশের দশকে এই যে এলিঅট-চর্চা যার প্রমাণ কাব্যের মুক্তিরই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়—এর মূলে কি? সাম্প্রতিক বোদল্যার-বিলাস বা আরও অনেক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত আমদানির সঙ্গে কি এর তুলনা চলে? বস্তুতঃ আমাদের সৌভাগ্য যে বাংলা দেশে এলিঅট-চর্চা নিতান্ত ঐতিহাসিক ও কাব্যিক কারণেই তীব্রতর হয়েছিল—এবং সেটা বিহ্বলতায় নয়, দস্তুরমতো মূল্যায়ণের পথেই ঘটেছিল। আমাদের এলিঅট-চর্চায় অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র এলিঅট-মনস্কতায় কখনই ধ্বনিত হয়নি যে, ইয়োরোপের কাব্যান্দোলনে এলিঅটই প্রথম ও শেষ কথা, যেমন মনে হয়নি এলিঅট তাঁর ধর্ম, রাজনীতি সর্ববিষয়ে অনুকরণীয়।

অর্থাৎ কবি এলিঅট ও কাব্য-সমালোচক এলিঅটই উক্ত দুই কবির কাব্যের মুক্তিতে এলেন বাংলা সাহিত্যে—তার প্রয়োজন কেবল বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথের নিজের সংকটবোধে বা আত্মকৈবল্যে নয়. এ শতাব্দীর বিশের-ত্রিশের দশকের বাংলা কবিতার পরিমণ্ডলেই ছিল—ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বিরাট উপস্থিতিতে, ছিল হাস্যকর রবীন্দ্র-বিরোধিতায়, ছিল দেশজ অর্থনৈতিক-সামাজিক দীর্ণতায়, কবি-ব্যক্তিত্বেরই খণ্ডীভবনে।

এলিঅট বলেছেন, কি ইংলণ্ডে কি আমেরিকায় ১৯০৮ সালে, এমন কোনো কবি ছিলেন না, যিনি নতুন কবিতা লেখকের কাজে আসতে পারেন। তার পক্ষে একমাত্র রাস্তা ছিল অন্য যুগ ও অন্য ভাষার দ্বারস্থ হওয়া। বস্তুতঃ এ শতকের বিশের বা ত্রিশের দশকেও অবস্থাটা প্রায় ওরকমই ছিল বাংলা দেশে। তরুণ কবির পক্ষে রবীন্দ্রনাথ অসম্ভব রকমের বিরাট—আর সুধীন্দ্রনাথ চমৎকার বলেছেন, "তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্বনাশের সূত্রপাত।" এবং বিষ্ণু দে জানান, এই "আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি"র "নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু ঊর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ।" বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ দীপ্তগীতে যে স্বপ্নের ভুবন সৃষ্টি করেন, সংকটবোধ ও তার উত্তরণে যে অখণ্ডজগৎ তৈরি করেন, এ কালের কবির পক্ষে সে অখণ্ডতা হয়তো ঈপ্সিত, কিন্তু করায়ত্ত নয়। সচেতন কবির পক্ষে এই সংহতসত্তা হিমালয়, ধরিত্রীর অঙ্কে বদ্ধমূল বটের সদৃশ মহাকবি বিরাট আশ্রয় ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তরুণ কবির কাজে লাগানো তাঁকে দুরূহই ছিল। কারণ জীবনে সেই অখণ্ডতা আর আসে না, যেখানে আনন্দলোকে সত্য সুন্দর একেসঙ্গে বিরাজ করে। নানাবিধ কারণেই, সমাজ-ইতিহাসের নানা কার্যকারণেই এযুগের জীবনে আসে খণ্ডীভবন—কবি ব্যক্তিত্বকেও বহন করতে হয় সময়ের সমাজের দায়ভাগ। বিশের-ত্রিশের দশকেই সমগ্র বাংলা কবিতায় আসে সংকট—যে সংকটের সমাধান নিশ্চয়ই রবীন্দ্র-বিরোধিতায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সেকেলে, তিনি ভগবান-ভালবাসা মানেন ইত্যাদি নাবালক চিন্তায় সেই মুক্তি নেই অন্তত কাব্যে—সে কথা সচেতন সুধীন্দ্রনাথ ও তরুণ বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার বা পাশকাটানো আর সম্ভব নয়—তাঁর সঙ্গে জটিল ও প্রাণময় সম্পর্ক স্থাপন করতেই হবে। কারণ তিনিই

ঐতিহ্য—ভারতবর্ষ আধুনিকভাবে সাহিত্যে শিল্পে উপস্থিত তাঁরই সৃষ্টিতে। বস্তুতঃ এই ব্যক্তিত্বের খণ্ডীভবন, কেন্দ্রবিচ্যুত হওয়া, নব নব অভিজ্ঞতায়, দেশজ ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ইচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের বিরাট উপস্থিতি এবং স্বদেশে আরম্ভে সাহায্য করতে পারে এমন কবির অভাব[১] অর্থাৎ এক কথায় আমাদের বাংলা দেশের কাব্যজগৎ সম্পর্কে এক সচেতনতা, এক ক্রাইসিস্‌-বোধই সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-কে অন্য ভাষায় দ্বারস্থ করে এবং স্বাভাবিক ভাবেই টি. এস. এলিঅট-এ ব্যাপারে সাহায্য করলেন এই দুই কবিকে। ১৯১৯-এ প্রকাশিত ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা যেন তাঁদের সমস্যার, প্রশ্নের উত্তর হিসাবেই পাওয়া গেল। হয়তো এলিঅটের আর্থার সাইমন্‌স্‌-এর প্রতীকী আন্দোলন সংক্রান্ত পুস্তক-পাঠের অনুভূতিই হয়েছিল এই দুই কবির উক্ত প্রবন্ধ পাঠে—প্রবন্ধটি তাঁদের কাছে হয়তো এসেছিল as an introduction to wholly new feelings, as a revelation। ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভার টানাপোড়নেই, মৌলিকতায় নয়, শিল্পীর প্রগতির অর্থই ক্রমিক আত্মবিসর্জন, ক্রমিক নির্বাণ এই সিদ্ধান্তেই, আবেগে জড়িয়ে পড়া নয়, তার থেকে মুক্তিই কবিতা ইত্যাদি এলিঅটীয় ভাবনাতেই সংকট উত্তরণের, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে ব্যবহার করার অন্ততঃ প্রাথমিক সূত্র পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল এলিঅটের বিখ্যাত কবিতাবলি প্রুফ্রক থেকে ১৯২৫-এর 'দি হলোমেন' অবধি ও তারও পরে। এ কবিতাবলিও এনে দিল আরেক মুক্তির স্বাদ—ইয়োরোপের আধুনিক কাব্যপ্রচেষ্টাকেই, ব্যক্তিপ্রতিভা ও ঐতিহ্যের সমন্বিত কাব্যরূপকে, ইংরেজী কবিতারই সংকট উত্তরণের ইতিহাসকে।

এই আলোচনার প্রথম বিষ্ণু দে-র উদ্ধৃতিতেই ধরা পড়ে বাংলাদেশে এলিঅট-চর্চার অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা এ সম্পর্কে তিনিই করেন। এবং বলাই বাহুল্য তাঁর কাব্যচিন্তা বা সাহিত্যচিন্তা অনেকটাই এলিঅট-নিয়ন্ত্রিত। বাংলায় অলিঅট-চিন্তার প্রথম ফলশ্রুতি বোধহয় এলিঅটীয় ইতিহাসবোধ। ঐতিহ্য অর্থে পূর্বযুগের অন্ধ বা ভীরু আনুগত্য নয়। এর সঙ্গে জড়িত থাকে প্রথমত ও প্রধানত একটা ইতিহাসচেতনা, আর এই ইতিহাসচেতনাই নিয়ে আসে সেই উপলব্ধি যাতে অতীত ও বর্তমান মেলে। এই ইতিহাসবোধেই হোমর থেকে ইয়োরোপের সর্ব সাহিত্যকে এলিঅট ঐতিহ্য হিসাবে পান, এবং এই ইতিহাসচেতনাই

লেখককে ঐতিহ্যবাহী করে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এলিঅটের এই ইতিহাস চেতনা টাইমলেস ও টেম্পরাল-এর পৃথকভাবে ও একত্রের চেতনা—এবং এ চেতনা, এ বোধকে কেউ কেউ ইতিহাস-বিরোধী চেতনা বলে সমালোচনাও করেন, আর্নল্ড-পরবর্তী যুগের এ নাকি ইতিহাস-বোধের ওপরই আক্রমণ। কিন্তু ট্র্যাডিশন অ্যাণ্ড ইনডিভিজুয়ল ট্যালেন্ট-এর ইতিহাসবোধ আরও বিস্তৃত হয় অন্যত্র—সেকরেড উড-এ বা দি ইউজ অব পোয়েট্রি অ্যাণ্ড দি ইউজ অব ক্রিটিসিজম-এ। কিংবা টেনিসন-প্রসঙ্গে চমৎকার লেখেন এলিঅট—ছন্দে কোন আবিষ্কার কেবল প্রচলিত ধারা থেকে সরে আসার বহর দিয়ে মাপা যায় না। ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এ বিচার: কোনো কোনো সময়ে অপর কালের থেকে তীব্র পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সমস্যা প্রতি যুগেই পৃথক. কোনো কোনো সময়ে তাই কাব্যে ছন্দে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। বস্তুতঃ এলিঅটের এই ইতিহাসবোধ, ইন মেমোরিয়মের ইতিহাসচেতনা বাংলাদেশের বিশের ত্রিশের দশকে প্রভাব বিস্তার করে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন, "শুধু কবি নয়, আমার বিশ্বাস ভাবুক মাত্রেই যে-রহস্যের উদ্‌ঘাটনে বদ্ধপরিকর, সে হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির, বিশেষ ও সাধারণের সম্পর্ক। যে সময়ে সমাজ-বন্ধন নিবিড়, যখন লোকোত্তর আদর্শের প্রতি মানুষের ভক্তি অচলা—যেমন দেখি মধ্যযুগের য়ুরোপে—তখন কাব্যবিবেচনা স্থগিত রেখে, মুখ্যত অনুকরণের সাহায্যেই কাব্যরচনা সম্ভব।" অথবা একই প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ এলিয়টের প্রতিধ্বনি তোলেন, "কিন্তু ঐতিহ্য ব্যতিরেকে—ট্র্যাডিশন ব্যতীত—শিল্পসৃষ্টি যদিও একেবারে অসম্ভব তবু তার অনুবৃত্তি প্রাণহীন নয়, সংকল্পের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তার অনুকরণের উদ্দেশ্য উদ্‌ভাবন।" কিংবা চমৎকার বলেন, "শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সচেতন শিল্পী এবং শিল্পসৃষ্টির জ্ঞাত প্রকরণ স্বকীয় উদ্দেশ্যকে চোখের সামনে রেখে অতীত ও বর্তমানের সমুদ্রমন্থন করে উপযুক্ত উপায়ে সুসঙ্গত অবৈকল্য নির্মাণ" বা "কবির কর্তব্য তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ।" বাস্তবিক এই সমস্ত উদ্ধৃতিই স্পষ্ট দেখায় সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারে এলিঅট বারবার ছায়া ফেলেন। তবে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যবোধ বা সাহিত্যবোধ

কেবল এলিঅটীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন রাখেন নি—এ কথা বলাই বাহুল্য।
এলিঅটের মূল্যজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা স্পষ্ট—কিন্তু এলিঅটের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যও লক্ষণীয়। এলিয়ট যেখানে ঐতিহ্যকে ইতিহাস ও ধর্মানুরক্তির যোগফল ভাবেন, সেখানে সুধীন্দ্রনাথ হয়তো ধর্মানুরক্তির জায়গায় মনোবিজ্ঞানকে বসান। বিশেষ-সাধারণের বিরোধ মেটাতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ মনোবিজ্ঞানে তথা অবচেতনের হাত ধরে প্রতীকতত্ত্বে আসেন—অথচ যে আত্মসচেতনতা এলিঅটের মূল বৈশিষ্ট্য সেখানে অন্তত সজ্ঞানে এলিঅট মনোবিজ্ঞানকে আমল দেন না। বরঞ্চ ফ্রয়েড-পন্থীদের প্রতি ব্যঙ্গই করেন। হয়তো তাঁর বহু চরিত্র-চিত্রণের মালমশলা এলিঅট মনোবিশ্লেষণ থেকে পান, হয়তো মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস-এ যে সেরিব্রাল কর্টেক্স, নার্ভাস সিস্টেম বা ডিজেস্‌টিভ ট্র্যাক্টস-এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কথা আছে, তাও তাঁর মনোবিশ্লেষণ সম্পর্কে পরিচিতিরই প্রকাশ।[২] কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোবিদ্যা সম্পর্কে এলিঅটের উৎসাহ ধর্মের বা সাহিত্যের বা দর্শনের উৎসাহের মতো প্রধান নয়—এবং বোধ হয় মনস্তত্ত্ব থেকে নৃতত্ত্ব, দুর্খাইম, লেভি ব্রূল বা ফ্রেজার তাঁর মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করতেন। যদিচ সুধীন্দ্রনাথ মনে করেন তাঁর প্রতীকতত্ত্বের সঙ্গে এলিঅটের খুব বেশি মতদ্বৈধ নেই। "আমার মতো তিনিও মানেন যে একের সঙ্গে বহুর সালোক্য তখনই সম্ভব, যখন আত্মনেপদী বাক্য পরস্মৈপদে বদলায়, কর্তা কর্মে লোপ পায়, ভাব বিষয়াশ্রিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি যেখানে পরমার্থময় বিবেচনায় প্রতীকের ব্যবহার আবশ্যিক ভাবি, তিনি সেখানে ঐতিহাসিকতার খাতিরে উদ্ধার করেন প্রাচীন কবিদের উক্তি। বস্তুতঃ এখানেও কোন মতবিরোধ নেই, আছে কেবল প্রতীক-শব্দের ব্যাপ্তি নিয়ে তর্ক।" "কারণ প্রতীকের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক রূপরেখায় ফুটে দুটি স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে অনুকম্পনের সেতু বাঁধে, তেমনই এলিঅট-এর মনোভাব দান্তের ভাষাকে অঙ্গীকার ক'রে আপনার সংকীর্ণতা কাটায়।" সুধীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে তাঁর এলিঅট-মনস্কতা নিশ্চয়ই ধরা পড়ে, কিন্তু প্রতীকের যে মনোবিদ্যাগত অর্থ তা আর থাকে না। শুধু তাই নয়, মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রতীক নিয়ে তর্ক আছে—এবং ফ্রয়েডের পরিচিত লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-র উল্লেখে হয়তো ভাবা যায়, সুধীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে আস্থাশীল, অথচ তাঁর প্রতীকের ব্যাখ্যায় তিনি য়ুং পন্থী। যদিও কেন যে তিনি এলিঅটের ঐতিহাসিকতা ছেড়ে য়ুং-এর প্রতীকীতত্ত্বে

আসেন তা বোঝা মুশকিল—তাছাড়া এলিঅটের কাছে 'ঐতিহ্য সজ্ঞানভাবে অর্জিত উত্তরাধিকার, কবি সেখানে গ্রহণ-বর্জন দুই-ই করেন, আর য়ুং-এর সামূহিক অচৈতন্য থেকে উদ্ভূত থিমগুলো সহজাত না অর্জিত সে-সম্পর্কে য়ুং নীরবই থাকেন। বস্তুতঃ মনোবিদ্যার প্রতীকীতত্ত্বের সঙ্গে এলিঅটের ঐতিহ্যকে মেলানো কঠিন ব্যাপার—আর সে মিলনে কতদূর ফললাভ ঘটে তাও বিবেচ্য। আর সেটা মেলাতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথও কম বিপাকে পড়েননি। বাস্তবিক এলিঅট যেমন অসামান্য ইতিহাসচেতনা সত্ত্বেও তাঁর ধর্মানুরক্তিতে শেষ পর্যন্ত তির্যক থাকেন, তেমনি সুধীন্দ্রনাথও তাঁর মনোবিদ্যাসংক্রান্ত নিজস্ব ধারণায় তাল হারান। তা না হলে যিনি লেখেন, "এ কথা না মেনে আর উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর" বা এতদূরও বলেন, সামাজিক অবস্থার প্রতিকূলতায় আর্ট অসম্ভব, তিনিই আবার জানান, ঐ তাঁর মনোবিদ্যার ঝোঁকেই, "কেবল আবেগ নয়, আবেগের প্রকাশভঙ্গিও দেশ, কাল ও পাত্রের অতীত।" বস্তুতঃ এই উক্তিতে সুধীন্দ্রনাথ প্রায় এলিঅটের শিক্ষাকেই নাকচ করেন। আবেগের প্রকাশভঙ্গি বলতে সুধীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কাব্যের রূপ-কে বুঝিয়েছেন—সে ক্ষেত্রে এলিঅটও কাব্যের রূপ বা ফর্মকে দেশ-কাল-পাত্রের অতীত বোঝেন নি। হয়তো প্রসঙ্গ-প্রকরণের আলোচনায় এলিঅট সামান্য বেশি জোর দেন প্রকরণের দিকে, তথাপি প্রসঙ্গ-প্রকরণের অনুভূতি, বাক্য ও চিত্রকল্পের কাব্যময় সমন্বয়ই তিনি বড় ভাবেন। তাঁর কাছে কবিতা নামক সৃষ্টিময় কাজে এরা সমান গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। এমনকি সিদ্ধান্তেও আসেন যে, ফর্ম ও কনটেন্ট একই ব্যাপার, উৎকৃষ্ট সাহিত্যে তাদের পৃথক করা যায় না। এবং কাব্যের রূপে প্রবল পরিবর্তন, এলিঅটের কাছে, সমাজ ও ব্যক্তিতে গভীর কোনো পরিবর্তনের লক্ষণ। যেহেতু পাঠকচৈতন্যের উদ্‌বোধনেই এলিঅটের মতে কবির অন্যতম উৎসাহ, সেহেতু তিনি ন্যায্যতই কবিতার রূপের কথা বলেন—সুধীন্দ্রনাথও কবিতার দ্বারা পাঠকচৈতন্যের উদ্‌বোধন চান, কিন্তু তাঁর কাছে কবি ও পাঠক একটা স্ট্যাটিক ধারণা—কারণ তারা দেশ-কাল-পাত্রের অতীত। এলিঅট তাঁর তির্যক ইতিহাসবোধেও ঐতিহ্যচেতনায় রূপ ও বিষয়ের একাত্মতা দেখেন, প্রসঙ্গ-প্রকরণ অবিচ্ছেদ্য ভাবেন ও তাদের ঐতিহাসিকতা, দেশ-কাল-পাত্রের পট মনে রাখেন, সুধীন্দ্রনাথ কাব্যে নৈরাত্ম্যসিদ্ধি, নৈর্ব্যক্তিকতা, শিল্পীর আত্মোৎসর্গের কথা বারবার বলেও

" গিয়ে ফেলেন ঐ এলিয়ট ও তাঁর ব্যাখ্যা ও মনোবিদ্যাকে মেলাতে গিয়ে। বস্তুতঃ সুধীন্দ্রনাথ যে জানেন না আবেগ ও তার প্রকাশভঙ্গি দেশ-কাল-পাত্রের অতীত নয়, তা নয়—এই আলোচনাতেই সুধীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উক্তি তা প্রমাণ করে। কিন্তু তিনি বোঝেননি মনোবিদ্যাও যদি সমাজ ও ইতিহাসমুখী না হয় তাহলে তারও নানা বিড়ম্বনা—অবশ্য সাম্প্রতিক মনোবিদ্যা সমাজ ও ইতিহাসমুখী হবার দিকে অগ্রসরমান—এরিখ ফ্রম বা এরিক এরিকসন বা আরও কয়েকজনের লেখা সে কথাই বলে।

হয়তো মনোবিদ্যার নির্বিশেষ প্রতীক-প্রিয়তাই সুধীন্দ্রনাথকে মালার্মে-পন্থী করে, কারণ তিনিই বলেন, "আমার কথার সমর্থনে মালার্মে-প্রমুখ ফরাসী কবিদের নামও উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত প্রথায় চিন্তাসম্বন্ধ কবিতা লেখা ছেড়ে, তাঁরা যখন চিত্রপ্রধান কাব্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন, তখন প্রতীকের অনাত্ম স্বরূপই তাঁদের উদ্যোগকে অনর্থের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল।" বস্তুতঃ এলিয়ট-মনস্কতায় সুধীন্দ্রনাথ যে পরিপ্রেক্ষিতবোধ, দেশ-কাল সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দেন মালার্মেপন্থী হওয়াতে তেমনি অনবধানতা লক্ষণীয়। যে সুধীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার, ছন্দের, উচ্চারণের সাধর্ম্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অত সচেতন, রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাবলীতে যার পরিচয় বহু জায়গায়, তিনিই বা কি করে বলেন যে তিনি কাব্যে মালার্মে-পন্থী, নিজে বাংলাভাষার কবি হয়ে? সে কি শুধু মালার্মের শব্দচেতনার জন্য—অথচ শুধু শব্দচেতনা বলে কোনো কথা হয় না, যদি না শব্দের নিহিত অর্থচেতনা থাকে। এ ব্যাপারে হয়তো সুধীন্দ্রনাথ বিশের শতকের দর্শনের—লজিক্যাল পজিটিভিস্ট-দের দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু কি করে তিনি ভোলেন এবং অন্তত তাঁর ভোলা উচিত নয় যে, উনিশ শতকের ফরাসী মালার্মের পন্থা এরকম মন্ত্রবাদের, স্বপ্নপূজার পন্থা, যাতে ধ্বনি মন্ত্রের ইন্দ্রজাল বা সংগীতযোজনার অনির্বচনীয়তার বা অশেষ রেশের মধ্য দিয়ে বস্তুর রূপায়ণে স্পষ্ট এবং বাংলায় ঝোঁক যায় প্রতীকের কুহকে বা সংগীতময়তার মধ্য দিয়ে বস্তুরূপায়ণে ততটা নয়, যতটা শব্দের প্রত্যক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিধার দিকে।[৩]

অবশ্য মনে রাখা দরকার সুধীন্দ্রনাথের বিবেচনায় কবিপ্রতিভার একমাত্র অভিজ্ঞানপত্র ছন্দ স্বাচ্ছন্দ্য। এ কথা ঠিক, সুধীন্দ্রনাথের উৎসাহ বরাবরই সমসাময়িকদের প্রতি নির্দিষ্ট ছিল—তার কারণ হিসাবে 'স্বগত'র শেষে তিনি

জানান, "এখানে অর্বাচীনদের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত এই কারণে যে প্রাচীনদের আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি তার অনেকখানি গতানুগতিক।" এই অর্বাচীনদের প্রতি তাঁর উৎসাহে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় তিনি আপ্তবাক্য এড়িয়ে যেতে চান – এবং কে না জানে সমসাময়িকদের বিচার অনেক দুরূহ। হয়তো সে কারণেই বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি'র আলোচনা শেষে ঐ ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যর কথা বলেন—কিন্তু এলিঅট, যিনি নিশ্চয়ই আধুনিক কাব্য তথা ছন্দমুক্তির অন্যতম পুরোধা, তিনি ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই একমাত্র অভিজ্ঞানপত্র মানবেন কি—ওফেলিয়া বা ক্রেসিডা বা চোরাবালির শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর নির্ভরশীল, এই কথা এলিঅটের পরও মানব? বিষ্ণু দে-ও এ কথা মানবেন না—অন্তত তাঁর প্রবন্ধাবলি এই সাক্ষ্যই দেবে। আসলে রূপ ও বিষয়ের যে সমীকরণ যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের কথা এলিঅট বলেন, সুধীন্দ্রনাথ তাতে আস্থা রাখেন না। প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, বিষয় তাঁর বিচারে নিতান্তই গৌণ হয়ে যায়। শুধু বিষয়গৌরবে যেমন শ্রেষ্ঠ কবিতা হয় না, তেমনি শুধু ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য বা টেকনিক-চর্চাতেও তা লভ্য নয়—"টেকনিকের সাধনা শিল্পীকে জিজ্ঞাসার সীমান্তে টেকনিকের উৎসে নিয়ে" গেলে তবেই টেকনিক-চর্চায় তাৎপর্য আসে। আবার সুধীন্দ্রনাথও কাব্যে বিষয়ের কথা বলে ফেলেন, আর আশ্চর্য, প্রায় শুচিবায়ুগ্রস্তর মতোই। ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ করেন সুধীন্দ্রনাথ, বলেন, "ইতিহাস বহির্জগতের বর্ণনাতে সদাসর্বদা ব্যস্ত, তা ছাড়া তার অস্তিত্ব নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু কাব্য স্বাবলম্বী, তাতে কাব্যেতর বিষয়ের প্রবেশ ব্যাহত ·।" এই উক্তিতে ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অস্বচ্ছ ধারণার পরিচয় যেমন স্পষ্ট, তেমনি "কাব্যেতর"-এর বিষয়ের কথাও মজার। তবে কি সুধীন্দ্রনাথ মনে করতেন, কাব্যের জন্য কাব্যময় কিছু বিষয় নির্দিষ্ট আছে? প্রথমত যাঁর কাছে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যই প্রধান কথা, তাঁর কাব্য-মূলক বা কাব্যেতর বিষয়ের কোনো ঝামেলা থাকা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত এলিয়ট-পাঠের পরও তিনি কেন বোঝেন না, কাব্যেতর বিষয় বলে কিছু থাকতে পারে না—কবির বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বরূপে সব বিষয়েই কাব্য হয়ে উঠতে পারে; তিনিই তো বলেন, "সেজান যখন গোলাবাড়ির চুনকাম করা দেওয়ালে সুন্দরের স্বাক্ষর খুঁজছিলেন, তখন বাষ্পাকুল সুইনবর্ণ কুঞ্জ থেকে কুঞ্জান্তরে ছুটেছিলেন বনদেবীর অভিসারে—অতিমর্ত্য আর্টের অন্তিম রিক্ততা এখানেই পরিস্ফুট।" ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের যে প্রভেদ তিনি টানেন, তাও বিমূঢ়

করে—আসলে এখানেও সুধীন্দ্রনাথের মনোবিদ্যার অনৈতিহাসিক ঝোঁক। আর এই ইতিহাস-বিমুখতাই সুধীন্দ্রনাথের বহু বিড়ম্বনার মূলে, তাঁর ম্যাকসিম গোর্কির ওপর মজার প্রবন্ধটিতে বা শেষ জীবনে সেই রবীন্দ্রনাথের ওপর লেখাটিতে যা প্রকট।

তবে হয়তো বিষয় ও রূপের .য বিভেদ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সুধীন্দ্রনাথ টানেন তার জন্য হয়তো রিচার্ডস-এব অনুপ্রেরণাও ক্রিয়াশীল। সাহিত্য-বিচাবে রিচার্ডস পাঠকের চৈতন্য-উৎসৃষ্ট আবেগগত প্রভাব এবং উপায়, যা এই প্রভাব সৃষ্টি করে, তার মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করেন, তাতেই মূল্য বা বিষয় এবং সংযোগের (যা ফর্ম নিয়ন্ত্রিত) পৃথকত্বে তিনি আসেন—শুধু তাই নয়, টেকনিক্যাল ক্রিটিসিজম ও ইভ্যালুয়েটিভ ক্রিটিসিজমও তাঁর কাছে দুটো আলাদা ব্যাপার। বস্তুতঃ রিচার্ডস-এর তত্ত্ব সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে খানিকটা যে ধাঁধার সৃষ্টি করেছিল বা এলিঅট যে কবিতাকেই পড়তে বিচার করতে বলেছিলেন এই চিন্তায় বাদ সেধেছিল তা আজ স্বীকৃত। বস্তুতঃ সুধীন্দ্রনাথ যে বারবার পাঠকচৈতন্যের উদ্বোধন বা আবেগের সাড়া জাগানোর কথা বলেন, তাঁর কাছে তার মূল ঐ রিচার্ডস, এলিয়ট হয়তো নয়, রিচার্ডস ঐ বিভেদতত্ত্বে নিজেই শেষ-পর্যন্ত সন্দিহান হয়েছিলেন, অন্তত তাঁর কোলরিজ অন ইমাজিনেশন তাই বলে, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের মুক্তি বা ঐতিহ্য ও টি. এস এলিঅট ১৯৩৪-এর আগেই লেখা। রিচার্ডস-এর শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ক অগ্রণী পুস্তকাবলির ভূমিকা আমরা নিশ্চয়ই স্মরণে রাখব, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও মান্য যে সাহিত্য-আলোচনায় অসামাজিক মনোবিদ্যার তির্যক প্রভাবের জন্যও তাঁব দায়িত্ব অনেকখানি—সুধীন্দ্রনাথও এই প্রভাবের অংশভাক্। ইদানীং-এর সুজান লাঙ্গের-রা কাব্যতত্ত্বে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রয়োগেব দুর্বলতা যেমন বুঝছেন তেমনি মনোবিদ্যাও সমাজাভিমুখী হয়ে উঠেছে—আমাদের ... বিং রেই সেই মনোবিদ্যা কত ফলপ্রসূ হচ্ছে তার প্রমাণ বিষ্ণু দে-র রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা সম্পর্কিত অনবদ্য প্রবন্ধটি।

প্রকৃতপক্ষে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধাবলিতে বিভিন্ন উপাদানের যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটাতে পারে নি—তাই, এই আলোচনাতে যেটা স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে, তাঁর প্রবন্ধাবলিতে নানা স্ববিরোধী উক্তি—এলিঅট ও রিচার্ডস-এর মিলন ঘটাতে অন্তত সুধীন্দ্রনাথ সক্ষম হননি। তাই তাঁর এলিয়ট-চর্চার ঐতিহাসিকতা বা বোধও নষ্ট হয়েছে তাঁর বিভিন্নচারিতায়—এই সব

উপাদানকে তিনি তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের আর্তিতে, টানে বাঁধতে পারেন নি। এলিঅটের কাব্যবোধ বা ইতিহাসবোধের পরবর্তী ধাপ যে দ্বান্দ্বিকতায় বাস্তবকে তথা শিল্পকে ধরা, তা নিজবাসভূমে পরবাসী এই ছিন্নমূল কবি-প্রাবন্ধিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯২০-৩০-এর দশকে তাঁর এলিঅটমনস্কতা, নৈরাজ্য নয় নৈরাত্ম্যচর্চা, ব্যক্তিবাদ বা স্বাতন্ত্র্য নয়, ব্যক্তিস্বরূপের ওপর জোর দেওয়া বা ঐতিহ্য সম্পর্কে উৎসাহ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য—বলাই বাহুল্য, এ সবই এলিঅটের দান তাঁর কাছে। যদিও সাহিত্যে নির্লিপ্তির কথা আমাদের রবীন্দ্রনাথও বারবার বলেছেন। উল্লেখযোগ্য সুধীন্দ্রনাথের অনেক চিন্তোদ্দীপক উক্তি - কিন্তু সব মিলিয়ে তিনি স্ববিরোধিতায়, নানাচারিতায় আক্রান্ত। এমনকি যিনি পাঠকচৈতন্যের উদ্বোধন সাহিত্যের প্রায় প্রধান উদ্দেশ্য ভাবেন; তিনিই বা "ম্যাকসিম গোর্কি"র মত রচনা লিখে ফেলেন কি করে—গোর্কির রূপনৈপুণ্যে তাঁর সন্দেহ নেই, অথচ গোর্কির রসায়ন বুদ্ধিজাত নয়, আবেগপ্রসূত, তাঁর পিছনে বিরাট সাধনা নেই, আছে স্বাচ্ছন্দ্য, গোর্কির লেখা প্রেরণাপ্রধান ইত্যাদি উক্তি তাঁর মত এলিঅট-অনুসারীর কাছ থেকে অবান্তরই। আর সুধীন্দ্রনাথের মতে তো রূপনৈপুণ্যই আবেগ জাগানোর চৈতন্যের উদ্বোধনের মূল চাবিকাঠি। এই স্ববিরোধিতা শিকড় হীন পরবাসীর বিচ্ছিন্নতাতেই আসে, আবেগ ও বুদ্ধি ভিন্ন পথে চলে। মাঝে মাঝেই সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে প্রসঙ্গকে প্রকরণ দিয়ে চাপা দিতে চান—বাস্তবিক এই স্ববিরোধিতার মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গিই যা সমান। নচেৎ তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব নিতান্তই সামান্য মূল্যের।

---

১. ছন্দের দিক থেকে হয়তো সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দও তাঁর নাম করেছেন। কিন্তু আধুনিক আত্মসচেতনতায় তাঁর কবিতা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে না। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ ছন্দ স্বাচ্ছন্দ্যকেই কবিতার একমাত্র অভিজ্ঞান ভাবেন—সে বিচারে সত্যেন্দ্রনাথকে তো খুবই বড় কবি বলতে হয়—অন্ততঃ সুধীন্দ্রনাথের ভাবনা অনুযায়ী তাই হওয়া উচিত।

২. দি ইউজ অব পোয়েট্রির কোন কোন উক্তিতে হয়তো য়ুং-এর প্রভাব প্রায় প্রত্যক্ষই বলা যায়। কিন্তু এলিঅট তাকে নিজের ভাবনার সঙ্গে মেলাতে পারেন, আসলে এটা তাঁর নিজের ঐতিহ্যবোধেই অনুকূলই হয়।

৩. কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ মালার্মেপন্থী—এটা প্রায় প্রবাদবাক্যের মতই আমরা উচ্চারণ করি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতা কতটা চিত্রপ্রধান বা সঙ্গীতময়তার দিকে ঝোঁকে, তা বিচারসাপেক্ষ। দশমীর কবিতা-কটি ছাড়া আর খুব কম কবিতাতেই সুধীন্দ্রনাথ প্রতীকী কবিদের অনুসারী।

৪. সুধীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবোধেও যে নানা বিড়ম্বনা তা প্রমাণিত হয় তাঁর বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন সম্পর্কে উক্তিতে। এলিঅটের রোমান্টিকতা-বিরোধিতার তত্ত্ব মানে বোঝা যায়, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের উক্তির তো একটাই ব্যাখ্যা—উনিশের শতকের বাংলা দেশকে আদৌ বোঝেন নি।

বিষ্ণু দে-র নন্দন চিন্তা

এলিঅট তাঁর ফ্রন্টিয়ারস অব ক্রিটিসিজ্‌ম নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে, তাঁকে প্রভাবিত করেছেন এমন কবি ও কাব্য নাট্যকারের উপর লেখাগুলোই তাঁর সাহিত্য সমালোচনার শ্রেষ্ঠ অংশ। এই সব প্রবন্ধ তাঁর ব্যক্তিগত কবিতা-কারখানার উপজাত অথবা তাঁর নিজের কবিতা গঠনের সময়কার চিন্তা-ভাবনারই প্রসারণ। এ কথা ঠিকই, এলিঅটের কাব্য প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর সমালোচনার যোগ অঙ্গাঙ্গী : হয়তো তাঁর কাব্য বিচারের মানদণ্ড তাঁর প্রবন্ধ থেকে আমরা আহরণ করি। কোন বড় কবি নিজের তাগিদেই, আত্মপক্ষ সমর্থনেই সমালোচনা লেখেন : আত্মসচেতন লেখকের ক্ষেত্রে এই সমর্থন ঘটে পরোক্ষ ভাবে, নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার সূত্রে। বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধাবলীতেও, তাঁর গদ্যে প্রকাশিত শিল্প চিন্তার ক্ষেত্রেও এই বোধ নিশ্চয়ই কার্যকর থাকে : "সাহিত্যের ভবিষ্যতে"র প্রথম প্রবন্ধ থেকেই, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, প্রমথ চৌধুরী বা অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, অথবা রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে, তাঁদের তাৎপর্য ও সীমাবদ্ধতার নূতন আবিষ্কারে বিষ্ণু দে যে মানদণ্ড প্রয়োগ করেন, তা কিন্তু তিনি পান তাঁর কাব্য রচনার কঠিন দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতা থেকে, যা আবার তাঁর স্বদেশ ও সময়ের বিশেষ পরিবেশের চাপে নির্মিত হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিষ্ণু দে (বা এলিঅটের) সমালোচনার অন্য দিক আছে। মনে রাখতে হবে, কবিতা প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতা জাত ঠিকই, কিন্তু তার রূপের বাস্তবও সমান গুরুত্বপূর্ণ—একটি শিল্পগত তত্ত্ব-বিশ্ব, নন্দনতত্ত্ব সব বড় শিল্পীকেই গঠন করতে হয় ; "যখন নান্দনিক লক্ষ্যের সচেতনতার পরিমাপ শিল্পীর জানা হয়, তখনই প্রকৃত সৃষ্টিশীল শিল্প গুরুত্ব অর্জন করে।" বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে এই নান্দনিক লক্ষ্য কি ছিল, অন্য ভাষায় তাঁর শিল্পচিন্তার স্বরূপ কি—কোন বিশেষ পদ্ধতিগত চিন্তা বা মেথডলজি তাঁর শিল্প বিচারে আছে কিনা—এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তাঁর কবিতার কারণেও গুরুত্বপূর্ণ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাসে' পর্যন্ত তাঁর যে পর্বান্তর, মহানদীর মতই স্রোতের প্রবহমানতায়, সীমা উত্তরণের সাহসিক প্রচেষ্টায়, তার পিছনেও এই নান্দনিক লক্ষ্য, তার বিকাশ।

বিষ্ণু দে-র যে শিল্পচিন্তা, যাকে নন্দনচিন্তাও বলা যায়, তার সূত্রপাত বা হয়ে ওঠা চতুর্দিকের বাস্তবতার চাপেই : "হয়তো বিশ দশকের শেষ দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে একটা সামাজিক চিন্তার বা জগচ্চিত্রের রূপান্তর-সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু সেটা অপরিচ্ছন্ন বা অপরিস্ফুট ছিল এবং বাধ্যতই। তবু খানিকটা স্পষ্ট চেহারা পেল গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে, অথবা স্পেনের ফ্যাসিস্ট বিরোধী লড়াই থেকে। গৌণ আমাদের কাছেও এই চেহারা একটা মুখ্য বিশ্বজনীন মর্যাদা পেল ১৯৪১ থেকে সোভিয়েত দেশের জন্য। এদিকে দুর্ভিক্ষের জন্যে, সাম্প্রদায়িকতার জন্যে আমাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবও হয়ে উঠল মর্মান্তিক।" অল্প বয়স্ক ইংরেজ কবি অ্যালেন লুইসের স্বেদাক্ত বাস্তবতাবোধ গোড়া থেকেই বিষ্ণু দে-র চৈতন্যে ছিল। "এখানে কি একটা একেবারে বিকল হয়ে গেছে আর সব কিছুই দূষিত।" এই যন্ত্রণা থেকে তাঁর যাত্রা শুরু— চলতে হয় নিজেরই সত্তার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, যে-সত্তা ব্যক্তি মানুষেরই অহম এবং সমাজে তার জীবনযাত্রার মিলিত ফল। "এই সত্তাকে বিকশিত বা অর্জন করা সম্ভব একমাত্র নিজেদের মিলিয়ে দিতে পারায় আমাদের আজন্ম মানবিক দৃশ্যের সঙ্গে, আমাদের ইতিহাস এবং আমরা নিজেদের কৃতকর্তব্যে যে সামাজিক দৃশ্যের সঙ্গে আমাদের অবস্থান তার সঙ্গে যেটা আমাদের বিশ্ব দৃশ্যের সৌন্দর্যের, অজস্রতার আর মহিমার একটা বিলক্ষণ সক্রিয় প্রতিশক্তি।" "কিন্তু বিশের দশকে যাকে বলা যায়—আধুনিক বা কালোপযোগী এমন কোনো বিশ্বদর্শন গজায়নি বহু শোষিত নিপীড়িত এবং বিশৃঙ্খলাহত প্রায় অমানুষিক দারিদ্র্যে পর্যবসিত আমাদের এই সমাজে। মনে হয়, ইতিহাস অবশ্যই শেষ অবধি কাজ করে মানবজাতির জন্যে এক বিশ্বেব ন্যায়ানুসারে, কিন্তু এক তালে নয়, এক গায়কি-রীতিতে নয়। কারণ অর্থরাজনৈতিক শক্তিসমূহ যা বাস্তব জীবনের আকার প্রকার প্রভাবিত করে, হয়তো নির্দিষ্টও করে সেগুলি নানা রকম হয়, ফলে রীতি বা ধরণধারণ ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নেয় এবং মানবিক ব্যাপারটাও সময়ের সর্বত্র এক চালে চলে না।"......"কার্ল মার্ক্সের বিশ্বদর্শনের তত্ত্ব ও কর্মযোগও আমাদের চৈতন্যে অঙ্গীভূত হতে লাগল ধীরে ধীরে এবং স্তরে স্তরে পর্বে পর্বে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজে কাঠামোর ঘরানার মধ্য দিয়ে।" বস্তুতঃ মার্ক্সের রচনাবলীতেই, বিষ্ণু-দে তাঁর ঈপ্সিত বিশ্বদর্শনকে, অন্য ভাষায় তাঁর তত্ত্ববিশ্বকে, নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিকে খুঁজে পান. বলা ভাল নানা অভিজ্ঞতার

মধ্য দিয়ে অর্জন করেন। কিন্তু এই বিশ্বদর্শনকে বিষ্ণু দে যে ভাবে আত্মস্থ করেন বা তাঁর নন্দন চিন্তার, নান্দনিক লক্ষ্যের ভিত্তি করেন, তা তাঁর নিজস্ব। এই দর্শন থেকেই তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মেথডলজি গড়ে ওঠে বা তাঁর কাব্যজগতের তত্ত্বগত কাঠামো নির্মিত হয়, কিন্তু তার সঙ্গে মার্কসবাদের নামে প্রচলিত শিল্প-সাহিত্য চিন্তার সঙ্গে পার্থক্য প্রায় মৌলিক। সেই পার্থক্যের জন্যই বাংলা সাহিত্যে প্রগতি বলতে বিষ্ণু দে বোঝেন, "...প্রত্যক্ষের দিকে বৈজ্ঞানিকমন্য ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার। তা ছাড়া লেখকেরা যে পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন, তার থেকেও লেখার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ...সাহিত্যিকরা আজ বিষয় ও কলাকৌশল, ভাব ও রূপের অভিন্নতায় সন্দেহহীন। কলাকৌশল বা টেক্‌নিকের প্রগতি নির্ভর করে মানসের ব্যাপ্তি বা রূপান্তরে। আর এই মনের মানচিত্রে সৃষ্টির আবেগ থাকবে কি করে যদি সে জীবনের দিকে না তাকায়? সাধারণের জীবনেই তো এ মানস সরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত। এই উৎসের সন্ধান কেউ হয়তো জীবনযাত্রার কর্মধারায় পান, কেউ জনগণ মন অধিনায়কদের খুঁজে পান ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতিতে।" "সভ্যতায় আর একটি বড় প্রত্যয় হচ্ছে ব্যক্তিত্ববোধ।" "অবশ্য কবিতা রচনা মাত্রেই আত্মসচেতনতার এক কর্ম। ...ঐতিহাসিক কারণে যতই মানুষের ব্যক্তিসত্তা সমাজাতিরিক্ত, যতই সমাজ-বিচ্ছিন্ন বা বিরোধীই হ'য়ে উঠেছে, ততই আত্মসচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।" এই উদ্ধৃতিসমূহের মধ্যেই বিষ্ণু দে-র শিল্পচিন্তার স্বরূপকে পাওয়া যায়, অন্যভাবে বলতে গেলে তাঁর নন্দনচিন্তাকে, তাঁর মেথডলজিকেই সূত্রাকারে দেখা যায়। 'প্রত্যক্ষের দিকে বৈজ্ঞানিকমন্য ঝোঁক', 'ঐতিহাসিক দৃষ্টি' 'পরীক্ষানিরীক্ষা' 'লেখার বিষয়ে সচেতনতা' 'বিষয় ও কলা-কৌশল' 'ভাব ও রূপের অভিন্নতা' মননের ব্যাপ্তি বা রূপান্তর 'ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতি' 'ব্যক্তিত্ববোধ' 'আত্মসচেতনতা'—বিষ্ণু দে-র বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনায় এই শব্দাবলী ঘুরে ফিরে আসে। এই শব্দের বৃত্তেই তাঁর বিচার পদ্ধতি নির্দিষ্টতা পায়—মার্কসবাদও তাঁর হাতে নতুন নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়।

ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতিতে আস্থা রাখেন বলেই বিষ্ণু দে জানেন অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাসে নয়, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতায়, সময়ের, জীবনের প্রকৃতির বিপুল অর্কেস্ট্রায় বাঁধতে হবে বিশ্ববীক্ষাকে।

এযুগে অখণ্ড চৈতন্যের অভাবে শোক করে লাভ নেই, কারণ সমাজের খণ্ডিত দায় কবিকেশিল্পীকে মানতেই হবে। বস্তুতঃ এইভঙ্গ খণ্ড চৈতন্যবেই নৈর্ব্যক্তিক বীক্ষায় সাহিত্য-শিল্পে অঙ্কিত করতে হবে। আত্মসচেতনতাকে মেশাতে হবে ইতিহাসের বোধে : ব্যক্তিগত প্রতিভার গ্রীসীয় অ্যাটমে নয়, বৃহত্তর সমগ্রের সঙ্গে, শ্রেণী, সমাজ, দেশ, কালের সঙ্গে যুক্ত করেই সাহিত্য শিল্পের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে তাৎপর্যপূর্ণ করতে হবে। বস্তুতঃ, এই নৈর্ব্যক্তিকতাই ব্যক্তিগত ঝোঁক বা আবেগকে সঠিক নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষে দানা বাঁধতে পারে। বৃহত্তর সমগ্রের চেতনা, ও ভবিষ্যৎমুখী ইতিহাসের বিকাশই কবির খণ্ডিত আত্মসচেনতার যন্ত্রণাকে দ্বিধাদীর্ণতা কাটিয়ে দেয়, তাঁর কাজকে করে তোলে যুগের, সময়েরই প্রতীক রূপক। আর এখানেই বিষ্ণু দে স্বীকার করে নেন আধুনিক যুগকে, তার জিজ্ঞাসাকে। বিষ্ণু দে জানেন সভ্যতার বিকাশে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা, বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ঐ নৈর্ব্যক্তিকতারই সহায়ক। ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বময়তাই তিনি আত্মস্থ করেন আধুনিক বিজ্ঞানের বীক্ষায়। সে কারণেই তাঁর বিজ্ঞান দৃষ্টি কেবল সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-আবিষ্কারের বিচ্ছিন্ন খবর সংগ্রহে নয়—রোমান্টিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শিল্পীকে যে অনেকেই শ্রমশিল্প সভ্যতার বিরোধী ভাবেন, নির্জন নিঃসঙ্গ ভাবেন, বিষ্ণু দে তাঁর দ্বন্দ্বময় প্রগতিভিত্তিক বিজ্ঞান দৃষ্টিতে তাকেই ভেঙ্গে দেন—সাধারণের জীবনেই তিনি জানেন সৃষ্টির আবেগের মানস সরোবরের উৎস আর বিজ্ঞানও এই সাধারণকেই মানে—তার উত্তরাধিকারও শ্রেণীহীন, বিষ্ণু দে-র কাছে শিল্প-সাহিত্যেরও। "বিজ্ঞান আলোচনার সময় বিষ্ণু দে-র ঝোঁক স্বভাবতই আধুনিকতার লক্ষণ বিচারে। আধুনিক শিল্পে সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ চারিত্রিক যোগাযোগ পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে আসে তাঁর আলোচনা থেকে। আধুনিক শিল্পে যেমন, আধুনিক বিজ্ঞানেও তাই— সচলতা নয়, সততাই লক্ষ্য। মন ও বস্তু জগতের ম্যাটার ও ফর্মের অদ্বৈত, বিপরীত স্রোতধারার মধ্যে দ্বন্দ্বাত্মক ঐক্য, স্থূল অনুকরণবৃত্তি বা রিপ্রেসেন্টেশনের করুণ ব্যর্থতা—এসবেই আধুনিকতার শিক্ষা, শিল্পে বা বিজ্ঞানে।" (বিষ্ণু দে-র একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত) শিল্পের ক্ষেত্রে বিষয়-বিষয়ীর দ্বন্দ্বের সে সমস্যা চিরকালের, তার সমাধানে বিষয় ও কলাকৌশলের যে অভিন্নতা বিষ্ণু দে দেখেন তার মূলেই এই বিজ্ঞান দৃষ্টি।

তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় বিষ্ণু দে-র নান্দনিক চিন্তায় এই আধুনিক মনন বা বিজ্ঞান দৃষ্টি নির্বিশেষ নয়। ইতিহাসের তাল, গায়কিরীতি যে, সর্বত্র এক নয়, এই বোধ তিনি তাঁর বিশ্বদর্শন থেকেই পান। বিজ্ঞান দৃষ্টির সমাজ প্রেক্ষিত, ঐতিহাসিক পট সর্বদাই তাঁর ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বময়তায় উপস্থিত থাকে। একে কেবল প্রচলিত অর্থে ঐতিহ্যবোধ বলা কিন্তু ঠিক নয়—এক্ষেত্রেও বর্তমান-অতীতের দ্বন্দ্বমিলনই প্রধান কথা—এ ঐতিহ্যবোধ আদৌ এলিঅটীয় নয়। এলিঅটের ঐতিহ্যবোধের ইতিহাস মাঝে মাঝেই ইতিহাসহীনতারই নামান্তর—তাঁর অতীত-ভবিষ্যৎ দুইই বর্তমানের স্থির বিন্দুতে মিশতে চায়। আর বিষ্ণু দে-র চিন্তা ভবিষ্যৎমুখী। আন্তনিও গ্রামসি যাকে বলেন বিকামিং, হয়ে ওঠা, বিষ্ণু দে-র শিল্প-চিন্তায়, বিশেষ বিচারে, সেটাই মূলসূত্ররূপে দেখা দেয়—ঐতিহাসিক পটে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের অবিচ্ছিন্নতায় তাই তিনি তাঁর নন্দন জগতকে গড়ে তোলেন। আর এই বোধ থেকেই ভারতবর্ষের বিপুল লোক ও সংস্কৃত ঐতিহ্যকে তিনি যেমন স্বাঙ্গীকৃত করেন, তেমনি প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণকে ইতিহাসের একটি ঘটনামাত্র ভাবেন না। বাংলা তথা ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের আরম্ভ-বিকাশ, বিষ্ণু দে দ্বন্দ্বময় চিন্তার আলোকেই দেখেন। এর সীমা সম্পর্কে তিনি যেমন সচেতন, ঠিক তেমনি ব্যক্তিনির্ভর এই আধুনিক যুগের কীর্তিও তাঁর চোখ এড়ায় না। আসলে তাঁর নন্দনচিন্তা যেমন গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ইতিহাসের চাপে তেমনি একদিকে শিল্পের জন্য শিল্পের বিলাস, অন্যদিকে যান্ত্রিক মার্কসবাদের ক্ষতিকর একপেশেমির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়। তাঁর এই সংগ্রামে, প্র্যাক্সিসের ধারণাই মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের গভীর তাৎপর্যে তাঁকে নিয়ে যায়, শিল্পকে দেখেন তিনি শ্রমেরই উচ্চরূপ হিসাবে, যা আসলে মানুষের বাস্তব কর্মেরই বিন্যাস, ছবি, যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে, নিজেকে স্বীকার করে এই বস্তুবিশ্বে—সামাজিক স্বাধীন সৃষ্টিময় সত্তা হিসাবে। ঔপনিবেশিক কুশ্রীতা, উত্তর-স্বাধীনতার নৈরাজ্যে কবি এই তত্ত্বগতভূমির যাথার্থ্যে প্রাণময় থাকেন, নিজ কবিতার নদীকে প্রবাহিত রাখেন। আবার দম বন্ধ করা পরিবেশে আত্মসমর্পণ করেন না। সামাজিক স্রোতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখেন। চৈতন্যের স্রোতে স্রোতে সমগ্র বিশ্বই এভাবে আসে উল্লাস-যন্ত্রণার আততিতে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাই বিষ্ণু দে শহর-গ্রামের বিচ্ছিন্নতার ক্ষতির কথা

যেমন বলেন, তেমনি চাষী-বুদ্ধিজীবীর কর্মে, জীবনে সাযুজ্য পান। শ্রমমুক্ত কর্মের ব্যাপ্তিতেই উভয়ের ঘনিষ্ঠতা জীবন সংলগ্নতা:

আমার কাজই হল দিন আনা দিন গুনে যাওয়া
সোনা সোনা ধান ভানা, সাইরেনের গান শুনে যাওয়া
শ্রাবণে সে সাতরঙা আবেগে আবেগে
পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর
রঙের সে মুক্তি কেবা রোখে
মেঘে মেঘে লেগে ক্ষেতে ক্ষেতে ফেটে পড়ে
পাহাড়ে পাহাড়ে উতরোল দীঘির ছায়ায়
বানডাকা পাড়ে পাড়ে উদ্‌গ্রীব আকাশ
মাটির আসন্ন বেগে জলের ফলনে
গ্রামান্তের শহরের বিদ্যুৎমন্থনে

এই সামগ্রিক চেতনা, এই চাষী, শ্রমিকের কবির শ্রমচৈতন্য, মার্কসীয় মানবিকতার শ্রমস্বেদাক্ত বাস্তবের ভিত্তিভূমি থেকে অগ্রসর হন বলেই বিষ্ণু দে ভেঙ্গে দেন বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড দৃষ্টির বিশেষীকরণকে; তিনি জানেন সব মানুষই বুদ্ধিজীবী সব মানুষই শ্রমজীবী। এই প্রক্রিয়া লুই আলথুসে যাকে বলেন বিষয়ীহীন প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বলেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল বা অবনীন্দ্রনাথের বিচারে বিষ্ণু দে অব্যর্থ হয়ে ওঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে বিষ্ণু দের-র বিচার তাঁর দ্বান্দ্বিক তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটায়। "আজকের উত্তরাধিকারী আবিষ্কার করতে হল যাঁদের রচনাবলী বিচার করতে হবে, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ মর্যাদা।"—স্পষ্টতঃই বিষ্ণু দে-র বিচারে বর্তমানের বিকাশের ব্যাখ্যাতেই অতীত আসে, উত্তরাধিকার সন্ধানে, বুঝি বা ঐতিহ্যের শিকড় অন্বেষণে। "আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা।" এই সেতুবন্ধনের প্রয়োজনেই ঈশ্বর গুপ্ত আসেন—কারণ, যে ঐতিহ্য, বহির্জগতের বস্তু সম্পর্কে সুস্থ মনোযোগের যে প্রমাণ, আমরা পাই পাহাড়পুরের শিল্প নিদর্শন থেকে গ্রামশিল্পের লুপ্তপ্রায় নমুনায়, যাকে ইংরেজীতে মানবিকতা বলে তার চিহ্নও আছে এই লোকচৈতন্যের চণ্ডীকাব্যে, মঙ্গলকাব্যে, এমনকি বৈষ্ণবপদাবলীর কনভেনশনে, তাই আসে

গত শতাব্দীর কন্টকিত ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায়। তাঁর কাব্যের যে বস্তু-নির্ভরতা, বুদ্ধির ওপর আস্থা বা অভীপ্সা ও প্রত্যক্ষের সমন্বয় ভাববিলাস এড়িয়ে যাওয়া, ব্যঙ্গ, রসিকতা—এসবই বাংলার জনসমাজের অন্তরঙ্গ চিত্র। এই জনঐতিহ্যের, লোকঐতিহ্যের ধারার পেশলতাই তাঁর কবিতায় নিয়ে আসে অন্য মাত্রা অন্য স্বাদ। আর ঐতিহ্যের জোরেই নতুন সমাজের পটে তিনি আঁচড় কেটেছিলেন। তাঁর জোরালো পদ্যগুলিতে তিনি কোন সমাধান দেন নি, "সমাধান যে কালে ইতিহাসেই প্রায় দৃশ্য ছিল না সেকালে একজন কবির মধ্যে সে দিব্যদৃষ্টি আশা করাই অন্যায়।" বলাই বাহুল্য আরও অনেক আধুনিকদের মতই ঈশ্বর গুপ্ত তিক্ত দ্বিধায় সীমাবদ্ধ। কার্যসিদ্ধির সামাজিক দোটানায়, শিক্ষা ও ঐতিহ্যের আপাতবিরোধে, তিনি ঐতিহ্যের চেনা পক্ষই নিয়েছিলেন। "দেশজ রীতি বা কনভেনশনেই তাঁর কবিত্বের শক্তি এবং সে কনভেনশনের সামাজিক কাঠামোতে তখন ভাঙন ধরেছে, আর সে রীতির লৌকিক স্বভাব এবং রোমান্টিক জ্ঞানগরিমার সমন্বয় তাঁর আয়ত্তে ছিল না। তার কারণ যে, শুধু তাঁর কবিপ্রতিভার সামান্যতা নয় তার প্রমাণ পাই মাইকেল, হেমচন্দ্র একাধিক নামকরা কবিকীর্তিতে।" কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও "বাক্যবিন্যাসের দেশজ রীতি আজও আমরা ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে খুঁজতে পারি, যেমন পারি বস্তুনির্ভর সাধারণ বুদ্ধির সরসতা।" অবশ্য কোনো কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দেশী সাধনায় এই সন্ধানের মধ্যে একটা স্থূলতা দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেও বুদ্ধির এই বিপরীত রূপ আমাদের মধ্যবিত্ত বিড়ম্বনাতেই সম্ভব।

মাইকেলের ওপর তাঁর আলোকসম্পাতী আলোচনাটিতে বিষ্ণু দে বলেন, প্রকৃত সংবেদনশীল মানুষ কলকাতার সমাজে তখন অত্যন্ত কম এবং যে বিষঙ্গ বা অসংহতি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ সর্বনাশের দিকে ঠেলছিল, তাঁর প্রভাবে নিছক মননের প্রক্রিয়াও স্বাস্থ্য হারাচ্ছিল। তিনি মাইকেল-এর কাব্যিক ও ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিকে ইংলণ্ডের ভারতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিলিয়েই দেখেন। তাই মাইকেল বিষ্ণু দে-র কাছে প্রতিভাময় প্রতীক কিংবা মিথ্যা উপমা অনুধাবনের মর্মান্তিক নাটক।

এই বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক পট বিষ্ণু দে-র নন্দনচিন্তায় সর্বদাই উপস্থিত, কিন্তু এই পটকেই তিনি একমাত্র ভাবেন না। এই পটের সঙ্গে পটধৃত ব্যক্তির টানাপোড়েনটাই বড় হয়ে ওঠে তাঁর কাছে—তাই পটের জন্য

যেমন সাফল্য-ব্যর্থতা শিল্পেসাহিত্যে আসে, তেমনি এই পট সত্বেও আসে এই ব্যর্থতা, সফলতা—এমন কি তিনিই দেখান সীমাবদ্ধ পটকেই কেমন ব্যবহার করেন বিশেষ শিল্পী কবি। মাইকেল মানসের কবিত্বের আবেগ যেমন কবি মধুসূদনের বিচারে প্রধান হয়ে ওঠে, তেমনি তাঁর খণ্ড কল্পনার জন্য, ভঙ্গিলতার জন্য তাঁর সমাজকেই অনেকটা দায়ী করেন। আবার শুধু কালধর্মের গুণেই প্রবল কবিত্বের ও ব্যক্তিত্বের ক্রমোৎকর্ষ আসে তাও মানেন না। এই অসংহত অথচ বিরাট পুরুষ মাইকেল তাই বিষ্ণু দে-র কাছে মহান রূপক, মহৎ ট্র্যাজেডী—এবং তাঁর রূপকের, ট্র্যাজেডীর শিক্ষা ঐতিহ্যকে বিষ্ণু দে বর্তমানে যেমন মূল্যবান মনে করেন, মাইকেলের "দেশের মানসের ও ভাষায় সঙ্গে স্বকীয় স্নায়ুতন্ত্রের যোগে"র ওপর তাৎপর্যপূর্ণ জোর দেন, তেমনি বর্তমান-ভবিষ্যতের জন্যই বলেন, "পশ্চিমের ইউরোপের স্বপ্নে আমাদের মুক্তি নেই, না ভাড়া-করা পাপের সন্ধানে, না অস্মিতার জীবনমৃত ক্লান্তিতে, না সাম্রাজ্যবাদের বা স্বাধীন সংস্কৃতির ছদ্মবেশী হাহাকারে।" মাইকেল ঐতিহ্য হিসাবেই বর্তমানে মেলেন, ভবিষ্যতে তাৎপর্যপূর্ণ হন—অথচ তাঁর বিচার হয় তাঁর সমন্বয়কার ঐতিহাসিক পটে। এতে এলিঅটীয় বোধ নিশ্চয়ই সাহায্য করে, কিন্তু অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অবিচ্ছিন্নতায় বা বিশেষ ঐতিহাসিক চেতনায় এলিঅটের শূন্যচারী ইয়োরোপীয় মানসের ধারণা আর থাকে না—দ্বন্দ্বময় বিকাশই বড় হয়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথের বিচারেও এই একই মানদণ্ড প্রয়োগ করেন বিষ্ণু দে। "বাঙ্গালী শিল্পীর রচনা এক হিসাবে এ দেশের নবজাগরণে, যাকে বলে জাতীয় রেনেসান্সে সক্রিয়তার একটি দিক। যে সাধারণ্যে রুচি মূর্তি নিচ্ছে, সেই জনরুচির মানেই এক্ষেত্রে কান্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্ভব।...শিল্পী মানসের আর্তিতে, তার প্রকাশের তাগিদের বিচারেই তাঁর বাস্তব উপলব্ধির সততার বিচার। আমাদের শিল্প-রেনেসান্সের ইতিহাস এ বিচার ছাড়া বোধ্য নয়। এ বিচারেই অবনীন্দ্রনাথের সূত্রপাত ঐতিহাসিক সার্থকতা পায়, এই বিচারেই সেই ধারা পরিণতি পায় যামিনী রায়ের পাকা তুলিতে এবং তারই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পাই তরুণ শিল্পীদের কাজে, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, চিত্ত প্রসাদ, তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের শিল্প প্রচেষ্টায়।" সেই ইতিহাস বোধ এবং ভবিষ্যৎমুখী চিন্তা এখানেও উপস্থিত—অবনীন্দ্রনাথ স্থাপিত হন, তাঁর কীর্তির বিচার হয় তাঁরই সমন্বয়কার

পটভূমিকায়, কিন্তু উত্তরাধিকার কেমন চারিয়ে যায় যামিনী রায়েও, অন্যান্যদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় তাও দেখান। তাঁর "মানসের সমগ্রতার সচেতন কর্ম"ই তাঁকে কারুশিল্পী থেকে পৃথক করে আবার তাঁর সত্তার শিকড় এই বাংলার আদিম গভীরে। এদিক দিয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু। "কিন্তু আসলে তো তাঁর কাজের ক্ষুদ্রাকৃতি সুলভ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বা বলা যায় ঐ ধর্ম সত্ত্বেও, তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক অর্থেই শিল্পী— তাঁর নানা ধরনের কাজে তাঁর ব্যক্তিত্বেরই ছাপ রয়েছে।" আবার এই ব্যক্তিত্বের দ্বিধা বা খণ্ডতা এই সব পথ সন্ধানীদের কি অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল তাও বিষ্ণু দে উল্লেখ করেন। এই দ্বিধা বা খণ্ডতা শিল্পবৃত্তিজীবী এবং শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবধান থেকে আসছে অথচ একই ব্যক্তির মধ্যে শিল্পী ও কারুকারের ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়, প্রয়োজনীয় উভয়ের সুস্থ সম্বন্ধপাত। বস্তুতঃ ব্যক্তিত্ববোধ, বিষ্ণু দে-র নন্দন চিন্তায় একটি বড় কথা—সভ্যতার একটি বড় প্রত্যয় হচ্ছে ব্যক্তিত্ববোধ। "কি করে সমাজ ও ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বাশ্রয়ী সম্বন্ধপাতের দীর্ঘ ইতিহাসে এই ব্যক্তির স্বরূপ মর্যাদা পেতে লাগল, তার ব্যাখ্যা সভ্যতার ইতিহাস। বহির্জগতের বিরুদ্ধশক্তি, অন্ধপ্রকৃতি জন্তু-জানোয়ার, হিংস্র গোষ্ঠীর দলাদলি যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধির কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা পেয়েছে, ততদিন ব্যক্তির মহিমা কবিদের মনেও আসেনি। বাল্মীকি বা হোমর গোষ্ঠীর রচনাই করেছেন……।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ব্যক্তির স্বকীয়তার কথা : ধন নয় মান নয়, একটুকু বাসা করেছিনু আশা। অন্তরের ধ্যান খানির সম্পূর্ণ বাণী লাভ করার আশা তো সচেতন মানুষেরই। এই ব্যক্তিস্বরূপই কেমন খণ্ডিত হয়ে যায় অর্থনীতিগত কারণে। তিনি প্রশ্ন তোলেন : প্রভেদ কেন হবে না দুজন মানুষের শারীরিক মানসিক ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের জন্যে, নিছক মানসিক কারণে? প্রভেদটা হবে অর্থনীতির কারণে? এই মানুষের স্তরে পৌঁছাবার পথেই জীববিদ্যায় মনোবিদ্যায় নির্মাণ কার্য হবে, বিষ্ণু দে-র আশা। কনটেন্টের সীমানা যেখানে জানা থাকবে অর্থাৎ সেই শ্রেণীহীন সমাজে তখনই শিল্পী তদ্‌গত হবে কর্মের সাধনায়। ব্যক্তি-স্বরূপই মুক্তি পাবে।

অবশ্য বিষ্ণু দে-র নন্দনচিন্তার, তার পদ্ধতির তাৎপর্য সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট-ভাবে ধরা পড়ে তাঁর রবীন্দ্রনাথের ওপর দীর্ঘ প্রবন্ধে, যা আবার পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। মার্কসীয় বিশ্বদর্শনের নিজ শিল্পগত ব্যাখ্যার স্তরে স্তরে

তিনি আশ্রয় করেন নানা শাখার জ্ঞানের জিজ্ঞাসাকে : যে মনোবিদ্যার নির্মাণ কার্যের তাঁর আশা ছিল সাহিত্যের ভবিষ্যতে, তা কিন্তু ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের অচেতন বা অবচেতনের ব্যক্তিত্ব লোপে আস্থা রাখেনি, যেমন রাখেনি সাহিত্যের সেইসব শূন্যচারী স্বাধীন ব্যক্তিদের ওপর। অথচ মার্কসীয় দর্শনের নামে যে শিল্প নির্দেশ মাঝে মাঝেই পার্টি বা অন্য কোথাও থেকে পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে আবার লেনিন কথিত প্রাথমিক ব্যক্তি-রচয়িতাটি যাচ্ছিল হারিয়ে : বিষ্ণু দে যে ব্যক্তিস্বরূপের আধুনিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত আত্মসচেনতার, বিজ্ঞানমনস্কতার মননের আর্তিও রূপান্তরের কথা, বিষয় ও রূপের অভিন্নতার কথা বলছিলেন, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বময়তায় সাহিত্যে প্রগতি ও ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ তুলছিলেন, তা একদিকে কলাকৈবল্যবাদী, অন্যদিকে যান্ত্রিক বস্তুবাদের রাজায় রাজায় লড়াইয়ে চাপা পড়ছিল। যান্ত্রিক বস্তুবাদী মাঝখানের বুর্জোয়া সভ্যতার ব্যাপারটা এলিঅটের মতই উড়িয়ে দিয়ে দুয়ে দুয়ে মিলিয়ে দিতে যাচ্ছিল : ব্যক্তিত্বের দীর্ণতা, যন্ত্রণা সবই বুর্জোয়া বিলাস বলে এক প্রগতি পিণ্ড নির্মাণে তারা মাতছিল। অথচ মার্কস-এঙ্গেলসের রচনায় খুব অস্পষ্ট হলেও আভাস ছিল মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণের। "শিল্প সাহিত্যের সমালোচনা মনোবিজ্ঞ নও নয়, ইতিহাসবিজ্ঞানও নয়, কিন্তু দুই সতীনের সঙ্গে তার বাঁধা। একটি কবিতাকে বিশুদ্ধভাবে উপভোগ নিশ্চয়ই সব বিবেচনা সে সময়ে বাদ দিয়ে করা সম্ভব, সম্ভব কেন প্রাথমিক পাঠে একমাত্র সঙ্গত উপায়। কিন্তু একই কবিতা আবার অনেকভাবে ব্যাপ্ত পটভূমিতে পরিণতির অনেক স্তরে উপভোগ্য। কিন্তু সেই উপভোগ'কে চিনতে গেলে বুঝতে গেলে, আবার উপভোগে অবশ্যই সুবিধা হয় সেই কবির সব কবিতা, তার সমসামায়িক কবিতা, সাহিত্য—সেই ভাষার কাব্যধারার স.ঙ্গ ঘনিষ্ঠ হলে তার জল মাটি শিকড় বিষয়ে, তাঁর মনের ও জীবনের আকাশবাতাস বিষয়ে জ্ঞান থাকলে। সে-দিক থেকে ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিক যুগসন্ধিতে রবীন্দ্রনাথই বিরাট বাণীমূর্তি স্বদেশ-আত্মার, যে স্বদেশ-চৈতন্যের স্রোত বিস্তারে শিল্প সাহিত্যের অন্বিষ্টের স্বপ্নপ্রয়াণে দ্রুত পরিবর্তনশীল, প্রাচীন জটিল সভ্যতাকে যে জীবনমৃত্যুকে রূপান্তরিত করছে, আধুনিকতার ইতিহাসযন্ত্রণায়, হয়তো অনেকখানি গৌণ-প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে।" বিষ্ণু দে-র নন্দন জিজ্ঞাসার মূল সূত্র "বাংলা সাহিত্যে প্রগতি"'র পর আবার এখানে নতুন করে উচ্চারিত

হল—একটি কবিতার প্রাথমিক পাঠ থেকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা ক্রমবিস্তারিত হয় সাহিত্যের ইতিহাসে, তার বিষয়ে, ইতিহাসে বা জলমাটিশিকড়ে, আবার কবিরই মনের জীবনের আকাশবাতাসে। মার্কসীয় বিশ্বদর্শন জলমাটিশিকড়ের সন্ধানে অব্যর্থ, কবিতার বা সাহিত্যের প্রতিও যে আগ্রহী তা মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলীতেই প্রমাণ—কিন্তু অমানুষিক প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েও মার্কস তাঁর জীবৎকালে পারেননি সবদিকে সমান মনোযোগ দিতে, নিতান্তই সময়ের কারণে, আবার যুগের কারণেও। তাই বিষ্ণু দে কবিরই মনের জীবনের আকাশবাতাসের বিশ্লেষণে সাহায্য নেন মনোবিদ্যার —আধুনিকতার নির্মাণকার্যে সহায়ক সমাজ-মনস্ক বলা যায় অচেতনে বা সচেতন মার্কসীয় দর্শনে আলোকিত মন-সমাজবিদ্যার : এরিক এরিকসনের রচনাবলীর, যাতে জর্মনীর ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণের উদ্ভাবন ঘটে লুথারের জীবনপাঠে, তরুণ মহীয়ান বা মহীয়ান-তরুণের জীবনের ক্রান্তি-পর্বের গভীর ব্যাখ্যায় বলাই বাহুল্য এ মনোবিদ্যা ফ্রয়েডীয় নয় : কেবল অচেতন, স্বপ্নদর্শন প্রবৃত্তিদমন এখানে প্রাধান্য পায় না, তুলনামূলক নৃতত্ত্ব বা জীববিদ্যার নতুন গবেষণা খুলে দেয় এই অনুমান-সর্বস্ব, আন্দাজনির্ভর বিজ্ঞানের নতুন দরজা, ব্যক্তির আধিব্যাধির, ব্যর্থতা-সাফল্যের কারণ ব্যক্তি ছাড়িয়ে সমাজে খোঁজ করেন মনসমীক্ষকরা, অবশ্যই তাঁহাদের প্রথম সন্ধানী এই সভ্যমানুষ ফ্রয়েডই। রবীন্দ্রনাথের মানসিক আকাশের পরিচয় দানে তাই বিষ্ণু দে এড়িয়ে যান সেই উপনিষদ সর্বস্ব যন্ত্রণাহীন ব্যাখ্যার ঝোঁক, আবার যান্ত্রিক বস্তুবাদের মাছিমারা সরলীকরণ। সে কারণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ববিশ্বের সীমাই কেমন কাজে লাগান কবি, তাঁর সঙ্কট পর্বের উত্তরণে : ইয়োরোপীয় রিল্‌কে, এলিঅট ইত্যাদি যখন খণ্ডচৈতন্যের সচেতনতায় কুঁকড়ে যান, সেখানে কলোনীর এই দুর্গতিতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে সত্য সুন্দরের জোরেই প্রসারিত হন—কিন্তু কঠিন সংগ্রাম করেই, একের পর এক ডার্ক পিরিয়ড পেরিয়ে অনেক স্বপ্নভঙ্গের দীর্ঘ পথযাত্রা করেই। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা বিষয়ক বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ প্রবন্ধটি দেখায়, বিষ্ণু দে-র নন্দনচিন্তার যথার্থতাকে, নতুনত্বকে—মার্কসীয় নন্দনচিন্তার ক্ষেত্রে এ প্রবন্ধ আমাদের দেশে তো বটেই, ইয়োরোপের যে সামান্য খবর বর্তমান লেখকরা এক্ষেত্রে রাখেন, তার পটেও একটি অসামান্য প্রয়াস। বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে, ইতিহাস বোধের সঙ্গে, নন্দনচিন্তার এই নান্দনিক মিলন আমাদের শিল্প সাহিত্য বোধের নতুন দিগন্ত খুলে দেয়—আমাদের দেশে নন্দনচিন্তায়, এই প্রবন্ধ এক স্বাবলম্বী নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গই। অথবা নতুন স্বপ্ননির্মাণ।

পরিশিষ্ট

বিষ্ণু দে-র এই নন্দনচিন্তাই তাঁর তত্ত্ববিশ্ব—রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে তত্ত্ববিশ্বের কথা তিনি বলেন, বিষ্ণু দে-র তত্ত্ববিশ্বও সেই রকম। "· বড় কথা হচ্ছে এই তত্ত্বসংগঠন না করলে রবীন্দ্রকীর্তি থাকত অনেকাংশে মূক, অপ্রকাশিত।" বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বসংগঠন গুরুত্বপূর্ণ—না হলে বার বার নিজ সীমা উত্তরণের, চোরাবালির পর, অন্বিষ্টর পর বার বার অভিযানের কাব্য প্রকাশিত হত না। এই তত্ত্ববিশ্বের জলহাওয়াতেই তাঁর কবিতা বেড়ে ওঠে—তাই তাঁর কবিতা প্রাথমিক ভাবে কবিতা হিসাবে পাঠ্য, তারপর নানা স্তরে তার উপভোগ্যতা, দেশ-কালের জটিল প্রেক্ষাপটে, তাঁরই মনের বিকাশে, বিষয়-রূপের দ্বন্দ্বাত্মক ঐক্যে তাঁরই কবিতা হয়ে ওঠে বাংলাদেশের যন্ত্রণাদীর্ণ বিশ শতকের রূপক বা প্রতীক। কেবল এই মুহূর্তে মনে হয় তাঁর বর্তমানের কবিতা বড় প্রশান্ত, রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি আশা পান কোথা থেকে? যদিও "অসম্পূর্ণ কবিতা-বাংলায় বাংলায়" বা "যদি তারা দল বেঁধে মিছিলে মিছিলে"তে মনে হচ্ছে এই প্রশান্ত ভেঙে আরেক পর্ব তাঁর কবিতায় আসন্ন। তবে এই তত্ত্ববিশ্বের জলহাওয়ার কথা ছাড়াও বিষ্ণু দে-র যে নন্দনচিন্তা তাঁর গদ্য প্রবন্ধাবলীতে ছড়িয়ে আছে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় কবিতাতেও পাওয়া যায়, প্রায় তত্ত্বের মত করেই, কিন্তু কবিতার নিয়মে—বিষ্ণু দে—কবিতার যে বাক্‌স্পন্দ ব্যবহার করেন, মুখের চাল আনেন, তাতে তাঁর কবিতার সিম্ফনি, সঙ্গীতময়তা পায় নতুন শারীরিকতা, বাংলা কবিতার গীতলতার বিরোধেই এই সঙ্গীতময়তা বার বার পেতে চায় দেশজ ছন্দ—এই মুখের ভাষার চালেই তত্ত্ব কবিতায় আসে অনায়াসে—যেমন "চরম ইতিহাসে" বা "হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত আকিঞ্চন কাননভূমি"র মত পারিভাষিক শব্দ বা ছত্র রবীন্দ্রনাথের গানে সুর হয়ে ওঠে।

শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিক তারা, তাই জানে
দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা, জানে সমাধা দুরূহ, তবু আশাও দুর্মর,
বস্তু ব্যক্তি বিশ্ব ব্যক্তি বিষয় বিষয়ী রূপে রূপে
রূপেরই জীবন্ত দ্বন্দ্বে শত জিজ্ঞাসায় রূপান্তরে আশা,
তবু নির্বাহের শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব উপমা পেয়েছে

হৃদয়ের অভিযানে কারখানার বসতিতে খামারে নদীতে
ব্যারাকে ব্যারাকে। কাব্যের যুদ্ধের মিল আজ মেলে
অশ্বমেধ তীর্থযাত্রায় না, ব্যারিকেডে, কলমে না, মিছিলে মিছিলে,
সংগঠনের স্রোতে গঠিতের সংহত সংঘাতে। (শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব,
একুশ বাইশ পৃঃ ২০৮)

তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
আঞ্চলিক মুখে মুখে স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
কথ্যছন্দে, সুরময়, প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ অপ্রাকৃত মধুর কথায়।
(মালার্মে : প্রগতি ঐ, পৃঃ ২৫৬)

তাই শিল্পে সত্তাশুদ্ধ ; তবু জানি জীবনই আকাশ,
শিল্প শুধু মেঘ, জ্যোৎস্না, মাঘী রৌদ্র, আষাঢ়ের ধারা ;
শিল্প শুধু ইতিহাস, মুহূর্তের তোরণে পাহারা ;
তড়িৎ মুহূর্তমাত্র, যদি বলো জীবনই অভ্যাস।......
শিল্পের চিন্ময় কর্ম জীবনের ভঙ্গুর মৃন্ময়ে।
(তাই শিল্পে, আলেখ্য পৃঃ ৫২)

জীবনের চেয়ে শিল্পে বিরোধ কি তীব্র নয়? বিজয়ীর ক্ষমা
সঙ্গীতে জীবনে আনি, আনো আনো স্তুক, আনো বাধ্।
দেয়ালে মুখর হোক কঠিন পাথরে রূপে উত্তীর্ণ সুষমা।
সমস্ত মানুষে দেখি স্তব্ধ বৃক্ষ ফুলেফলে একাকার মূল নতশাখ।
সমাজে সবাই জিতি কালবৈশাখীতে শুদ্ধ শান্তির উপমা।
(জীবনের চেয়ে শিল্পে, ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে পৃঃ ৮)

অবশ্যই মাঝে মাঝে যখন চতুর্দিকের বাস্তবকে মেলাতে পারেন না কবি, তাঁর ব্যাপ্ত দ্বান্দ্বিক ইতিহাসবোধও এদেশের বাস্তবের ভঙ্গে থমকে যায়— "একাত্ম বেদনা বড় বিড়ম্বনা বিচ্ছিন্ন শহরে। /তাইতো শিল্পের মুখ চাওয়া...।" অথবা "মনে হল প্রেরণার প্রদীপ্ত আবেগে/অমাবস্যা মধ্যরাতে একা জেগে জেগে/এবারে ভেঙেছি বুঝি মানুষের অসম্পূর্ণ সীমা।" তবুও শেষ বিচারে বাস্তব ও শিল্পের সমন্বয়েই তিনি আসেন—অবশ্যই প্রত্যয়ের কঠিন সংগ্রামের পর, বিপর্যস্ত সমাজের দেশের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। শিল্পের মানসসরোবরের উৎস যে জীবনেই, এ বোধ তাঁর বিভিন্ন পর্বের কবিতায় পরিব্যাপ্ত।

"বিভাবরী তাকে দিয়ে দাও যাকে দিয়েছ দিবা"

বিষ্ণু দে এখন পৌঁছেচেন পরিণত প্রত্যয়ের প্রগাঢ় তন্ময়তায়। নদী মোহানায় পৌঁছে যেমন শান্ত অনুত্তেজিত, সমাসন্নের জন্য তার প্রতীক্ষা যেমন অন্তর্গূঢ়, বিষ্ণু দে-র পরিণত পর্যায়ের কবিতাবলীও তারই তুল্য। শঙ্খ ঘোষ বলেন[১] সাম্প্রতিক বিষ্ণু দে-র কবিত্ব দীর্ঘ কবিতা অপেক্ষা হ্রস্ব কবিতাতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে। শ্রীযুক্ত ঘোষের মতে 'শীলভদ্র'-ই তাঁর শেষ তুল্যমূল্য দীর্ঘ কবিতা, যদিও আমরা ভুলতে পারি না 'অসম্পূর্ণ কবিতা'র মতো রচনা। শঙ্খ এর একটা চিন্তাযোগ্য সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণও নির্দেশ করেছেন। সে কারণ-নির্দেশ কিছুটা মান্যও বটে। কিন্তু প্রসঙ্গতই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে কী কারণে পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা দাবি করে তাঁর ছোট কবিতাগুলি। জানতে ইচ্ছে করে কী অর্থে তাঁর ছোট কবিতাও তাঁর বিপুল বিচিত্র সংবেদিতার আরেক দিক। আমরা বর্তমান গ্রন্থের শেষ আলোচনার জন্য বেছে নিলাম তাঁর ছোট এবং নাতিদীর্ঘ কবিতাগুলি।

বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতার দুটি ধরনই আমরা বর্তমান বইয়ে আলোচনা করেছি। একটি হল —সাঙ্গীতিক গঠনের কবিতা—'জন্মাষ্টমী'তে যার শুরু, 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ যার চূড়ান্ত বিকাশ ঃ দ্বিতীয়টি হল সেই ধরনের কবিতা, মহাকাব্যের আত্মার ছায়া পড়েছে যেগুলিতে—'জল দাও' কবিতাটিকে এদেরই প্রতিনিধি-রূপ ধরা যেতে পারে। সাঙ্গীতিক গঠনের কবিতার প্রধান স্থপতি বাংলা সাহিত্যে বিষ্ণু দে। এই জাতীয় কবিতা যেমন একটি রাগরূপের বিস্তারের তুল্য, তেমনি এর ছোট ছোট অংশের সূক্ষ্ম কাজও রাগসঙ্গীতের তান-কর্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার দীর্ঘ কবিতার সঙ্গীতকল্প গঠনে যে-মুড্, যে-বক্তব্য, যে-জীবনার্থবোধ কখনো কখনো সক্রিয় থাকে, সঙ্গীত নিজেও তার ভাষ্য রচনা করতে পারে। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কবিতাটিতে সুরারোপের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যা বলেন তা এখানে শোনার মতো[২] ঃ—

১। 'ছন্দের বারান্দা'—শঙ্খ ঘোষ।

২। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের চিঠি

আসলে ঐ কবিতা সুরারোপের জন্য লিখিত হয়নি। 'জ্ঞানপীঠ Award Committee' আমাকে অনুরোধ করেন, 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' নিয়ে কিছু করা যায় কিনা। কবিতাটিকে নানা ভাবে অনেকবার পড়লাম। পড়ে দেখলাম এর এক অন্তর্নিহিত সুর আছে যা সঙ্গীতের মাধ্যমে হয়ত প্রকাশ করা যায় এর এক ভাষ্য হিসাবে। ...সুর স্রষ্টা কবি চিত্রশিল্পী এদের জাত প্রায় এক। এদের স্রষ্টামানসের গহন-লোক খুব রহস্যময়, বিচিত্র এবং মাঝে মাঝে দুর্জ্ঞেয়। আমি, তাই, কেন যে কোন পংক্তির কি সুর লাগিয়েছি, তার সঠিক সংবাদ দেওয়া বড দুষ্কর! মনে হয় প্রত্যেক শব্দের একটা আবহলোক আছে (atmosphere), বিচিত্র mood আছে, রং আছে (chromatic)। এ সবই এক একটা সংবাদ ও সাহিত্য বহন বরে। এর সৃষ্টিপ্রয়াস (সুরে হোক, শব্দে হোক, রং-এ হোক) বাহ্যতঃ খুব conscious মনে হলেও এর অন্তর্লোক নিমগ্ন চেতনায় নির্জ্ঞানে ধরা দেয়। Conscious artist বলতে এইটুকুই বুঝি যে, সে পরিবেশকে এবং তৎসঙ্গে তার tension-কে উত্তাপ সংঘর্ষ সব কিছুবেই সে গ্রহণ করছে সমাজনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ চেতনায়।

এভাবেই একজন শিল্পী সমসাময়িক অপর এক তাৎপর্যময় শিল্পের ভাষ্য রচনা করেন। যাকে শ্রীমৈত্র শব্দের 'আবহলোক', 'মুড্' ও 'রঙ' বলছেন, তাই একদিকে যেমন ঐ দীর্ঘ কবিতাটিকে দিয়েছে সমগ্রের সার্থকতা, অন্যদিকে, একই সঙ্গে কবিতাটির অংশবিশেষকে দিয়েছে স্বনির্ভরতা। অনেক সময় যে, কবি বড় কবিতার অংশকে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে দেন, তাও তাঁর একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি[৩]। সময়ের ছিন্নমস্তা উদ্‌ভ্রান্ততা, অপঘাত, বিকার যখন প্রবল হয়েছে, এই বিনয়ী কবি তখন দীর্ঘ কবিতাকে মনে করেছেন আত্মগরিমা। কিন্তু তাই বলে তাঁর সব ছোট কবিতাই দীর্ঘ কবিতার ভাঙা অংশ নয়। এক হিসাবে তাঁর সব কবিতাই, সকল আধুনিক কবিরই সকল কবিতা—এক অনাহত দীর্ঘ কবিতারই অংশ। তথাপি, বিষ্ণু দে-র ছোট কবিতা বিষ্ণু দে-রই যেন অন্য তুলিকায় আঁকা।

৩। "কয়েক বছর ধরে পারতপক্ষে দীর্ঘ কবিতা লিখি না বা গড়ি না। মনে হত একটু বেশি আত্মগরিমা হয়ে যায়। তাই ভেঙে দিই।"— পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা বিষ্ণু দে-র চিঠি, ২৭. ১১. ৭৪

তাঁর দীর্ঘ কবিতা ও একজাতীয় স্ব-ভাবী ছোট কবিতার পার্থক্যটি এখানে অনুধাবনীয়। আমরা আমাদের বর্তমান গ্রন্থে কবি হিসাবে বিষ্ণু দে-র যে গুরুত্বটি উপলব্ধির চেষ্টা করেছি, সেই সূত্রটি এখানে আর একবার স্মরণ করি। যে-যুগে বিচ্ছিন্নতা, অনন্বয় বা বিবিক্ততা, টেকনোলজির চরমোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমানসকে অধিকৃত করতে চেয়েছে, যে যুগে আপনার অসহায়তাকে, বিষণ্ণ নিরুপায়তাকে মেনে নেওয়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভবিতব্য—যে যুগে রোমাণ্টিকতার অন্তগত শেষ আলোকবর্ণ মুমূর্ষুর পাণ্ডুর হাসির মতো প্রবঞ্চক—সেই যুগে বিষ্ণু দে একটা সুস্থ স্বাভাবিকতার দিকে বারে বারে অঙ্গুলী সঙ্কেত করেছেন। তাঁর দীর্ঘ কবিতায় দেখা যায় এক সংবেদনশীল সামাজিকের, পারিবারিকের সতত উপস্থিতি। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা যে-কবিকে বলেছি বৃহত্তর অর্থে প্রেমের কবি, তিনি আসলে সম্বন্ধ-সততার কবি। বিচ্ছিন্নতার বোধকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, অস্বীকার করেছেন তাঁর চূড়ান্ততাকে, চরমতাকে। তাঁর প্রথম পর্বের ছোট কবিতা-গুলিতে আমাদের লক্ষণীয় ছিল ক্লাসিক বাঁধুনি, মিল বিন্যাসের ধ্রুপদী রীতি, চকিত পুরা-উল্লেখে কবিতাটিকে হঠাৎ আলোকিত করে ফেলা। সেখানেও জীবনের ভাঙাচোরা অংশগুলির সাহায্যে এক একটা স্থাপত্য-কর্মের উপমান গড়ে তোলা ছিল তাঁর অভিপ্রায়। 'অন্বিষ্ট' পর্যায় পর্যন্ত তাঁর ছোট কবিতার মোটামুটি এই ধরন। 'যমও নেয় না ঠাকুমাকে' প্রভৃতি কবিতা থেকে—একেবারে তারিখ ধরে বলা না গেলেও—তাঁর ছোট কবিতায় ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল এক সম্বন্ধসম্পাতী মানুষ।

ইদানীং, ধরা যাক 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'-এর দিনগুলির কিছু আগে থেকেই, তাঁর কবিতায় শিশু এক সুনিশ্চিত আলো ছড়িয়েছে। নিসর্গলোক, নারী, শিশু যেন এই জগতেরই একটা আদল গড়ে তোলে—যে জগতে মানুষ সদা-জড়িত রূপান্তরের কর্মে। অনিবার্যভাবেই এই অপরূপ সম্বন্ধ সততায় কাব্য-প্রসঙ্গে তাঁর 'পার্কে' কবিতাটি স্মরণ করি। পরিহাসে-কৌতুকে মেশা প্রথম স্তবকটি এক অর্থে সম্পূর্ণ নতুন। এতে আর তাঁর প্রথম যৌবনের সেই ব্যঙ্গ-শাণিত চকিত মন্তব্য নেই, চাই কি সে মনোভাবও নেই। এখানে পাই পার্কে পর্যটনরত এক পরিণত সহৃদয় সামাজিককে। দেখা এবং শোনায় পরিপূর্ণ একটি মন, আমাদেরই অনেক কৌতুকপ্রদ ভ্রান্তিতে সরস স্নিগ্ধ এক বহুদর্শী নাগরিক কবিতাটির প্রথম স্তবকে বিচরণশীল। একে ঘিরে,

অথবা, এরই চারপাশে দলবদ্ধ কিশোরের খেলা চলে। কবিতাটির প্রবক্তা চরিত্র নিজেকে নিয়েও পরিহাস করতে ছাড়ে না :—

বেশ লাগে দলবদ্ধ কিশোর আগ্রহ,
একটু বা ভয়ে দেখি, কেন না হঠাৎ বল মাঝে মাঝে ছোটে দিশাহারা,
গায়ে লাগে, এঁকে দেয় পেন্‌শনের শার্টে কোটে পঙ্কের ভূষণ।

এটুকু প্রস্তুতির পরেই কবিতাটি গড়িয়ে গিয়ে স্থির হয়েছে সেখানে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ হলে বলতেন—জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা। বিষ্ণু দে-র দৃষ্টিতে সেই নীলিমাঙ্কশায়ী রূপকের জন্য ধ্যান নেই। যা আছে তাকে বলা যায় শিশুকে প্রতীকিত করে তোলা। সে-ই যেন আমাদের চিরচলিষ্ণু সত্তার প্রতিভূ। অথচ কবিতাটির তৃতীয় স্তবকের প্রারম্ভিক ব্যাক্যাংশ`তে পিতামহসম্বন্ধ-সম্ভব উক্তিটিও সহাস-মধুর— 'সবাই প্রজ্ঞায় স্বচ্ছ।' কিন্তু এটাই সব নয়—যখন বলা হয় :—

এরাই একাল থেকে সেকালের মোগল পাঠান মৌর্য বা কুশন
বহু মৃত্যু দেখে দেখে চলে যায় অনাহত খেলার প্রত্যয়ে ভবিষ্যতে

তখন আমরাও, বহু জটিলতায় পীড়িত মানুষেরা সহসা একটা সম্ভ্রমে ভরাট হয়ে যাই।

এমনি একটি কবিতা 'সূর্যাস্ত-বেলায়'। একটি স্বস্থ গৃহস্থালীর ছবি— একটি ভারতীয় সংসারের, মার্কিনী ধাঁচের মিল-কলকারখানার উচ্চবর্ণের ফ্ল্যাটের নয়, ভারতীয় ত্রিকাল-রূপক-সংসারেরই প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে এই কবিতায় বাসার হাতায় শিশুরা খেলছে, মা বাবারা নিজেদের ভালো লাগায় নিশ্চিন্ত—আর 'এখনও তো আমি আছি' কথাটি বলার গুণে অথবা আড়ম্বর-হীনতায় কেমন যেন ছলছল করে ওঠে। এই জীবন সংক্রান্ত অনন্ত-বোধে অনুভূতিটি শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে প্রশান্ত :—

বাসার হাতায়
আমি আছি, চেয়ে আছি চোখ-মন মেলা ;
ওই দুটি শিশু দেখি, গাছের পাতায়
ফুলে ঘাসে একাকার ; সূর্যাস্ত বেলায়
এই বুঝি মানুষের জীবন্ত আয়না ?

শিশুর অমেয় ভবিষ্যতের আলোয় হয়তো মুছে যায় আজকের জীবনের, আজকের পরিবেশের অভিজ্ঞতার যা কিছু খণ্ডতা ; যা কিছু ম্লানিমা হয়তো

ঘুচে যায়। 'জন্মদিন' কবিতায় শিশুর অনিবার্য জগতের প্রতিমুখেই স্থাপিত হয় অভিজ্ঞের জগতের প্রৌঢ় চেতনা—'জানি চাল্‌শে জন্মদিনে শোকসভার হাওয়ার হিম বয়'। এবং এই ম্লানতাকে ডিঙিয়ে চলে যেতে চাওয়া যেমন ইতিহাসেরও গতিচ্ছন্দ, তেমনি তা সচেতন ব্যক্তিরও আত্মমুক্তির অভিপ্রায়। শিশু এখানে বাস্তবেরই প্রাণচঞ্চল সামগ্রী। শিশু এখানে প্রতীক হয়ে ওঠে কবিরই অভিজ্ঞতার অভিঘাতে। ভাবলে অবাক হই আমরা, একদিন যে কবির কাছে ঘোড়া বা নদী-পাহাড়ের প্রতিমা ছিল অতিক্রমণের, উত্তরণের আহ্বায়ক, শিশুও সেই অভীপ্সার অন্য মূর্তি ধারণ করে কালোত্তরণের নির্দেশক হয়ে। যথালব্ধ পরিবেশকে ডিঙিয়ে যাওয়া, কিছুতেই তার বশীভূত না-হওয়া বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য। কালের প্রসঙ্গে তিনি তাই 'ত্রিকাল' শব্দটিকে একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। এই কাল-চেতনাই সম্বন্ধসততার কবিকে দেয় শিশুর মুক্ত দর্পণে এক প্রগাঢ় চেতনা—যার অপর নাম আবহমান জীবনধ্যান :—

সকর্মক শিশুর হাসি ; আত্মপর চেনা
মেলাতে চাও, বৃদ্ধ, তুমি উদার গোধূলিতে,
সর্বসহ আলিঙ্গনে পাওনা আর দেনা
যে দেশে এক, ব্যাপ্ত আশা উদাস সংবিতে
সবকিছুই শিশুর প্রেমে, বৃদ্ধ, করো ক্ষমা ॥

(বৃদ্ধ করো ক্ষমা)

এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে 'মধ্যিখানে চর' নামে কবিতাটির বৃদ্ধ অভিজ্ঞতা—সে অনুভূতি স্নানে শুদ্ধ হতে চায় শিশুর কিশোরের জীবনস্রোতে, যেখানে জীবনের গতি আছে, গ্লানি নেই। 'আলেখ্য' গ্রন্থের 'একাদশী' কবিতাটি, কিম্বা কোনো কোনো সময়ে সর্বোত্তম বলে মনে হয় এতৎ প্রাসঙ্গিক 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' গ্রন্থের 'বামী' কবিতাটি। এক সুদৃঢ় বস্তুচেতনা, জীবনের কাদামাটি কালিমা সম্বন্ধে অবধানতা অথচ শরতের রৌদ্রের মতো এক ভবিষ্য-বিশ্বাস সেখানে আলো ছড়ায়। এও আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় যা বলেছি সেই কবি-গঠিত বিশ্বতত্ত্বেরই সঙ্গে অন্বিত।

বিষ্ণু দে-র ছোট কবিতা একদিক থেকে তাঁর দীর্ঘ কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আরেক দিক থেকে তা আপন মৌলিক ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে। ব্রাত্যপ্রেণর বা জরের জন্য তাঁর যে বিধিপত্র তাও তাঁর বিস্তৃত জীবন-ভাবনার

আত্মীয়। আবার বিভিন্ন কবিতায় যে পারিবারিক সামাজিক মানুষটি কথা বলে সেও কখনোই আপন বিচ্ছিন্নতাকে গরিমাজনক কোনো ব্যাপার বলে মনে করে না। আমাদের মনে না পড়ে যায় না, 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' গ্রন্থের 'গান' কবিতাটি অথবা 'আমাদের মেয়েরা' কবিতাটি। 'তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে' অন্বিষ্টের দীর্ঘ কবিতার এই অংশ একটি ছোট কবিতা হিসাবেও পৃথকভাবে দাঁড়াতে পারে—আবার দীর্ঘ কবিতার অংশ বলেই তো তার চূড়ান্ত বিচার! কিন্তু যে সব ছোট কবিতাগুলিতে অভিজ্ঞতার শুধু নির্যাসটুকুকে ধরা হয়েছে, ফলিত করা হয়েছে অনুভূতির বিশিষ্ট, কখনো বা অনির্দেশ্য সৌরভকে, সে কবিতাগুলি যতদিন যাচ্ছে ততই যেন হয়ে উঠছে অন্তর্গূঢ়, ততই যেন তাদের ভেতর থেকে গভীরের গুরুমন্থর, অথচ গাঢ় অন্তরঙ্গ একটা স্বরধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। বহুলাংশেই, যথা 'ক্লান্তি নেই' 'ভিলানেল' প্রভৃতি কাবতায় এমন এক গীতলতা, এমনই এক পাহাড়ী নদীর মতো দিগন্ত ভাবিতা, যা অনন্য সাধারণ। এই সব ছোট কবিতাগুলি হন অনেক কথার, দীর্ঘ অতীতের উপসংহার। কখনো কখনো তা অতীতচারী, কখনো তা ভবিষ্যভাবী। কখনো তার মূল সুর প্রতীক্ষা, কখনো তার মূল সুর স্মৃতি-সম্ভোগ। যখন স্মৃতি হয়ে উঠেছে মুখ্য, তখনও কিন্তু কোনো উদাস ধূসরতা কবিতাকে গ্রাস করেনি। যখন প্রতীক্ষা বাজিয়েছে এক গভীর সুর তখনও তাকে তিনি কোনো আশু প্রাপ্যের সরল বোধনে রূপান্তরিত করেন নি। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'র 'যে কথা' কবিতাটির স্মৃতির দিগন্ত কেমন সহনা সূর্যাস্তের রঙে হয়ে উঠেছিল বাঙ্ময়—যে ভাষায় এক উপ-সংহারের ইঙ্গিত অপেক্ষা এক নূতন উপক্রমণিকার আভাস :—

বেশ মনে আছে, তোমার মধ্য বয়সে
আজ বলা যায় দীর্ঘ চেনার রঙ্গে
যে কথা সেদিন বলতে পারিনি রভসে।
সূর্যাস্তের শান্ত শুদ্ধ সাহসে
আসন্ন রাত করবে কি আজ মোলায়েম ?

আবার প্রতীক্ষা, যা বিষ্ণু দে-র ছোট কবিতায় এবং বড়ো কবিতায় সমান ভাবেই এক অন্যতম জীবনের অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে, তারও বিচিত্র ভাবরূপ লক্ষণীয় দুই ধরনের কবিতায় দুই স্তরে। 'জল দাও' কবিতায় বা দীর্ঘ কবিতার অনুরূপ পটে প্রতীক্ষার রূপ ও ভাবটি যথাসম্ভব নির্দিষ্ট। সময়-

সমাজ-ইতিহাসের কোনো রূপান্তরের দিকে ব্যক্তি বা চরিত্রপাত্রের পদক্ষেপ বা যাত্রাই সেখানে প্রতীক্ষার বিশাল সকর্মকবোধের স্রষ্টা। অম্বিষ্টের 'প্রতীক্ষা' কবিতাটিই সমগ্রভাবে আমরা স্মরণ করি। কবিতাটির বাদীসম্বাদী সাঙ্গীতিক স্থাপনায় একপর্যায়ে উচ্চারিত :

তুমি কি কেবল স্বপ্নেই দেবে ডাক
বেহাগে বাজাবে বীণ ?
সূর্যোদয়ের রক্তে কিম্বা সূর্যাস্তের মেঘে
পূব পশ্চিম রাঙা
আকাশ শিকল ভাঙা
ঘুম ভাঙানিয়া
তোমার গানের সুরে সুরে ঘুরি ক্লান্তিবিহীন জেগে।
এ পূর্বরাগ পাবে না ক্রান্ত ?
দিন তো রাত্রি, রাত্রি করেছ দিন ?

আর ঠিক তার পরের অংশেই এই মাত্রাবৃত্তের দীর্ঘপক্ষ বিহঙ্গম যেন ডানা মুড়ে নেমে আসে সেখানে, যেখানে অক্ষরবৃত্তের বহনক্ষম সর্বংসহা ভূমি, সেখানে 'কঠিন মাটি, পাথর কাঁকর লাল মাটি, উৎরাই খাড়াই'। প্রতীক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আবার 'সমে ফেরার' মুহূর্তে মাত্রাবৃত্তেই :

নদীর ধারা
ইতিহাস যেন ব্যর্থ করেছে সব পাহারা
চঞ্চল প্রাণ পাহাড়ে ঝর্না
তাই হিম হ্রদে গোপন কি আজ পূর্বরাগে
স্তব্ধ তাপসী তাই অপর্ণা ?

কিন্তু ছোট কবিতায় এই প্রতীক্ষার ভার এবং ব্যঞ্জনা এমন এক বিপুল অনির্দেশ্যের বার্তা বহন করে, যা স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু তা স্মরণ করিয়ে দেয় শুধু এই অর্থেই যে, সে প্রতীক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা থেকে পৃথক। রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় দুই দিক—প্রতীক্ষিত ও প্রতীক্ষমান। এই দুয়ের বিরহে সংযোগে ব্যাবৃত্ততা স্পষ্ট হয়। বিষ্ণু দে-র ছোট কবিতায় প্রতীক্ষা যে করছে, তার ব্যক্তিত্বই প্রধান কথা। প্রতীক্ষাই এখানে ঐ প্রতীক্ষ্যমানের অভিজ্ঞান। প্রতীক্ষায় যে মিশ্র সুর নিহিত তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা পাই। কিন্তু বিষ্ণু দে সেই মিশ্রসুরের অনুভূতিকে আধুনিকের

আত্মসচেতনতায় বিশিষ্টতা দেন।

সুপরিচিত কবিতা 'ক্লান্তি নেই' স্মরণীয়। 'আমার স্বপ্নও অপরিসীম' এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'ও' এই শব্দাংশটি একাধিক আলো ছড়ায়। এক অর্থ অবশ্যই, অন্যদের মতো কবি-প্রেমিক-সাধক-সংগ্রামীদের মতোই 'আমার স্বপ্নও অপরিসীম'; আরেক অর্থও অনিবার্য—আমার দুঃখ যন্ত্রণা ঘাত-প্রতিঘাতের মতোই, তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই 'আমার স্বপ্নও অপরিসীম'। 'অপরিসীম' শব্দটির ধ্বনি-ব্যঞ্জনা এই অর্থেই অধিক উপভোগ্য। চারিদিকের দুঃসহ রিক্ততার মাঝে কৃষ্ণচূড়ার রঙ ফেরানো, আর চারিদিকের অসাড় হিমের মাঝে ব্যক্তির নিজেকে চিনে নেওয়া সাযুজ্য পায়।

বিষ্ণু দে-র ছোট কবিতায় পাই নিভৃত সংলাপের মৃদু উচ্চারণ যেমন 'ভিলানেল', অথবা অন্যত্র যেমন :—

অসহ আলো আজ ঘৃণায় দগ্ধ,
দূষিত দিনে আর নেইক রুচি,
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ।
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ॥

(অন্ধকারে আর/নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)

আবার কখনো কখনো তাঁর ছোট কবিতায় এক আশ্চর্য স্বগত ভাষণ। প্রতীক্ষা যখন এই স্বগত ভাষণে মূর্ত তখন কবিতা যথাসম্ভব হ্রস্ব। বাণী প্রায় নৈঃশব্দ্যের সীমান্তে, যেমন 'সেই অন্ধকার চাই' কাব্যগ্রন্থের 'রাত্রি যায়, আসে' কবিতাটি :

রাত্রে সে আসে না, শুধু বাগানের শিশির হাওয়ায়
গন্ধটুকু ভাসে।
রাত্রি কাটে অস্পষ্ট বিনিদ্র এক একাকী মায়ায়
দিনের প্রত্যাশে।

দিন কোথা? দিন নেই, দিন প্রতি রাত্রি প্রতীক্ষায়।
রাত্রি যায়, আসে॥

এখানে 'কে সে'-এ প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে অনেক

বড় কথা হল প্রতীক্ষার প্রশান্ত তন্ময়তা। 'রাত্রে সে আসে না' শুধু 'রাত্রি যায়, আসে'—কালের অসীমতা এবং প্রতীক্ষার এক অন্তহীনতা ঊনত্রিশটি শব্দের সাহায্যে মূর্ত করা হয়েছে। স্মৃতি আর প্রতীক্ষা দুইকে মিলিয়ে, দুয়ের অনুরাগে সংরাগে আকর্ষণে এক সত্তা-বিমুক্তির প্রতিমা তিনি গড়ে তুলেছেন। নিজের মুক্তি এবং কবিতার মুক্তি তাঁর কাছে ঐক্য পায় :—

কবিতা কি শুধু ছাপার হরফে মেলে?
কবিতার আদি রূপ কবিতার বাহিরে—
বাঁচাই কবিতা, রুদ্র সে অবহেলে
মৃত্যুকে মারে জঙ্গলে গ্রামশহরে।

মল্লার ভেজা সবিতা/ঈশাবাস্য দিবানিশা

তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো এত কথার জন্য আমরা নিজেরাই সঙ্কুচিত হই, এ প্রসঙ্গে তাঁর কথাটাই হয়ে ওঠে স্মরণীয়—The poetry is in the poems, not in a speech or essay about it.[4]

ঘোড়সওয়ার

ঘোড়া>নদী

॥এক॥

সত্য আর কবিতা এই দুয়ের কোনো বিশেষণ হয় না। 'খানিক খানিক সত্য' মানে মিথ্যা ; 'বেশি বেশি সত্য মানেও তাই। কবিতার বেলাতেও তেমনি বলা যায়—একটু একটু কবিতা কোনো কবিতা নয়। বেশি বেশি কবিতাও তেমনি কবিতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে কিছু একটা হতে চায়। কবিতা, পাঠকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা উচ্চারণ করি। কেউ কেউ কবিতা বোঝে। কেউ কেউ বোঝে না। এবং, যে কবিতা বোঝে তার কাছে শক্ত কবিতা, সোজা কবিতা বলে কিছু নেই—আছে একমাত্র কবিতা। আর কবিতার দিক থেকেও বলতে পারি, সে শুধু রসিকের কাছেই ভোগ্য ও ভেদ্য। অন্যের কাছে সে চিরকাল আবৃত। সে কারণে কবিতার মানে ঠিক করে দেওয়াও খুব দুরূহ ব্যাপার। 'একটি কবিতার অংশবিশেষের অর্থ এক একজনের কাছে এক এক রকম হতে পারে। এই সব অর্থের একটি রেখে আর একটি ফেলে দেওয়াও ভারি ভুল। হয়তো কোনো একটি অর্থকে আমরা কেউ গ্রহণ করতে পারি। অপর কেউ নিতে পাবেন অন্য একটি অর্থকে। কিন্তু দুজনের কেউই বলতে পারেন না, অন্য অর্থটা বাতিল। তুলনা চলে না, তবু তুলনা দিতে ইচ্ছে করে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামনে বিস্ময়ে সমবেত কয়েকজনের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যেব সঙ্গে। সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মূল বিষয় (কবিতার ক্ষেত্রে টোটাল মিনিং) কীভাবে ধারণ কবে রেখেছে নদীর বাঁক, আকাশের আলো, তটের বেখা, জলেব রঙ ইত্যাদিকে—তা এক একজনের কাছে এক একভাবে বিভাসিত হবে। কবিতার ক্ষেত্রে এই সব ব্যক্তিগত উপভোগ এমন ভাবেইপ্রতীকে, পুরাপ্রসঙ্গে, অ্যাটিট্যুড ও টোনের সূক্ষ্মতায় ও বৈশিষ্ট্যে ছন্দোস্পন্দে নানা ভিন্ন তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। মনে রাখা দরকার এতে কবিতাটির বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোনো পুনঃসৃষ্টি হয় না, তারা যেখানে থাকার সেখানেই থাকে, তারা তদতিরিক্ত কিছু নয়, তন্ন্যূন কিছু নয় ; মাঝখান থেকে আমবা লাভবান হই পরস্পরের আস্বাদনের অভিজ্ঞতা-বিনিময়ে।

॥ দুই ॥

'চোরাবালি'র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি না পড়ে আধুনিক বাংলা কবিতার অঙ্গনে পদার্পণ করেন, এমন বোধ হয় কেউ নেই। কবিতাটি সম্বন্ধে আজও প্রধান ব্যাখ্যা—অবশ্যমান্য রসভাষ্য, হয়ে রয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'চোরাবালি' আলোচনা। এই আলোকসম্পাতী কবিতাটির অন্যতম রসগ্রাহী ছিলেন ঐ মনস্বী কবি। ঐ ঠাসা জমাট, বৈদগ্ধ্যে ও উপলব্ধিতে অভিন্ন, প্রবন্ধটি পড়ার পরে 'ঘোড়সওয়ারে'র নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন না জাগাই বিধেয়। তবু কাব্য-পাঠ, কাব্য-রচনার মতোই আটপৌরে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের দ্বারবর্তী হয়ে থাকে না। তাই কবিতাটি—যাকে কবি মুক্তি দিয়েছেন সেই ১৯৩৫-এর জানুয়ারি মাসের এক প্রবল জ্বরোত্তপ্ত রাত্রির অন্তে—কিসের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, কেন সে শুধু দাঁড়িয়েই থাকল না, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে—আজও চলছে—কবিতাটির মধ্যে সেই পরমায়ুর উৎসটি কোথায় —তা জানা বোধ হয় এ আলোচনায় আমাদের মতো সাধারণের এক প্রধান লাভ। এবং সে আলোচনার প্রারম্ভে যদি মনে রাখি কী বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ কবিতাটি সম্বন্ধে এবং সেকথা পড়ে রবীন্দ্রনাথ কী লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তীকে তাহলে কী আমরা খুঁজছি তাও স্পষ্ট হবে। সুধীন্দ্রনাথ 'ঘোড়সওয়ারে'র কবির 'চর্যা ও চর্চা'র একাগ্রতাকে, 'বোধি ও ব্যুৎপত্তির' ঐকান্তিকতাকে এবং 'অন্তর ও বাহিরে'র অভিন্নতাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—'এই ইন্দ্রজালের সর্বপ্রধান নিদর্শন 'চোরাবালি' কবিতা; এবং যাঁদের কাছে য়ুং-প্রমুখ পুরাণবিদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন।' রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের এই আলোচনাটি পড়েন—অবশ্য তার আগেই পড়েছিলেন কবিতাটি। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'ঐ বইটি এবং ঐ নামের কবিতাটি পড়েছি। বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছা করেছি। বুঝতে পারিনি।' আমরা হাসিমুখেই গ্রহণ করি 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট'-এর লেখকের ভালো লাগা এবং মানে বুঝতে চাওয়াকে এক করতে চাওয়ার চেষ্টা। সুধীন্দ্রনাথের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আরেকটু উদ্ধৃত করি—'তাঁর নির্দেশমতো বোঝবার চেষ্টা করলুম। একটা সংশয় তাঁর আশ্বাস

সত্ত্বেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন, এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়। প্রথম পড়বার সময় সে-সংশয় স্বভাবতঃই আমার মনে ছিল না, তাই অর্থ বুঝতে অত্যন্ত গোল ঠেকেছিল। সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়।'[১] আমাদেরও কিন্তু দুটি ব্যাপারে গোল ঠেকছে—এক, অর্থ তাহলে যাহোক একটা তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন, যা একটু আগেই তিনি বলেছেন বুঝতে পারিনি। দুই, এ-কাব্যের 'গুণপনায়' তাঁর সন্দেহ নেই, শুধু, সম্ভবত রিরংসার কারণেই 'শ্রাব্য' হিসাবে তিনি এটাকে দূরে ঠেলতে চান। ব্যাপারটা তা হলে আর তাঁর কাছে কাব্যের নয়, এথিক্‌সের ?

॥ তিন ॥

আমরা একজন অতি সাধারণ পাঠকের কথা জানি যে মফস্বল থেকে শেয়ালদাগামী ট্রেনে বসে ১৯৪৪-এর এক গ্রীষ্মদুপুরে কবিতাটি তার জীবনে প্রথম পড়েছিল। তখন তার বয়স হবে সতেরো-আঠারো। কবিতাটির দ্বারা সে বিপুলভাবে অধিকৃত হয়েছিল। কিন্তু সেই পাঠকের একথা তিলেকের জন্যও মনে হয়নি, একটি রিরংসার রূপক কবিতাটিতে সক্রিয়। সেই অনভিজ্ঞ পাঠক ও আজকের প্রৌঢ় ম্লান পাঠকের মধ্যে বহু অমিল— একটাই মিল। প্রথম ভালবাসাগুলো খুব কম ক্ষেত্রে পালটিয়েছে। আজ দাঁড়িয়ে আছে কবিতাটি তার কাছে রূপক-নিরপেক্ষ ভাবে। রিরংসার রূপক-এর মধ্যে থাকতে পারে জেনেও তার কাছে কবিতাটি নতুন কোনো অর্থ পরিগ্রহ করেনি —শুধু কবিতাটির টীকাগত ডাইমেনশন বাড়ল। 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার'—এই আকুল আহ্বান ও প্রতীক্ষা হয়তো আর একটা স্তর পায় এই মাত্র। কিন্তু সে-স্তর তো সত্যিই, যেমন সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন ভক্ত ভগবান বা পুরুষ-প্রকৃতির রূপক থেকেও নিষ্কাশিত হয়—হতে পারে। প্রতীকী কবিতার ধর্মই এই। তা বহুভাবে স্পর্শ করে। এক এক ক্ষেত্রে তা এক এক রকমের অর্থ-বিচ্ছুরণে সক্ষম। প্রসঙ্গতঃ একটা তথ্য নিবেদন করি। ১৯৪২ সালের মার্টিন কার্কম্যান নামে এক ইংরেজ সৈনিক যুবক এ-দেশে আসেন। স্টেটসম্যান ইংরাজী দৈনিকের তখনকার সোলজার্স কর্ণারে তিনি

১। চিঠিপত্র—একাদশ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—২৬৫ পৃষ্ঠা।

লিখতেন। বাংলা সাহিত্যে অনুরাগী এই যুবক বাংলা ভাষা থেকে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। সেই বামপন্থী যুবকের এতাদৃশ উৎসাহের কারণ—'ওটা নাকি একমাত্র জনগণের কবিতা।' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ মন্তব্য শুনে বলেছিলেন—'তা হতেই পারে। একটা প্রতীকী কবিতার বহু অর্থ ধারণের ক্ষমতা থাকে।'

তাহলে নয় নয় করে এতক্ষণে আমাদের হাতে চারটে ব্যাখ্যা জমে গেল—এক, রিরংসার রূপক, সুধীন্দ্রনাথ যাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। দুই এবং তিন, পুরুষ প্রকৃতি এবং ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যা সঙ্গত নয়, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের মতে যা শোভন এবং সঙ্গত। চার, মার্টিন কার্কম্যানের ব্যাখ্যা, এটা একটা পিপলস পোয়েট্রি। আমাদের বক্তব্য এই যে, চারটি ব্যাখ্যার সঙ্গে কোনো বিবাদ আমাদের নেই। কিন্তু কবিতাটির ব্যাখ্যা করতে হবে মূলতঃ কবির দিক থেকে। তখন আমরা দেখেছি যে, ঐ চারটি ব্যাখ্যার কেউই হারিয়ে যায়নি, এবং সেটাই আসল কথা, সব ব্যাখ্যা-গুলির সহযোগে সংযোগে গড়ে ওঠে পঞ্চম অর্থ, তা আমাদের অনেকের কাছে ঘনিয়ে এসেছে অনেকদিন ধরে।

॥ চার ॥

কবিতাটি লিখিত হয়েছিল বড় অদ্ভুত অবস্থায়। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসের চার কি পাঁচ তারিখ। কবি রিউম্যাটিক ফিভারে শয্যাগত; আগের রাত্রি কেটেছে প্রবল-জ্বরে, ডিলিরিয়মে।[১] ভোরের দিকে তিনি কতকটা আচ্ছন্ন অবস্থাতেই কাগজ কলম চাইলেন। কাগজ-কলম পেয়ে এক ঝোঁকে

১। এই সব এবং পরে ব্যবহৃত অন্য জীবনীতথ্যগুলির জন্য আমি কবি-পত্নী শ্রীমতী প্রণতি দে-র কাছে ঋণী। আমাদের ব্যাখ্যায় যদি ভুল ঘটে তবে সে দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের। প্রসঙ্গতঃ 'মহাশ্বেতা' কবিতাটির রচনা-বৃত্তান্তটিও প্রণিধানযোগ্য। শ্রীমতী প্রণতি দে লিখেছেন—

"ওটা যখন লেখেন তখন শরীরটা অনেকটা ভালো। মার্চের গোড়ার দিক। সেটাও খুব ভোরে উঠেই, একবারে, মানে যাকে বলে একনাগাড়ে লিখে ফেলেছিলেন।...কবিতা লেখার আগে বেশ একটা 'ঘোর' বা অন্যমনস্ক ভাব, চোখে বিশেষ করে, ধরা যেত (এখনও লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়), এখনও লক্ষ্য করা যায়। আমার মনে পড়ে এরকম কথা উনি ছোট ভাইদের সঙ্গে

তিনি 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির প্রথমার্ধ লেখেন। তার পরে ঘুমিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ বাদে ঘুম থেকে জেগে বাকি অর্ধ শেষ করেন। অনুমান '+ – +' এই চিহ্নভাগ বোধ সেই রচনাভাগের স্মৃতিকে বহন করছে আজও। পারিবারিক বন্ধু জীবনময় রায় বিষ্ণু দে কেমন আছেন দেখতে এসে কবিতাটির প্রথমার্ধ পড়েন। তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে যিনি এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন যে কবিতাটির বিচারে এসব তথ্য হয়তো অনাবশ্যক। হয়তো—হয়তো অনাবশ্যক নয়। এটা বিশ্লিষ্টভাবে 'অনাবশ্যক' হতে পারে। কিন্তু কবিতাটি সংক্রান্ত নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে তথ্যটি আর অনাবশ্যক থাকে না। আমি এই অনুচ্ছেদের শুরুতেই বলেছি, কবিতাটি লিখিত হয়েছে এক অদ্ভুত অবস্থায়—কিন্তু নিশ্চয় কবিতাটির মৌল শক্তিগুলি সঞ্চিত হয়েছে লিখিত হবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই কবির অবচেতনে। কারণ অবচেতনের চাপ অত প্রবল ছিল বলেই কবিতাটি অমন অনর্গল উৎসারিত হতে পেরেছিল। অবচেতনের বিস্তৃত অঙ্গন ওখানে অবারিত হতে পেরেছে বলেই কবিতাটি প্রায় একটি ড্রিম পোয়েমের সগোত্র—কোলরিজের কুবলাখানের সৃষ্টিরহস্য মনে পড়াও বিচিত্র নয়।

শুধু 'ঘোড়সওয়ারে'র ক্ষেত্রেই নয়, একটা ভালো কবিতার সৃষ্টিরহস্যের বিষয়টিও আমাদের কাছে মেলে ধরে ঘোড়সওয়ারের সৃষ্টিকথা। বাইরের ঘটনা, জনশ্রুতি, অধীত অভিজ্ঞতা, সাহিত্যপাঠ—সব এসে যুক্ত হয়েছে তৎকালীন বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিজীবনের মুক্তিবাসনার সঙ্গে। এই সকল কিছুর অভিঘাতে একটি স্বতঃসম্ভূত ফার্টিলিটি-কাল্টের প্রতিমা গড়ে উঠেছে

বা চঞ্চলবাবুর সঙ্গে (চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার) আলোচনা করেছেন। আমার মজা লাগত শুনতে যে, শরীর খারাপ থাকলে কবিতা লেখার মেজাজ ভাল আসে। যাই হোক একেবারে লাইন টানা ফুলস্ক্যাপ কাগজে লিখে ফেললেন। ঘোড়সওয়ারও বদল আর করেন নি।"

—কবির যেটা শারীরিক অসুস্থতা, সেটা মানসিক টেনশনকে জ্যাবদ্ধ ধনুর মতো শরনিক্ষেপে উদ্যত করে তুলত। এও এক আত্মনিক্রমণ। 'মহাশ্বেতা' রচনার পরে কবি-পত্নী লক্ষ্য করেন, কবির যেন একটা exhilaration হয়েছে। 'ঘোড়সওয়ার' রচনার পরেই জ্বরতপ্ত বিনিদ্র কবি ঘুমিয়ে পড়েন। আত্মমুক্তির আকুলতা ও সিদ্ধি এখানে প্রধান কথা।

কবিতাটিতে। এগুলি যে জানে না, তার কাছেও যে কবিতাটি ব্যর্থ হয় না, তার কারণ কবিতাটি কবিতাই হয়েছে, তার বেশি কিছু সে হয়নি, কমও কিছু না। এবং কবিতাটির সেই স্বয়ংসিদ্ধি ঘটেছে কবিতার নিয়মেই। এ কবিতাতেও বহু অসম্ভবের সমাবেশ আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে মেনে নিই। যেমন নিয়েছি আমরা 'সোনার তরী' কবিতায়—শ্রাবণ মাসে ধানকটা, পালতুলে ভরা-বাতাসে নৌকা বাওয়া, সূর্যহীন দিনে ছায়া, তেমনি 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাতেও আমরা পাই, মেরু এবং বালুচর, নদী এবং হিমশিলাপাত, বরফ এবং মৃগতৃষ্ণিকা একই সঙ্গে উপস্থিত। এই অর্থবান অসঙ্গতিও কবিতাটিকে করে তুলেছে স্বভাষা-নির্ভর।

কবিতাটি ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়েছে কিছুকাল ধরে। 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র দিনগুলি থেকেই বিষ্ণু দের চেতনাকে অধিগত করেছে একটা নিঃসঙ্গবোধ এবং কেউ একজন এসে, কিছু একটা ঘটে সে নৈঃসঙ্গ্য থেকে তাঁকে উত্তীর্ণ করুক এই কল্পনা।—'আদিম ও স্তব্ধ সেই সঙ্গীহীনতায় এলে তুমি শুভ্র স্মিত রজনীগন্ধার মত একা' অথবা 'পৃথিবীকে চূর্ণ চূর্ণ করে/আকাশ ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে হৃদয়ে আমার/অথবা 'শ্রান্তি বয়ে বসে আছি বাতাসের স্নিগ্ধ প্রতীক্ষায়/মরুভূমি আকাশের চোখে স্নিগ্ধ ছায়ার আশায়' অথবা 'সমুৎকর্ণ অরণ্যানী উর্ধ্বগ্রীব পর্বতের মালা' প্রভৃতি উক্তি বোধ হয় তাঁর তৎকালীন মুক্তি প্রতীক্ষাকেই সংকেত করে। 'কর্মহীন অবকাশ কর্কশ ও কঠিন গুমোটে/কাটে রৌদ্রতাপে বা দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন/রাত্রিও প্রশান্তিহীন— ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়', অথবা মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক ইত্যাদি উক্তিতে ধ্বনিত হয় বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণা। সময়ের বিচারেও বলা যায় এই তো সেই সময় —যখন উত্তর-সাময়িক বিবর্ণতা, নিরুদ্যম নিস্তেজ বিষণ্নতা, চারিদিকের আকাশ-বাতাস মন্থর ও ভারী করে ফেলেছিল। সেই বিচ্ছিন্নতা যেমন ছিল সেদিনের বাস্তবতার একদিক, আবার তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব, তা থেকে উদ্ধারের প্রয়াসও ছিল সচেতন আগ্রণী মানসের আর এক বাস্তবতা। তাই লেখা হয়, 'জলে স্থলে কম্পমান, সৃজনের রূঢ় প্রেমাবেগ,/আমার নিঃশ্বাস স্তব্ধ, কী বিস্ময় দুই চোখে জ্বালা'। লেখা হয়, পরিপক্ক ফল আজ পড়তে তো পারে না মাটিতে/গরমে যে নিরেট বাতাস'। এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিটি এক অনিবার্য আবেগের জন্ম দিয়েছে কবিমানসে। সেই 'সংহত' 'গ্লেসিয়ার' সহসা নদীরূপ ধারণ করেছে

'ঘোড়সওয়ার' কবিতায়—'কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো'।

ভিতরে বাহিরের অভিন্নতা কবিতাটির ঐন্দ্রজালিক সিদ্ধির মূলে, একথা আমরা শুনেছি। এখন দেখা যাক বহিরাধার কী ভাবে কবির ঐ অভিজ্ঞতাকে সাহায্য করল পাত্রস্থ হতে। যে মূল অভিঘাত থেকে কবিতাটির জন্ম, বাইরের কতকগুলি ঘটনা ও অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় তা এবার নিষ্ক্রান্ত হল তার গোপন-বাস ছেড়ে। এই উত্তেজক সূত্রগুলির একটি হল ময়মনসিংহের রাজা শশীকান্তের হাতির চোরাবালিতে ডোবার ঘটনা। আর একটি হল সমুদ্রতীরে ঘোড়া ডুবে যাওয়ার একটি বিদেশী গল্প। বলা বাহুল্য কবির কাছে কোনো দানই, কোন ঘটনার রূপক-ব্যঞ্জনা বা প্রতীকী আকর্ষণ একক-ভাবে গ্রহণীয় নয়—কেউই একক ভাবে বর্জনীয় নয়। হাতী বা ঘোড়া দুয়ের গল্পরই আদ্যন্ত রূপান্তর ঘটেছে কবিমনে—শুধু দুই কাহিনীর নির্বস্তুক সার বা সত্তাটি ব্যবহৃত হয়েছে কবিতায়। তা-ও উন্নীত হল অন্যার্থে। গল্প দুটিতে যা বিপন্নের ব্যাকুলতা—উদ্ধারের জন্য, কবিতাটিতে তার বদলে পেলাম বিচ্ছিন্নের ব্যাকুলতা, চরিতার্থতার জন্য।

ইয়ুঙের ব্যাখ্যাসমেত একটি চীনা গূঢ় মনস্তত্ত্বের বই কবি এ সময়েই পড়েন। সুধীন্দ্রনাথও সেটি পড়েন। Richard Wilhelm-এর চীনা থেকে অনূদিত সেই গ্রন্থ ইয়ুঙের টীকাযোগে প্রকাশিত।[২] সুধীন্দ্রনাথ এটি তাঁর পিতাকে 'পরিচয়ে' আলোচনার জন্য দিয়েছিলেন। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার সঙ্গে এরও কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। পরোক্ষে তা হয়তো উদ্যত করে তুলেছে কবির অভিব্যক্তির প্রাঙ্মুহূর্তকে। স্বপ্ন যেমন একটা ব্যক্তিরই স্বপ্ন, জ্বরের ঘোরও তদ্রূপ একজন ব্যক্তির চেতন অবচেতনের পূর্ণ লীলা। ১৯৩৫-এর ৫ই জানুয়ারির পূর্ববর্তী সমস্ত টেনশন ঐ জ্বরের অবকাশে সংক্ষেপে মুক্ত সংহত হল।

॥ পাঁচ ॥

ওয়াটসাণ্ডিস আদিম উপজাতিরা একটা বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হত বসন্তকালে। মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে ঝোপে ঝাড়ে তাকে আবৃত করতো তারা। এটা হত স্ত্রী-যোনির অনুকৃতি। এটাকে ঘিরে উদ্যত বর্শা হাতে তারা নাচত। উদ্যত বর্শাটি হত সমুত্থিত পুরুষাঙ্গের উপমান। এটা ছিল তাদের

২। দি সিক্রেট অফ দি গোল্ডেন ফ্লাওয়ার। লণ্ডন—১৯৩১

মাটিকে বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি দেবার বিশ্বাসগত পদ্ধতি এবং ক্রিয়া। এই উর্বরতা বিধায়ক ক্রিয়ার সঙ্গে সাধারণ যৌন উত্তেজনার কোন যোগ থাকত না। সে সময়টা তারা নারীসংসর্গ থেকে দূরে থাকত। এই সংস্কার-ভিত্তিক প্রক্রিয়াটির সাহায্যে তারা তাদের কামশক্তিকে রূপান্তরিত করত শস্যসৃজনী আবেগে। প্রতীকটি ধরিত্রী-নারীর প্রতীক। কোনো যৌনচিহ্ন নয়। এই সঙ্গে চিহ্ন আর প্রতীকের পার্থক্যটিও আমাদের মনে থাকে। চিহ্ন শুধু অভিজ্ঞান, বস্তুরূপেই সে আবদ্ধ রাখে আমাদের। প্রতীকেরই আছে বিষয়কে রূপান্তরে উন্নীত করার ক্ষমতা।

'চোরাবালি,' 'বল্লম উঁচু,' 'দীপ্ত ঘোড়সওয়ার', 'হঠকারিতায় ভেঙ্গে দাও ভীরু দ্বার','অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার' ইত্যাদি প্রসঙ্গে-প্রতীকে প্রশ্রয় পেয়েছে বোধ হয় 'রিরংসার রূপকের' জনশ্রুতি। সে জনশ্রুতির যদি কোনো ন্যূনতম ভিত্তি থেকেও থাকে, তবে তাও প্রতীকের জোরেই রূপান্তরিত হয়েছে তামা থেকে সোনায়। প্রসঙ্গতঃ 'দি সিক্রেট অফ দি গোল্ডেন ফ্লাওয়ার' গ্রন্থে চীনতাত্ত্বিক যা বলেন সেটাই বরঞ্চ আরো অনুধাবনীয়—যদি বাইরে থেকে একান্তই কোনো মানের সন্ধান করতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় তন্ত্রের সঙ্গে চীনের এই প্রাচীন তন্ত্রের মিলটুকুও লক্ষণীয়—যা আছে ভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। বিশ্বে যে শক্তি ক্রিয়াশীল যে-ঘটনা ঘটে চলেছে, মানুষ অন্তরে বাইরে তারই অংশীদার। আলো এবং অন্ধকারের বৈপরীত্যকে মেলাতে চাওয়া সেই দুরূহ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাওয়াই হচ্ছে মুক্তিবাসনা। যে-নদী ঘোলাটে শৈবালাচ্ছন্ন জটিলতায় এতদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, সে তখন সহসা খুঁজে পায় নিজের গতিপথ পাথরচাপা বীজভূমির আবরণটা যখন সরে যায়, শুরু হয় বিকশিত হবার পালা। তারই সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে নিরাময়প্রাপ্ত, মুক্ত রূপান্তরিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অর্জনের তীব্র মুহূর্তের। 'কোথায় পুরুষকার/হে প্রিয় আমার প্রিয়তম মোর !/আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর, অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার'—ব্যক্তিত্বের পূর্ণায়নের জন্যে ব্যক্তিত্বের আকুলতা। এবং তখনই বোঝা যায় কবিতাটিতে স্বরারোপের বৈচিত্র্যটি। তখনই বুঝি যে, এই 'অঙ্গীকার' শব্দটির সম্পূর্ণ নূতনার্থে প্রয়োগ সেই বিশিষ্ট স্বর-গ্রহণেরই দান। প্রত্যেক মানুষই তার অন্তর-সত্তায় আপনি পুরুষ আপনি নারী। প্রত্যেক পুরুষের মানসে নির্জ্ঞান স্তরে আছে নারী, নারীর পুরুষ। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় আহ্বানকারিণী আসলে আহূতেরই ব্যক্তিসত্তার

অংশ। ঐ নারীরূপিণী ব্যক্তি অংশই ডাক দিচ্ছে সমগ্রকে সৃষ্টির পথে। ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত এই বাক্‌স্পন্দকে দিয়েছে এক ছন্দ প্রতীক। তা শুধু ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যই নয়—স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনির সন্নিবেশকে তরঙ্গের মতো বা বলা যায় অশ্বারোহীর ওঠাপড়ার মতো বা মিলনচঞ্চলতার স্বপ্নের মতোই সক্রিয় করে তুলেছে।[৩] তৃতীয় স্তবকেই প্রধানতঃ মূর্ত হয়েছে বিচ্ছিন্নতা-জনিত বন্ধ্যা অবস্থার যন্ত্রণা। 'চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া'—বালুকাময় ব্যর্থতার অনুভূতি ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তিতে ধ্বনিত। 'চ'-ধ্বনি এখানে একটা চটচটে মাদকতাকে ফুটিয়ে তুলছে—যা অচিরে পরিহৃত হোক, এই হল উক্তিটির উদ্দেশ্য। 'মৃগতৃষ্ণিকা' শব্দটি ডিঙিয়ে গেল অভিধানকে। একাধিক স্তরবিশিষ্ট শব্দটি একটি বিচিত্র আলো-ছড়ায় শেষ পর্যন্ত। সে হয়ে ওঠে আমাদের চাকচিক্যময় আপাতলোভন মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের প্রতীক। কারো তৃষ্ণা মেটাবার সাধ্য যার নেই, কারো অঞ্জলিতে অর্পিত হবার যোগ্যতা যার নেই, তারই প্রশ্ন 'আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?'

'অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার' থেকে 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার' পর্যন্ত পংক্তি-সম্পূর্ণ উক্তিগুলি নাটকীয়তা এবং গীতলতার সমন্বয়ে সংযোজক বাক্যাংশ বর্জনে আশ্চর্য গতিশীলতা পেয়েছে। সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল,/হৃদয়েআধির চড়া'—এই রকম বিপরীত সমাবেশে হয়ে ওঠে দ্বিতীয়ার্থবাচক। 'আধি' কবিতার চরিত্রটির মানসিকতা বন্ধ্যাত্বের বিশেষণ-গত রূপক হলেও আলগোছে 'অধীর' শব্দের ধ্বনিকে ধরিয়ে দেয়। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো কবিতাটির প্রথম রচনাভাগে '+ – +' চিহ্ন পর্যন্ত পংক্তিগুলি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এক একটি পংক্তি এক একটা ছবি ; চলচ্চিত্রের রীতিতে বা চেতনা প্রবাহের ঢেউয়ে ছবিগুলি ফুটছে, মিলিয়ে যাচ্ছে নতুন ছবি ফুটছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা হয়ে উঠছে বিস্ময়কর গতিময়। কিন্তু দ্বিতীয় রচনাভাগে পংক্তির এই চলন আর নেই। থাকার প্রয়োজনও আর নেই। প্রথম রচনাভাগে প্রাধান্য পেয়েছে অচরিতার্থতার তাড়না 'এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?' দ্বিতীয় রচনাভাগে অসহনীয় বর্তমান যেন অতিক্রান্ত—সমাসন্ন মিলনকে ত্বরান্বিত করার জন্যই যে কথা বলছে কবিতাটিতে, সে সহযোগী হয়ে উঠতে চাইছে—মাত্র সম্পূরক নয়। তাই

৩। ছন্দের বারান্দা। শঙ্খ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮৭ দ্রষ্টব্য। এবং অবশ্যই বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুলের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য' মনে পড়বে।

'হালকা হাওয়ায় হৃদয় দুহাতে ভরো/হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার' ইত্যাদি পরামর্শ, আবেদন বা আহ্বান। সুধীন্দ্রনাথ মন্দ বলেন নি। এসব দরজা ভাঙাটাঙার ব্যাপারে যদি রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়তে পারে—তাহলে আর 'ভক্ত-ভগবানের' সম্বন্ধারোপই বা দূরে থাকে কেন।

কিন্তু তা তো নয়, কবিতাটি শেষ পর্যন্ত পৃথিবী এবং মানুষেরই রূপক। মানুষ ক্ষুদ্রাকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। একের রীতি এবং বিধিবিধান অন্যের মধ্যেও সন্ধেয়। চাঁদ-সূর্য জোয়ার-চড়া পাহাড়-নদী বালু-বরফ সব কিছুর মধ্য দিয়ে যেমন বিশ্ব-জীবন চলেছে চরিতার্থতা এবং অচরিতার্থতার একূলে ওকূলে, মানুষকেও তেমনি সার্থকতার নিরাময়ের পূর্ণতার পথে যেতে হয় সেই সূত্র ধরেই। 'হালকা হাওয়া' কথাটি তিনবার কবিতাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি-অর্থে তা মুক্তির সূচক। বিশ্বার্থে তা ঝড়ের আসন্নতার ইঙ্গিতবহ। 'ছায়া' শব্দটি দুবার এসেছে। বিশ্বগত অর্থে তা আলোছায়ার অংশ। তাকে বাদ দিয়ে অপূর্ণ বিশ্বের প্রবহমানতা। আবার ব্যক্তি-অর্থেও তাই। ছায়া আমাদেরই কামনামগ্ন নির্জ্ঞানলোক। তাকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না মানবিক সমগ্রতা। অন্য হিসাবে সে-ই আমাদের ভূতলোকের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ভাঁড়ারের প্রতীক। তাকে অধিগত করা একটা নৈতিক দৃঢ়সংকল্পের ব্যাপার / কবিতার মানে বলা খুবই কঠিন। বেশি টানাটানি করলে কবিতা মাঝে মাঝে ভুল মানে ধরিয়ে দেয় হাতে। এ-রকম ক্ষেত্রে 'তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার' অযথা আমাদের পুরা প্রসঙ্গ খোঁজায়। সোজা মানেটাই এখানে চমৎকার আলো ছড়াতে পারে। ঐ কষ্টের নদীটি পেরোলে তবে দেখা যাবে ঈপ্সিতকে। উল্লেখ করা সঙ্গত হবে না, রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের চূড়ান্ত অধ্যায়ের আগে বৈতরণী নাম্নী পার্থিব নদীর তীরে পিতৃতর্পণ করেছিলেন।

এ সবের চেয়ে কবিতাটি পড়ে যা পাওয়া যায়, তাই বোধ হয় সর্বোত্তম প্রসাদ। জনহীন মেরুচূড়া থেকে সৃষ্টিশীল কৃতার্থতার পথে আমরা যখনই নেমে যেতে চাইব—যখনই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করতে চাইব আত্মদানে—এটা হয়ে থাকল আমাদের জীবনের সেই মুহূর্তের কবিতা— চিরকালের জন্য।

একটি একান্তই গৌণ বিষয়ের মীমাংসা করে নিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গের পরবর্তী অধ্যায়ে যাব। এইচ. এম. ভি. থেকে প্রচারিত ও প্রকাশিত বিষ্ণু

দে-র কবিতা আবৃত্তির গ্রামোফন রেকর্ড যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা জানেন কবি 'ঘোড়সওয়ারে'র প্রথম পংক্তিটি একটু বদলে দিয়েছেন—'জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার'। কিন্তু মুদ্রিত কবিতায় সর্বত্র আছে, 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। 'নেমেছে জোয়ার' অপেক্ষা 'জেগেছে জোয়ার' অভিধানসম্মত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 'নেমেছে জোয়ার'ই 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার ঠিক পাঠ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ কবিতায় এক অলক্ষ্য গিরিচূড়া, বরফাবৃত মেরুচূড়া উপস্থিত। পাহাড়ী নদীর সমস্ত ঢল নেমে গেছে—সমুদ্রের দিকে—চরিত্র পাত্রটি সেই গ্লেসিয়ার-গলিত জলোচ্ছ্বাসের দিকে দৃষ্টি রেখেই বলেছে—'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। যে 'জেগেছে' বলবে, সে জলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে আগেই —'নেমেছে' বলে সে, যে জল থেকে এখনো রয়েছে দূরে—বিচ্ছিন্নতার জটিল চূড়া থেকে সে দেখে 'জোয়ার নেমেছে'। সুতরাং 'নেমেছে জোয়ার'-ই কবিতাব লজিক-সম্মত পাঠ। জোয়ার সরে যাবার ফলে চড়া জেগেছে—এ ব্যাখ্যা কবিতাটির 'থীম'-এর সঙ্গে মেলে না। জন সমুদ্রে জোয়ার এসেছে অথচ 'হৃদয়ে আমার চড়া'—এই উহ্য 'অথচ'টিকে না ধরলে কবিতাটি শুরু হবে কেমন করে ?

॥ ছয় ॥

যারা কবিতা পড়ি ও ভালোবাসি, তাদের কাছে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির জন্মকথা অন্য একটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি জানতে চাই কবিতার প্রতীকেব জন্মকথা, কেমন করে কবি ব্যক্তিটির আজন্মের গাঢ় অভিজ্ঞতা ধীবে ধীরে উপযুক্ত অনুভূতির সহযোগে, সাযুজ্যে, একদিন সহসা হয়ে ওঠে স্বাধীন প্রতীক—দুর্বার অবশ্য মান্য—যদি তা আমরা বুঝতে চাই, তবে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার ঘোড়ার প্রতীকত্ব অর্জনের পূর্ব বৃত্তান্ত উপভোগ্যই হবে। কবির অভিজ্ঞতার নানা প্রান্ত, নানা বৈপরীত্য কত না অসংখ্যভাবে মিলিত হতে পারে চিত্রকল্পে !—সে মিলনের ঘটক কল্পনা-শক্তি। তখনই পাখির নীড় হতে পারে চোখের উপমা, ঝলসানো রুটি হতে পারে পূর্ণিমা চাঁদের উপমান, উৎকণ্ঠিত চোখ হতে পারে ঝড়েব পাখি, নদী হয়ে যায় বাঁকা তলোয়ার। কিন্তু চিত্রকল্পই যখন বিশেষ কবির জীবনে সহসা স্বাধীন হয়ে ওঠে, তখনই সে প্রতীক হবার পথে পা বাড়ায়। তখন সেই প্রতীকটি আবির্ভূত হওয়া মাত্র আকর্ষিত অনুষঙ্গে আব এক জগতের সৃষ্টি হয়, আর এক জীবন ভাষ্যের।

বাঙ্গালী শিশুর কাছে রূপকথার দৌলতে ঘোড়া একটি সর্বজনীন আবেগের বিষয়। আর ঘোড়ার তেজীয়ান গ্রীবাভঙ্গি, সদা উদ্যত তৎপরতা, সার্বিক ছন্দ, সবার উপরে গতিবেগ, শিশুর সংস্কারমুক্ত মানসিকতায় প্রবল ছায়া ফেলে। সেই প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগে পরের কলকাতার জীবনে ঘোড়া তখনও বাতিল হয়ে যায়নি। 'দুই জ্যাঠার দুটো অস্ট্রেলীয় ঘোড়া ছিল' [৪] গাড়ি ছাড়াও তাদের দর্শন কবির কাছে উপভোগ্য হত সইসরা যখন তাদের বাড়ি উঠোন অবধি নিয়ে আসত। আর একজন আত্মীয় ছিলেন ক্যালকাটা লাইট হর্সের সভ্য।

অসহযোগ আন্দোলনেরই কোনো দিনে মাউন্টেড পুলিশের ঝাঁপিয়ে পড়ায় দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঘোড়ার সতেজ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিটুকু তার মধ্যেও দেওয়ালে পিঠ রেখে সে বালক উপভোগের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। একদিন একটা পাগলা ঘোড়ার সব কিছু এলোমেলো করে দেওয়া দাপট দেখেছিলেন হ্যারিসন রোডে। তারপর তিরিশের ক্লান্ত মন্থর দিনের বিচ্ছিন্নতার বোধ যখন ভারী হয়ে উঠেছে, অথচ সে-অনন্বয়ের অচরিতার্থতা থেকে মুক্তির বাসনাও হয়েছে দুর্মর, তখনই উত্তরণের প্রতীক হয়ে উঠল এতদিনের সঞ্চিত স্মৃতিতে যে আধিপত্য করেছে—সেই শক্তিমান ঘোড়া। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাতে তো বটেই, পরেও যখনই এই কবির কবিতায় ঘোড়ার দেখা পেয়েছি, সে তখনই হয়ে উঠেছে বাধা অতিক্রমণের, উত্তরণের সঙ্কেত। যথা—

(ক) ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল
নাসাপুট উদ্ধত।
সে কোন পাহাড়ে চলেছে, নীলকমল।
বলো কি তোমার ব্রত? (বৈকালী/পূর্বলেখ)

(খ) তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে তুরীয় যান,
দেশ কাল সন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ। [৫] (পদধ্বনি/পূর্বলেখ)

৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা বিষ্ণু দে'র একটি চিঠি এই সব উদ্ধৃতির উৎস। কবি কিন্তু সাধারণতঃ এসব শৈশব-স্মৃতির যবনিকা উদ্‌ঘাটনের পক্ষপাতী নন।

৫। এখানে 'তুরীয়' শব্দটির প্রয়োগ উপভোগ্য। 'তুরীয়' অর্থে ত্বরিত বা শীঘ্রগতি। কিন্তু এখানে সেই অর্থকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তা শব্দানুষঙ্গে তুরঙ্গ-স্মৃতিকে আকর্ষণ করে।

(গ) কিংবা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত

(জল দাও/অন্বিষ্ট)

(ঘ) সে যেন তাতার সওয়ার এক

যেন বা গড়েছে ভাস্কর কোনো গ্রীক,

আতত শরীর এই বুঝি দেবে টঙ্কার,

একটি আস্থা গড়ে দেয় তাকে সিধা পথ।

(আলেখ্য/আলেখ্য)

লক্ষ্য করার বিষয়, ঘোড়া বা হরিণ বা পাখি অপেক্ষা ধীরে ধীরে বিষ্ণু দে'র কাব্যে প্রবলতা পেয়েছে নদী ও পাহাড়। যে অর্থে ঘোড়া, সেই অর্থেই নদী ব্যবহৃত হয়নি, হতে পারে না। সাদৃশ্য শুধু দুয়ের গতিশীলতায়, সাদৃশ্য শুধু দুয়ের তীব্র অনিবার্যতায়। কিন্তু 'ঘোড়া' ও 'নদী' বিষ্ণু দের কবিতায় এই দুই প্রতীকের অর্থ কবির নিজের বিকাশের সূত্রেই অনুধাবনীয়। অথবা আরো বোধ হয় ঠিক ভাবে বলা হয়, যদি বলি, 'ঘোড়া' থেকে 'নদী'তে উত্তরণের মধ্যেই বিষ্ণু দে পেয়েছেন তাঁর আত্মমীমাংসার সূত্র। আমরা আগেই বলেছি 'ঘোড়া' বা 'ঘোড়সওয়ার' আহূত হয়েছে ব্যক্তিরই একটি অংশের দ্বারা। 'অন্বিষ্ট' পর্যায় থেকে 'আলেখ্য' পর্যন্ত সেই আহূত ও আহ্বায়কের ভেদরেখা আর থাকেনি। নদী তখন জীবনেরই প্রতিমা। যে নদী মরিয়া বন্যার বেগে, যে নদীতে চর জাগে, যাকে দেখে কখনো মনে হয়—

আমাদের নদী যেন কান্নার কোটাল কিম্বা

কখনো বা শূন্যচর বাংলার

তারই দুই তীরে তীরে বেয়ে চলি প্রতিদিন দিনগুলি

আমরা গাঁয়ের লোক

সকালের স্তব্ধতায় সন্ধ্যার বিষাদে শূন্য চর বাঙলার

—আমি তো গাঁয়ের লোক/নাম রেখেছি কোমল গান্ধার/

কখনো মনে হয়—

ভাবি পাখি? নাকি জল? জলস্রোত ঘূর্ণি কাল জল,

তরল গতির ছন্দ মাটির পয়ারে পায়দল,

ভেঙেছে জহ্নুর জানু, ছিঁড়েছে কালের ঘন জটা,

কর্দমাক্ত বর্তমান ভবিষ্যে বিহঙ্গ সামুদ্রিক॥

[সনেট (দুই)/অন্বিষ্ট

এইভাবে সমুদ্র তাঁর কাছে হয় মুক্তি, নদী তাঁর কাছে হয় সাধনা। এই ভাবেই নদী-সমুদ্রের সংযোগে-সংবাদে রূপ পায় কবির জীবনরাগ –

তাই দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে
সময়ের তীর ধুয়ে ধুয়ে
চূর্ণ করে নিজ মর্ত্যসীমা মুহূর্তের সংহত ফাল্গুনে
—এই তো দুপাশে মহাসমুদ্রের অস্থির গর্জন গতির প্রচণ্ড হর্ষে
এসেছি তো তাই
তোমার বাহুতে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ নীল শীতল আগুনে।

(ঐ মহাসমুদ্রের/আলেখ্য)

এই নদীই জীবনচক্রের আবর্তনের চলচ্ছবি—নদীর বুকেই বৈশাখ শ্রাবণ আশ্বিনের হরণ পূরণ স্বচ্ছতা। পরিণামী নদী সমুদ্রকে পেয়ে বুঝি বা আবার স্মরণ করে সেই প্রাকৃত উপমা, সেই প্রথম প্রতীককে :

আমরাও গড়ে দেব বারবার হাওয়ার মন্দির
হাওয়ার ঘোড়ার রথ সমুদ্রের ঘোড়া · ···

॥ সাত ॥

'ঘোড়া' থেকে 'নদী এই প্রতীক-রূপান্তরের কাহিনীর মধ্যেই নিহিত আছে বিষ্ণু দের কবি-জীবনের মোড় ফেরার বৃত্তান্ত। 'ঘোড়া' বুঝি বা কিছুটা নাট্যগুণের ধারক ও পোষক। তার দ্রুত চালের ফলে যা দেখা হচ্ছে তা চকিতে দেখা, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে তা ত্বরিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ; 'চোরাবালি'-র 'ঘোড়সওয়ার', 'ওফেলিয়া' 'ক্রেসিডা'-র স্তবক-বিন্যাস, বাক্য-রীতি স্মরণীয়। নাট্যগুণান্বিত সে বাচন-ভঙ্গি সংক্ষেপে সংহত হতে চায়। উল্লিখিত কবিতাগুলির বিশ্লেষণে পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রসাদ লভ্য একথাও আমরা জানি। পক্ষান্তরে 'নদী' পর্যায়ে একদিকে যেমন এসেছে উভকূলগ্রাহী জীবনাগ্রহ, ভাঙনে গড়নে সমান আস্থা, অন্যদিকে তেমন এসেছে মহাকাব্যের মতো, বা, মহাকাব্যোপম উপন্যাসের মতো ধীর লয়, শান্ত ভাবে নানা বিপরীতের সংযোগের সংরাগ শব্দ, প্রতীক এবং সঙ্গীত প্রথম পর্যায়ে প্রায় প্রতিটি বাক্যে পরস্পর নিবদ্ধ ; এ শক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে ম্লান হল না, পরন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হল 'ফ্রেম'। জীবনের সেই কাঠামোকে কূলের সঙ্গে তুলনা করলে এ কবিতা নিজেও একটা অবিচ্ছিন্ন নদী।

একালে ক্রেসিডা-ট্রয়লাস

॥ এক ॥

'ঘোড়সওয়ার' ও 'মহাশ্বেতা' যেমন একটি টানে একেবারে লিখিত, 'ওফেলিয়া' বা 'ক্রেসিডা' তা নয়। কবিতা দুটিরই কিছু কিঞ্চিৎ পরিমার্জনা হয়েছে। লেখার সময়েও যখন মনে এসেছে, তখনই একটু আধটু লিখেছেন। মনে হয় এক দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতিতে কবিতা দুটি আস্তে আস্তে সমুদ্যত হয়েছে।[১]

'চোরাবালি' আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, এক ঐতিহ্যপুষ্ট কবি কী ভাবে তাঁর বর্তমানকে সমাধেয় করে তোলেন পুরাতন কাব্য প্রসঙ্গের উজ্জীবন ঘটিয়ে। ক্রেসিডার এলোমেলো কথা কী ভাবে তাৎপর্য পেল তিরিশের বাঙালী কবির ত্রিকালদর্শী কিন্তু উৎক্রান্তি-অভিলাষী চেতনায়—সুধীন্দ্রনাথ সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁর আলোচনায়। সে আলোচনারই আলোকে সাতের দশকের আমরা, 'ক্রেসিডা'কে জানতে চেয়েছি নতুন করে। কেননা আমিও তো ভুগছি এক কঠিন দুঃসমাধেয় ভবিতব্যে—যা না-হলেই ভালো ছিল তাই হয়—এরই আঘাতে আমিও অন্য সচেতন সামাজিকের মতোই জর্জর—'ক্রেসিডা'র নায়কের মতোই, ওফেলিয়ার নায়কের মতোই। নতুন করেই ক্রেসিডার নায়কের মতোই আমাকে (নাকি আমাদেরও) জেনে নিতে হয় এই সত্য :

"আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।"

ওফেলিয়ার নায়কের মতো আমাকেও খুঁজে নিতে হয় "প্রস্তুতিঘন ভাষা"। তিরিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত পরিকীর্ণ হয়ে আছে এই সন্ধানের আতিতি।

তখনই বিস্মিত হতে হয়, বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই কবির নানা বিপরীতের মধ্যে সমগ্রতাসন্ধানী ঐক্যসূত্রনির্ণয়ের প্রয়াসে। তিরিশে এ কাজ ছিল জীবনোপেত কবিতার রূপান্বেষাতেই যত জরুরী, সত্তরেও সেই অমোঘ আকর্ষণ এতটুকুও শিথিল হয় নি। আধুনিক জীবনের যে জটিলতার পাশবদ্ধতা দুর্মোচনীয়, তারই মধ্যবর্তী হয়ে এ-কবিতাও অর্থসঞ্চারিতায় হয়ে ওঠে ক্লান্তিহীন। 'ক্রেসিডা' তাই সে যুগের প্রায়-যুবক পাঠককে ও এযুগের

১। শ্রীমতী প্রণতি দে-র ব্যক্তিগত পত্র।

প্রায়-প্রৌঢ় পাঠককে দুভাবে স্পর্শ করে। প্রথম স্পর্শে বড় হয়ে উঠেছিল "ক্রেসিডা আমার প্রচণ্ড আকুলতা…", দ্বিতীয় স্পর্শে এই প্রত্যাঘাতবাসনা প্রধান হয়ে বেজেছে "তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে ?/ উন্মাদ আজো হয় নি আমার মন।" আমার সময় লাগবে সেই অক্ষুব্ধ কর্মোদ্যমে পৌঁছতে, যেখানে পৌঁছে বলতে পারা যায় "স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি।" এখন সে পাঠকের আকণ্ঠ আবদ্ধ হয়ে আছে এক যুগায়ত আর্তিতে :

"এই তবে ভোরবেলা।
হে ভূমিশায়িনী শিউলি! আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই ?"

॥ দুই ॥

'ঘোড়সওয়ার'-এর পরে লেখা 'ক্রেসিডা'। 'ঘোড়সওয়ারে' যে-আকুল আহ্বান প্রায় সংকল্প-বদ্ধ হয়ে উঠেছে, যে-আহ্বানের মূলকথা হল, বিচ্ছিন্নতা-জনিত অচরিতার্থতার অবসান ঘটুক, তা 'ক্রেসিডা' কবিতায় প্রবেশ করেছে বৃহত্তর জীবনপটে। জটিলতা, অমীমাংসা, দুঃসমাধেয় দ্বন্দ্ব এবং প্রতি-মুহূর্তের প্রয়াস বিংশ শতাব্দীর তিরিশের যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই কাললক্ষণে চিহ্নিত নায়ক নিরন্তর নিবিড় সংকটের মুখোমুখি হয়ে উত্তরণের পথ খোঁজে। একালের কবির ক্রেসিডা-সম্ভাষী ট্রয়লাসে সেই নায়ক-কল্পনা একালেরই যোগ্য মূর্তি ধরেছে। প্রথম চারটি হ্রস্বপংক্তি অমাবস্যা ও মাঘ-রজনীর উল্লেখে ব্যক্তি-প্রয়াসের গুরুত্ব ও দায়িত্বকে ধরিয়ে দেয়। ঠিক তার পরের অংশেই বন্ধ্যা হাহাকার ও 'কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায়' ধূ-ধূ শূন্যতা স্মরণ করিয়ে দেয় একদিকে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় বর্ণিত বোবা অচরিতার্থ বালুরাশির তপ্ততা ; অপর দিকে তা স্মরণ করায়, এই ব্যর্থতার মাঝখানেই একালের নায়ক শেকস্‌পীয়ার ট্রয়লাসের মতোই প্রথমে ভেবেছিল মুক্তি বুঝি ব্যক্তিগত প্রেমে। নাটকে ট্রয়লাস ভেবেছিল যে-মূল্য তার বিশ্বাস বা উপাসনার বিষয়কে সে দেয়—তা সে নারী, আদর্শ যাই হোক না কেন—বিষয়গুলির মূল্য বুঝি তাই। শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে ট্রয়লাসের এ ভাবনা ভেঙে গেল। একদিকে ক্রেসিডার বিশ্বাসঘাতনে, অপর দিকে হেক্‌টরের মৃত্যুতে, প্রেম ও সৈনিক জীবনের আদর্শ জ্যোতি তার কাছে তার দেওয়া মূল্য ভোগ করতে পারল না। হেলেনের জন্য এত যুদ্ধ-ব্যয় বহন হেলেনকে

প্রায় বাণিজ্যিক সামগ্রী বা পণ্য করে তুলল।

একালের ট্রয়লাস প্রথম থেকেই পৃথক। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের মধ্যবিত্ত যুবকের আপাত উজ্জ্বল সাফল্যের লড়াই এক অর্থে মূল্য-বোধের বাণিজ্যিক অধোগতি। সেই লড়াইয়ের প্রতিমা বুঝি হেলেন। তা শুধু প্রলোভনকেই মৃগতৃষ্ণিকার মতো তীব্রতা দেয়, ধরা দেয় না। তাই তাকে 'লোকোত্তর' বলা।

চতুর্দিকে নানা বর্ণের চিন্তা, একালের নায়কের এপাশে ওপাশে কত সমাধানহীন জটিলতা :

"লাল মেঘ ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভীড়
মেঘে-মেঘে আজ কালো কল্কির দিন হল একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে ঈশান বিষাণে, বজ্রও দিশাহারা।
এলোমেলো কথা ঝাপটি তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।"

মাত্রাবৃত্তের যে ছয় মাত্রার দোলাকে এতদিন জানতাম শুধু সুখদ এবং নিভৃত আলাপনে আবেদনশীল সে যে এমন প্রত্যক্ষ সম্মুখ ভাষণে নাটকীয় তরঙ্গবেগের ঝাপট সৃষ্টিতে সক্ষম, সক্ষম পাথুরে দৃঢ়তা ও বহতা নদীর নমনীয়তাকে সহাবস্থিত করতে—তা কি আগে জানতাম![2] দীর্ঘ পংক্তি-গুলির অসম বিন্যাসে এমন একটা বন্ধুর বিস্তৃতি—যা মনে করিয়ে দেয় অস্তিত্বকে, যা বিকল্প হয়ে ওঠে আবর্তঘন বিশাল জীবনের। মাঝে মাঝে একটি ক্ষুদ্র পংক্তি, বা, একক দীর্ঘ পংক্তি তীরের মতো, কিম্বা দীর্ঘ তরবারির মতোই ঝলসে উঠেছে। বেদনার মতো আঘাত হেনেছে, সে ক্রেসিডা-সম্ভাষণ হয়েছে সফল সামাজিকের স্বভাষণ, কিন্তু এ বিশেষ করে তারই—যে সচেতন, ন্যূনপক্ষে যার আত্মশ্লাঘা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নি, যে জেনেছে নিয়তি-লাঞ্ছিত এই জগতে প্রয়াস এবং পরিণামের সম্পর্ককে, এ স্বভাষণ তারই—

"ক্রেসিডা আমার প্রচণ্ড আকুলতা
জিজীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমন।"

"জিজীবিষু" শব্দের প্রয়োগেই প্রজাপতি মুক্তি পেয়েছে পুরাতন কবি-

---

২। স্মরণীয় বিষ্ণু দে-কে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্র : 'কঠিনের সঙ্গে তরলের চলেছে লীলা'—এ তাঁর কবিতার ছন্দ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দুরপসরণীয় অনড়তার সঙ্গে আপন গতিশীল ব্যক্তিত্বের অভিঘাতেই এই কাব্য-বস্তুর নাটক জমে উঠেছে—ছন্দের সিদ্ধিও তারই দান।

কল্পনার প্রচলিত উৎপ্রেক্ষার বন্ধন থেকে। প্রজাপতির অন্তিম আকুলতা মৃদু অনুপ্রাসে আর 'প্র' ও 'ভ্র'-এর মত শক্ত দুটো যুক্ত ব্যঞ্জনে ধৃত।

॥ তিন ॥

'ওফেলিয়া'র হ্যামলেট, 'ক্রেসিডা'র ট্রয়লাসের মধ্যস্থতাকে এ কালের বাঙালী কবি মেনে নেন বৈদগ্ধ্যের প্রেরণায় নয়। শিল্পমনস্ক হয়েই কবি বিষ্ণু দে বিশ্ব-সংস্কৃতির পথে পথে ঘোরেন। জীবনোপেত কাব্যেরই কারণে তাঁর এই ঘোরাফেরা। সেই প্রেরণাতেই তিনি অনুভব করেছিলেন যে, প্রচুর এবং প্রধান পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই নায়কের সমস্যার এক মৌল সাদৃশ্য বর্তমান। পিতৃব্যগত জননীকে দেখে হ্যামলেটের যে প্রতিক্রিয়া, আর, দ্বিচারিণী ক্রেসিডার জন্য ট্রয়লাসের যে অনুভূতি, তার মধ্যে অস্তিত্বের যন্ত্রণার মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও গুণগত পার্থক্য কম। তাই এই কবি 'ওফেলিয়া' লেখার পরে 'ক্রেসিডা' লেখেন। আর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে অস্তিত্ব যখন ভাবনাজর্জর এবং ভাবনা যখন অস্তিত্বজর্জর, যখন বাঙালী মধ্যবিত্তবুদ্ধিজীবীর অভিজ্ঞতায় নানা অপচারের স্মৃতি অনিদ্র হয়ে অশান্ত, সেই কাল পবিবেশেই তো লেখা হয় 'ক্রেসিডা'। সেই প্রহারিত কালের নাগপাশ দীর্ঘ সময়েও খসে না, ঘটে না কোনো বিপ্লবের গরুড় পক্ষের বিধূনন— তাই অনেক পরে আবার লিখতে হয় 'এলসিনোরে'।

অপচারের স্মৃতি অনিদ্র। জলে শিলা ভাসার কথা নয়, কিন্তু রাবণ জানে যে তাই ভাসল; সংকুল যুদ্ধের প্রাক্কালে কর্ণের জানার কথা নয় সে কানীন কুন্তীপুত্র—কিন্তু তাই সে জানল। হ্যামলেট-জননীর উচিত ছিল না ক্লডিয়াসকে বিবাহ করা, কিন্তু তাই তিনি করেছেন; লিয়র-কন্যাদের পক্ষে সঙ্গত ছিল না পিতার বিরুদ্ধাচরণ করা, তথাপি তাই ঘটল; ক্রেসিডার উচিত ছিল না Diomed-এর প্রতি আসক্ত হওয়া—অথচ অনিবার্য হয়ে উঠল সেটাই। এমনি করেই বুঝি নিগৃহীতের সমস্ত অস্তিত্ব ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেও বাস্তবতা অধিগত করে প্রচণ্ড প্রবলতায়। ট্রয়লাসের আকুল উদ্বেগ এই দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই প্রাণ পায়—কিন্তু সে ট্রয়লাস বিষ্ণু দে-র ট্রয়লাস।

চসর যে কাহিনীকে জেনেছিলেন ইটালি ভ্রমণের কালে, মধ্যযুগের সেই প্রান্তাবসানে আর কিছু নয়, বোক্কাচিয়োর ফিলোস্ট্রেটো থেকে গৃহীত কাহিনীর

রূপান্তরের সাধনে চসরের প্রধান অভিপ্রেত ছিল জীবনকে—প্রত্যক্ষ অনুভবযোগ্য জীবনকে প্রতিফলিত করা। তাই চসর তাঁর Troilus and Criseyde রচনায় বোক্কাচিয়োর Il Filostrato-কে পদে পদে অনুসরণ করলেও শেষোক্ত কাহিনীর করুণ মূর্ছন কে চসর প্রায় পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন মানবিক সরসতার অভিযোজনে। প্যাণ্ডোরা Il Filostratoতে ছিল ক্রেসিডার জ্ঞাতি-ভ্রাতা, চসরের রচনায় তিনি হয়েছেন ক্রেসিডার কাকা। কিন্তু সেই সহজে সন্দিগ্ধ অথচ অনাসক্ত ভূয়োদর্শী ব্যক্তিটির বাস্তবজ্ঞান জীবনের প্রতিই পক্ষপাতী ছিল। অন্যতর প্রাসঙ্গিক সহযোগিতায় চসর এই চরিত্রটির মধ্যস্থতাতেও ঘোষণা করেছেন তাঁর জীবনধর্মী মানবিক অভীপ্সা। চসরের শৈল্পিক তন্ময়তাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বোক্কাচিয়োর কাহিনীতে যে ঘটনাগতির তীব্রতা, তা শিথিল হয়ে গেছে চসরের রচনায়। ক্রেসিডার বিশ্বাসঘাতকজনিত কারুণ্য অপেক্ষা সম্মুখবর্তী জীবন চসরের কাছে অনেক মূল্যবান বলে প্রতিভাত হয়েছে—তাই ঘটনাগতির শিথিলতাকে, স্বীকার করেও চসর অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন জীবনের দিকে। তাঁর নায়ক জেনেছিল জীবনের অফুরন্ততাকে।

বিষ্ণু দে-র পক্ষে, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের দেশকালপীড়িত আধুনিক কবির কাছে, জীবনের প্রতি পক্ষপাত ঘোষণা সহজ নয়। সে পথে জিজীবিষায় অটল বন্ধু তখন কোথায় অপরাজেয়? সে যুবা নিশ্চিতভাবেই নিঃসঙ্গ। তাই বিষ্ণু দে-র ক্রেসিডার নায়ক বলে :

> "ভ্রান্তি আমায় নিয়ে যায় যদি বৈতরণীর পার,
> ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেবো উপহার?
> তপ্ত মরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যাণ্ডার?"

হেনরিসনের মধ্যে চসরের কবি-করুণা অবিদ্যমান ছিল একথা এ-শতাব্দীর কবি ভাবেন নি। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ভিখারিণী ক্রেসিডাকে নিয়ে হেনরিসন তাঁর The Testament of Cressied কবিতায় পাপ-প্রায়শ্চিত্তের যে 'থীম'কে মূর্ত করেন, তার মধ্যে অপরাধিনী ক্রেসিডা সম্বন্ধে হেনরিসনের হৃদয়বেদনাই ফুটে উঠেছে। বিষ্ণু দে হেনরিসনকে অতি সামান্য অংশে ব্যবহার করেছেন :

> "বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণ প্লাবনে ভাসে
> পুরজন যত গৃহহীন যত বুভুক্ষু ভিক্ষুক।

হায়েনার হাসি আসে স্মৃতিপটে—বেহিসাবী ক্রেসিডা সে।"

অব্যবহিত পূর্বের স্তবকের বিজয়ী ট্রয়লাসের উল্লেখের পটভূমিতে এই উদ্ধৃত স্তবকটি স্মরণ করিয়ে দেয় হেনরিসনের দীর্ঘ কবিতার এই অংশটি :

"Than upon him scho kest up baith hir Eue,
And with ane blenk it come into his thocht,
That he sumtime hir face befoir had sene."

বিষ্ণু দে তাঁর ট্রয়লাসের জন্য এই অংশটির পরোক্ষ প্রেরণা নিলেও, পরিহার করেছেন হেনরিসনের চসরীয় স্তবকের এই শেষ চার চরণ :

"But scho was in sic plye he knew hir nocht,
Yit than hir luik into his mynd it brocht
The sweit visage and amorous blenking
Of fair Cressied sumtime his awin darling."

এবং এ গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠেছে বিষ্ণু দে-র ট্রয়লাস-কল্পনার স্বাতন্ত্র্য। এমন কি শেকসপীয়রীয় ট্রয়লাস-কল্পনার এই প্রারম্ভিক সোপান মেনে নিয়েও :

"Why should I war without the walls of Troy,
That find such cruel battle here within."

বিষ্ণু দে বর্জন করেছেন এই ইঙ্গিত :

"Each Trojan that is master of his heart
Let him to field ; Troilus, alas ! hath none"

তাঁর প্রতিভাদৃষ্টিতে যে নায়ক মূর্ত হয়েছে, বীরধর্ম, হৃদয়ধর্ম—এক কথায়, মানবধর্মের সর্বাঙ্গীণ চারিত্রে সে বর্মাবৃত। সেই বর্মে প্রতিহত হয়েই ক্রেসিডার প্রেরিত আঘাত খান খান হয়ে যায়। এবং পূর্ণাঙ্গ লোকায়ত জীবনকে ভালোবেসেই বিষ্ণু দে শেকসপীয়রের বিস্তৃত কল্পনায় দাঁড়িয়ে চসরকে আমন্ত্রণ করেন।

চসর যেমন বোক্কাচিয়োর আবরণ ফেলে দিয়েছেন, হেনরিসন যেমন ফেলে দিয়েছেন চসরের বাতাবরণ, শেকসপীয়র যেমন তাঁর দ্বন্দ্বজর্জর নায়ক-কল্পনায় পূর্ববর্তীদের অতিক্রম করলেন, বিষ্ণু দে তেমনি তাঁর পূর্ব-পথিকদের চরিত্র-কল্পনাকে অনুধাবন করেই রচনা করলেন আর-এক ট্রয়লাস। শেকসপীয়রের ট্রয়লাস শেকসপীয়রের হ্যামলেটের মতোই এক অপ্রত্যাশিতের দ্বারা

পীড়িত। পীড়িত এক অনাচারের আঘাতে ও সাক্ষ্যে। বিষ্ণু দে-র নায়ক-কল্পনায় ফুটে উঠেছে একালের জটিলতার মাঝে প্রহত নায়কের জীবন-বিস্ময়—জিগীষা নয়, জিজীবিষা যার নামান্তর। এ ক্রেসিডার নায়ক জানে যে, বস্তুর আকৃতিতেই তার স্বরূপ জ্ঞান হয় না। এবং এও জানে সমগ্র মিলন এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদ যখন অভিজ্ঞতায় একটি মুহূর্তে চূড়ায়িত সে বড়ো কঠিন মুহূর্ত। যে স্বপ্ন লোকোত্তর এবং যে সংগ্রাম লোকায়তিক—তার বৈপরীত্যে ও আলিঙ্গনেই জীবনে বিচিত্রের বন্ধুরতা। এ ট্রয়লাস জানে ব্যক্তিগত সব বিমর্ষতাকে মুক্তি দিতে হবে মহাসমরে। কিন্তু শেকসপীয়রের ট্রয়লাস এক অভিজ্ঞতালব্ধ অনাসক্তিকে অধিগত করেছে, সে জানে গ্রীকপক্ষে ও ট্রোজানপক্ষে মূঢ়ত্বের সমাবেশ ঘটেছে সমান ভাবে। বিষ্ণু দে যে ট্রয়লাসকে কল্পনা করেছেন সে এমন ভাবে নিজ ভূমিকাকে গৌণ করে ফেলতে চায় না :

"উষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা।
হেলেনের বুকে শবসাধনায় বিশ্রাম আর নেই।
আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।"

এখানেও সুধীন্দ্রনাথের অনুমানই মান্য—চসরী জিজীবিষাকেই কবি সবিচার স্বীকৃতি দিলেন। শুধু তাই নয়, শেক্‌সপীয়রের 'ট্রয়লাস'-কাহিনীতে কোনো করণীয়ই শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে না, কোনো বিতর্কেরই সমাধান হয় না। ঘটনা পরিহার এবং পরিহৃত পরামর্শসভার অসম্পূর্ণতায় এ কাহিনী পূর্ণ। কাব্যে অসামঞ্জস্য ছিল না, শেকসপীয়রের হাতে এ হয়ে উঠেছে অসামঞ্জস্যেরই কাব্য—যে অসামঞ্জস্য বৈদগ্ধ্যদীপ্ত, অথচ উদ্দেশ্যহীন, বস্তুভারে পীড়িত মানুষকেই বহন করতে হয় সেই জানিত অসামঞ্জস্যের কাব্য।

বৈদগ্ধ্যের কারণেই বিষ্ণু দে-র নায়কও এক দুরূহ চিন্তাভারে ক্লান্ত। তাই 'ক্রেসিডা'র ভাষা 'ওফেলিয়া'র মতো হার্দ্য নয়। 'ক্রেসিডা'র নায়কের ভাষা হৃদয়ের আবেগের ভাষা নয়, দুঃসমাধেয় চিন্তার ভাষা। যা আমাদের বন্দী করে (ঐ ক্ষণায়ু প্রেম) এবং যা আমাদের মুক্তি দেয় (সংগ্রামময় জীবন) এই দুয়ের মাঝে সংযোগ সূত্র কোথায়—বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা'র নায়ক তাকেই খুঁজেছে আপন চিন্তার গহনে। সে চিন্তা প্রথাসিদ্ধ ব্যর্থ প্রেমিকের পেলব এবং মসৃণ চিন্তা নয় বলেই, আভাঙা সংস্কৃত শব্দ, শ্রোতার অপেক্ষা না রেখেই —স্বগতচিন্তায় শ্রোতার অপেক্ষা কে-ই বা রাখে—আহূত হয়েছে। এই শব্দরাজি সেই চিন্তারই চারিত্রের লক্ষণ। কিন্তু এ সমস্ত জেনেও 'ক্রেসিডা'র

নায়ক কেবল নিরুদ্যোগ চিন্তাকেই বা ভূমিকাহীন বৈদগ্ধ্যকেই জীবনের বিকল্প বলে মনে করে নি। এখানেই সে নায়কের স্বগোচিত স্বাতন্ত্র্য। এ্যাকিলিসের আত্মম্ভরী জিজ্ঞাসার জবাবে জীবনবেত্তা য়ুলিসিসের সেই বিখ্যাত উক্তির ("Time hath, my lord, a wallet at his back wherein he puts alms for oblivion…") জবাব হয় 'ক্রেসিডা'র নায়কের এই চরম স্বীকারোক্তি :

"সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতি কীট কাটে।
প্রাণোপাসনার পূজারী তাই তো তোমার শরণ মাগি।
প্রাণহন্তারা রলরোলে চলে ট্রয়ের মাঠে ও বাটে।"

॥ ৫ ॥

এ নায়ক আপন কাললক্ষণ অস্বীকার করে নি। ট্রয়ে রক্ষিত হেলেন তার শ্রেণীরই উত্থানের দিনের অর্জিত সৌন্দর্যস্বপ্ন। কালেরই নিয়মে সেই শ্রেণীর এবং সেই সৌন্দর্যস্বপ্নের শিয়রে আজ ধ্বংস, কিন্তু সেটা ধ্বংসও হতে পারে, ধ্বংসের ছদ্মবেশে মুক্তিও হতে পারে :

"মহাকাল আজ দক্ষিণ কর প্রসাবে আমারই দিকে
ভীরু দুর্বল মন!
দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মহাসিন্ধুব ডাকে!
সর্বসমর্পণ।"

এই "সর্বসমর্পণ"-এব সঙ্কল্পের মূলে রয়েছে ক্রেসিডার ঘটনা—ব্যক্তিগত জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার সেই বিপর্যয়ের স্মৃতিতে দুর্বার হয়ে ওঠে এই অনুভূতি—"কাল রজনীতে ঝড হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।" এই প্রতিষ্ঠিত কাব্যোক্তি উপস্থাপনাব কৌশলে এবং সুদৃঢ় বিষয়ের ভৌম প্রশ্রয়ে নতুন অর্থে দুলে ওঠে। তখনই তাব "স্বপ্ন গোধূলি" "খর রক্তের কোলাহলে" ডুবে যেতে চেয়েছে। আর এই চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ক্ষণে তার নিজের কাছেই মেঘ-বিস্ফারিত বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠেছে জীবনার্থ—"আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।" এই উজ্জীবনই তার কাম্য।

যে প্রেম শুধু মায়া ছড়ায়, যা শুধুই মুখর, তা ভেঙে যাবার কালে বেদনা ছড়ায় ছড়াক। মুখরতার পরিণামী স্তব্ধতায় সান্ত্বনাহীন হয়ে ওঠে ব্যর্থতার বেদনা। সে বেদনায় তিক্ততার অন্ত নেই—কিন্তু স্মৃতিধর প্রেমের শেষ দান

তা হলেও ফুরোয় না :

"রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে
আজো তো সে ফোটে দেখি—"

ছোট ছোট স্তবকের মধ্যবর্তী শূন্যতায় এই কবিতার নায়কের জীবনের বহু নেপথ্য বৃত্তান্ত অদৃশ্য অথচ ক্রিয়াশীল। উচ্চারিত কথাগুলি সেই ঘটনার দ্বারা লাঞ্ছিত চিন্তার এক এক মুখ—নায়কের দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বের এক এক স্তর। "দুঃস্বপ্নেও প্রেম করোনি এ আশা"—যেমন এই নায়কের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার স্মারক, তেমনি সেই ব্যর্থতার ভগ্নস্তূপ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উজ্জীবনের পালা সূচিত হয়েছে এই অংশে :

"তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে ?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হয়ে গেল খান খান।"

এখানেই বিষ্ণু দে কালোচিত প্রজ্ঞায় শেক্‌সপীয়রের নির্দেশকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর নায়ক abandoned actions-এর নায়ক নয়। সে স্পষ্ট ভাবেই সিদ্ধান্তমুখী। কিন্তু একে আমরা শুধু চসরীয় জিজীবিষা বলেই চিহ্নিত করতে পারি না। তার সিদ্ধান্তের মধ্যে কাজ করছে এ যুগের পুরুষকারদৃপ্ত চিন্তা। সে আর দৈবের হাতে সর্ব সমর্পণের কথা বিপর্যস্ত মুহূর্তেও ভাবতে পারে না। বরঞ্চ এ নায়ক এই যুক্তির পরেই স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করে, "প্রাক্তন-পাশ্চাত্য মাগিনা।" কিন্তু "প্রাক্তন-পাশ্চাত্য"-কেও সে যেমন আর চায় না, তেমনি প্রথাবদ্ধ নিশ্চল, অহৃদয় কর্মচর্যাতেও তার আর সায় নেই—"জড় কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকারে করি নর্মাচার।" এরপর বিস্তৃত জীবনকে অঙ্গীকার করা ছাড়া তার আর অন্য কোনো করণীয় থাকতে পারে না। এ নায়কেরও রইল না।

'ওফেলিয়া'র নায়ক চেয়েছিল শাপান্তক কর্মৈষণা। স্তবরত ওফেলিয়ার দিকে তাকিয়ে শেকসপীয়রের নায়ক বলেছিলেন —"The fair Ophelia—Nymph—in thy orisons/Be all my sins remembered." বিষ্ণু দে-র 'ওফেলিয়া'র নায়ক এই শতাব্দীর যন্ত্রণাতেই নিজের ভূমিকাকে আরো তাৎপর্য দেয় :

"দেবযানী! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে

শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে—এই সাধনা আমার।"

পক্ষান্তরে 'ক্রেসিডা'র নায়ক চেয়েছে জীবনের মধ্যে মুক্তি। সমস্ত শরৎ মাধুরী, বাহুপাশের সকল স্মৃতি থেকে প্রেয়। ওই পুরাতনের তীব্র স্মৃতি আরও পরে আঘাত যে হানতে পারে না তা নয়, তবে তা মুখ্যতঃ তুলনীয় "তরবারি" র সঙ্গেই। তরবারির মতোই তা দীর্ণ করে বটে, কিন্তু তরবারির মতোই তা ছেদকও বটে। যখনই অতীত মোহ নানা ছলায় আবার জড়িয়ে ধরতে চায় তখনই সেই স্মৃতিও তরবারির মতোই ছেদন করবে সেই নাগপাশ।

এবং এই বিষ্ণু দে-র নায়কেরা—'ওফেলিয়া'র হ্যামলেট, 'ক্রেসিডা'র ট্রয়লাস, 'পদধ্বনি'র অর্জুন, 'এলসিনোর'-এর দিনেমার এবং 'তিনটি কান্না'র লিয়র—সাম্প্রতিক ইতিহাসের যন্ত্রণাময় প্রেক্ষাপটেই কাল-লক্ষণে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ পুরাতনকে পুনরাহ্বান নয়—ঐ সব কালোত্তর নায়কদের মধ্যস্থতায় কবি আমাদের শুনিয়েছেন মহাকালের সাম্প্রতিক হৃদস্পন্দনকে—তার পদসংকেতের গূঢ়তাকে।

'ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাসে' কাব্যগ্রন্থে 'কিবা গ্রীস কিবা ট্রয়' কবিতায় ক্ষতলাঞ্ছিত ক্রেসিডাই, ট্রয়লাস নয়, বিষ্ণু দে-র কবিকল্পনায় নতুনভাবে পরিগৃহীত—

ক্রেসিডাও আজ অভাগী প্রতীক দেশের দুঃখ বয়;
কিবা গ্রীস কিবা ট্রয়।

এখানে ক্রেসিডা-প্রতীকের উজ্জীবন ঘটল। এখানে আবার মূল কবিতার বত্রিশ বছর পরে দুর্গত অস্তিত্বের ধারক হিসাবেই ক্রেসিডা-কল্পনায় দেখা গেল পুরানো চিত্রকল্পেরই ভাঙাগড়া—

শিউলি মাড়িয়ে মাড়িয়ে সারাটা বিশ্বে যে তারা চরে।

এখানে নায়িকা স্বগত ভাবনায় স্থিত—বলে—'দোষ অনেকেরই. মানবজন্ম সত্যাসত্যে দায় যে সর্বনেশে।' সত্যাসত্যের দায়কে সর্বনেশে বলে—যখন সামনে লণ্ডভণ্ড রজনীগন্ধা. সোনার চূর্ণ শবাধারে শত দুর্গত ঘরে ঘরে? মূল কবিতায় ট্রয়লাস ছিল বক্তা। তারই অনুভূতিপুঞ্জ সেখানে গতিশীল ছিল। এখানে এই কবিতায় ক্রেসিডাই নায়িকা। সে-ই কথা বলছে—তাই পিতৃব্য পাণ্ডারসকে সে দেখে 'পাকা পার্থিব জ্ঞানে'র অধিকারী একালের ধূর্ত বাণিজ্যিক সফলতা-ভিক্ষুরূপে। সচ্ছলতায় লুব্ধ দাসদাসীদের ভিড়ে ক্রেসিডার বিশ্বজ্ঞানই আলোর মশাল—

বৃথা শিউলির শুচি সাবিত্রী ধ্যান!
অর্থের আর অস্ত্রের কারবারে
হত্যাশিবিরে অন্ধকারের মহিষেরা ওঠে মেতে।

"পদধ্বনি"

কবির অতীত অধ্যয়নের দুই স্তর—এক স্তরে অতীতের আলোয় বর্তমানের পাঠোদ্ধার, আর এক স্তরে বর্তমানের আলোয় অতীতের অনুধাবন। কবিই জানেন ত্রিকালের রহস্য। তাই একালের কল্পনার কেশগুচ্ছে তিনি অতীত প্রহরের ফুলের গুচ্ছ পরিয়ে দেন, তার এক প্রহরের কণ্ঠের উত্তাপে আর এক প্রহরের মুকুলের উন্মোচন। কবির কাছেই কাল অকাল নেই। তিনি শুধু জানেন লগ্নভ্রষ্ট না হলেই হল। মহাভারতের শকুন্তলা-কাহিনী কালিদাসের হাতে, বাইবেলের কাহিনী মিল্টনের হাতে শুধু যে ভাবান্তরিত তাই নয়, অন্য তাৎপর্যে তা অর্জন করেছে নতুন স্তর। দুর্বাসার অভিশাপ কালিদাসের কালের ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের স্মারক। অন্যমনা (কিংবা অনন্যমনা) শকুন্তলা সেই কঠিন সমাজ-কাঠামোয় স্বাধীন ইচ্ছার লাঞ্ছিত নিদর্শন। দুর্বাসার শাপের ঘটনার মাধ্যমে কালিদাস তাঁর কালকে যুক্ত করেছেন পুরোনো কালের গল্পের সঙ্গে। তখনই অতীত হয়ে উঠল অনতীত। আবার বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যায়। একই বিষয়াধার দুই কবির হাতে ব্যঞ্জনায়, বর্ণ বিচ্ছুরণে দুই রূপের বিভা ছড়াল। যেমন, ফাউস্টের গল্প মার্লোর হাতে যা, গ্যেটের হাতে তা নয়। টমাস বেকেটের আত্মদান টেনিসনের হাতে যে রূপ, যে রঙ পেল, এলিয়টের হাতে তা হয়ে উঠল সম্পূর্ণ অন্যভাবের কাব্য। টেনিসনের বেকেটের মৃত্যু একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ নাটকীয় ঘটনা—ট্র্যাজিক আখ্যা যে ঘটনার পক্ষে স্বতঃলব্ধ। কিন্তু এলিয়টের কাছে এ ঘটনা খ্রীষ্টীয় প্রায়শ্চিত্ত—পার্থিব মূল্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মূল্যের দ্বন্দ্বের, আদিভূত পাপবোধের, একান্ত অনিবার্য পরিণাম। টেনিসনের ভিক্টোরীয় জীবনবোধ এলিজাবেথীয় নাট্য-ঐতিহ্যকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করেছে বটে, কিন্তু তাকে পুনর্জীবিত করতে পারে নি। পক্ষান্তরে এলিয়টের কাব্যনাটকে বেকেট চরিত্র-কল্পনা মূর্ত হল বিংশ শতাব্দীর মূল্যাবনমন ও মূল্যাবধারণের সংঘাতের বিগ্রহরূপে। আর কী আশ্চর্য, যে দ্বন্দ্ব এ কাব্যনাটকের প্রাণ সে দ্বন্দ্ব বাইরে না, সে দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রে এবং গীর্জায় না, সে দ্বন্দ্বের রঙ্গভূমি বেকেটেরই মথিত অন্তর। এবং এ জাতীয় উদাহরণ কাব্যের ইতিহাসে নানা সঙ্কেতকে বহন করেছে—নানা ভাবে। হোমারের য়ুলিসিসের যাত্রা দান্তের ইনফার্নোয় উল্লিখিত হয়েছে

দান্তের যাত্রা-কল্পনার নিজস্ব তাৎপর্যে। টেনিসন যখন দান্তের সেই উল্লেখে প্রাণিত হয়ে য়ুলিসিস লিখলেন, তখন তা হয়ে উঠল ভিক্টোরীয় মন্থরতা এমনকি নিথরতা ও তার surface respectability থেকে উত্তরণের অভীপ্সা। এইভাবে কবির হাতে প্রমাণিত হয় এই সত্য যে, ঐতিহ্য শুধু ইতিহাসনিবদ্ধ নয়—তা জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই চলে—অন্ধ মনে চলি পথ, ভুলিনে কি ফুল/ভুলিনে কি তারা/তবুও তাহারা/প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর।

মহাকাব্যের, পুরাণের বা প্রাচীন গাথার সেই সব শক্তিধর চরিত্ররা আধুনিক কবির নব নব জিজ্ঞাসার বন্ধুর ভূমিতে নতুন করে জাত হয়, নতুন করে মরে। হয়তো পুরোনো কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক কঠিন ভূমিতে জাত বলে এঁরা এমনই শক্তিধর যে, কালের হস্তাবলেপ তুচ্ছ করেই এঁরা নতুন প্রশ্নে সাড়া দিতে পারেন, এঁরা মৃত্যুহীন বলেই প্রশ্নের কাছেও এঁরা অমর—প্রশ্নেরাও এঁদের কাছে অফুরন্ত। এমনই একটি চরিত্র বাংলা কাব্যের পটভূমিকায় দিনে দিনে বিশেষ তাৎপর্য পেলেন—ইনি তৃতীয় পাণ্ডব, অর্জুন। অর্জুন, তিনি শুধু কৃষ্ণারই পাণিধর নন—মহাভারতের অধ্যায়ে অধ্যায়ে প্রেম তাঁকে ঘিরে স্তুতির মতো গুঞ্জরিত। লক্ষ্যভেদে সিদ্ধকাম, কুরুক্ষেত্রের নায়ক, বিরাটপুরীতে বৃহন্নলা, কৃষ্ণের বন্ধু, অশ্বমেধে অপ্রতিরুদ্ধ—মহাভারতেও অর্জুনের মতো বর্ণাঢ্য চরিত্র আর নেই। অথচ ঐ কুরুক্ষেত্রেই আমরা দেখলাম একের পর এক প্রতিদ্বন্দ্বীদের পতন হল, আর কেমন অজানতেই যেন স্খলিত হল অর্জুনরূপী অগ্নিবিহঙ্গমের একটি একটি উজ্জ্বলতার পালক। কীর্তি নিয়ে যায় তুঙ্গ থেকে তুঙ্গতর মহিমায়। কিন্তু বিনিময়ে কি নিয়ে আসে ম্লানিমা? পরিশেষে গাণ্ডীবও পরিহার করল গাণ্ডীবীকে। মহাপ্রস্থানের শেষ ব্যর্থতার আগে এ এক 'ব্যর্থ ধনঞ্জয়'। এ পার্থের নানা স্তর যে একালের কবিকুলকে নানাভাবে স্পর্শ করবে এ তো স্বাভাবিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে চক্ষুরুন্মীলনের নতুন দিনে. অর্জুনকে নতুন করে চিনে নেবার একটা তাগিদ অবশ্যই অনুভূত হয়েছে। নবীন সেন, গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদের মহাকাব্যে এবং নাটকে আমরা দেখেছি তৃতীয় পাণ্ডবের পুনঃপ্রবেশ—কিন্তু কাশীরাম দাসের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় নায়কের সেই আত্মপ্রত্যয়ী পদক্ষেপের দৃপ্ততা এ পুনঃপ্রবেশের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। পাওয়া বুঝি সম্ভবও ছিল না। ছিল না যে কেন, সে কথা

বুঝতে গেলে বাঙালীর—বিশেষতঃ একালের বাঙালীর অর্জুন-চেতনার স্বরূপটি সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করতে হয়। অর্জুন একালের বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মসম্বিত এবং আত্মোপলব্ধিকে শুধু যে বিচিত্রভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে তাই নয়—বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্ম-অধ্যয়নের আলোকে অর্জুনের সাফল্য-ব্যর্থতার কথাও পুনর্জীবিত হল। এই আত্ম-অধ্যয়নের গুরুত্ব অনুসারেই একালের বাংলা কাব্যে অর্জুনের রঙফের ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের পর থেকে মধ্যবিত্ত মানসে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বিশেষভাবে। এ যুগের বাঙালির প্রাথমিক পার্থ-কল্পনাতেও সেই কৃষ্ণ-ভাবনারই পরোক্ষ প্রতিবিম্বন। নবীন সেনের অর্জুন অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদের অর্জুন শুধু সেই প্রতিফলিত কিরণের চান্দ্র সমুজ্জ্বলতায় দীপ্ত, তার বেশি কিছু নয়। এ যুগের মধ্যবিত্ত-চেতনা তার সদ্যোজাত উদ্যমের দিনে বিবাদে, প্রতিবাদে, সংঘাতে, সংগ্রামে একজন অথরিটির হাত ধরে চলতে চেয়েছিল। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র বুদ্ধির অহমিকাকে পরিচর্যা করেই এই অথরিটির কাছে বশ্যতার মনোভাবকে লালিত করেছে। এ যুগের তৃতীয় পাণ্ডব তাই কৃষ্ণচালিত, কৃষ্ণনির্দেশিত, কৃষ্ণ-ভাবিত। কৃষ্ণ শুধু অর্জুনের রথেরই চালক নয়—তিনি নায়কেরও অধিনায়ক।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদার অর্জুনই বাংলা সাহিত্যে প্রথম কৃষ্ণবিমুক্ত অর্জুন। এই প্রথম অর্জুন দেখা দিলেন তাঁর ব্যক্তিগত রূপ নিয়ে। অথরিটির এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে যুবক এবার নিজের দিকে তাকাল।

তিরিশের বাংলাদেশে সময়চেতনা ও সমাজচেতনার সাযুজ্যে অর্জুন পুনর্জীবিত হলেন বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি' কবিতায়। 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুন যে পরিমাণে লিরিক্যাল, 'পদধ্বনি' কবিতার অর্জুন সে পরিমাণেই নাট্য-রসান্বিত। অর্জুনের আত্যন্তিক ব্যর্থতার আর্তিতে এই নাতিবৃহৎ কবিতাটির সমগ্রার্থ। স্মৃতির ঐশ্বর্য এবং কালের প্রহারের অনিবার্যতায় যে বৈপরীত্য, তার সহাবস্থান ঘটিয়ে প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় স্বগতোক্তির অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে।১ 'পদধ্বনি'র কবি তার সমুজ্জ্বল সদ্ব্যবহার করেছেন। সমস্ত

১। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি রবীন্দ্রনাথের একটি অলিখিত কাব্যনাট্যের পরিকল্পনার কথা। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ জানাচ্ছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অর্জুনের গাণ্ডীব ধারণে অক্ষমতা, যদু-রমণীদের রক্ষায় ব্যর্থতা-বিষয়ে একটি কাব্য পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। কৃষ্ণ এবং পঞ্চ পাণ্ডবদের ঔদাসীন্যে এবং

মহিমোজ্জ্বলতার চূড়ায় নির্বাপণের প্রাঙ্‌মুহূর্তে অর্জুনের যে মনোলৌল্য, যে মথিত স্মৃতির শিয়রে বর্তমানের অসহায়তা—তাই কবিতাটির থীম্‌। বিষ্ণু দে-র হাতেই এই থীমের আধুনিক পুনর্জীবন ঘটেছে প্রথম। তারপরে এই বিষয়ের দ্বারে কবিরা আরো দু' একবার উপনীত হয়েছেন।

ইতিহাসের চলিষ্ণু দীপশিখার ব্যবহার দুরূহ। এ আলোকরশ্মিকে ব্যবহার করতে হলে চাই বস্তুজ্ঞান এবং আলোকপরিমাণ-বোধ—দুইই। এই দুয়ের সমন্বয় বড়কবির প্রতিভাসাপেক্ষ। 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তার শৈল্পিক সার্থকতায় এবং ব্যত্যয়ে কবির সমকাল, তার সফলতা এবং দুর্বলতা সমেত মূর্ত হয়েছে। 'পদধ্বনি' কবিতায় কবি সময়ের, ইতিহাসের সেই লীলাময় রূপান্তরকে আর এক লগ্নে আবিষ্কার করেছেন নিজেরই ত্রিকাল বিস্তৃত দৃষ্টিতে। এই আবিষ্কারের তীব্র মুহূর্তের প্রেরণাতেই জন্ম নিয়েছে এই কবিতার শব্দ-বিন্যাস, তার গাঠনিক সিদ্ধি। 'পদধ্বনি'র অর্জুন 'চিত্রাঙ্গদা'র অর্জুন নয়। 'চিত্রাঙ্গদা'র অর্জুন কীর্তিমুগ্ধ অর্জুন, কীর্তিমুখী তার কর্মৈষণা। কিন্তু মধ্যবিত্তের স্বর্ণযুগ দেখতে দেখতে লীন হল অস্তসূর্যের রঙরেজিনীর খেলায়। শক্তির অবক্ষয় নয়, শক্তির রূপান্তর, সে রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিতা 'পদধ্বনি' কবিতার বিষয়। দুই শতাব্দীর অর্জুন বাঙালি মধ্যবিত্তের উত্থান ও পতনের দুই বৃত্তের সূচক। সেদিন সেই উনিশশো উনচল্লিশে, যখন নূতন সামাজিক শক্তির অভ্যুদয়কে বাঙালি মনীষা অনিবার্য বলে মনে করেছিলেন, যখন মধ্যবিত্তের একক অহমিকার অনেকখানিই ছিল পতনোন্মুখ, 'পদধ্বনির'-ব অর্জুন সেদিনের সময়বর্তী দ্বন্দ্বাহ্বানকে গ্রহণ করেছে। তার খেদোক্তির পরিমণ্ডলে ছিন্ন স্মৃতির বিলীয়মান স্বর্ণাভা —তার সম্মুখে স্পন্দিত ছিল ইতিহাসের ভবিতব্য।২

আপনাপন কীর্তি মুগ্ধতায় নারীদের প্রতি উপেক্ষা গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত নাটকে সেটাই ছিল মূল সুর। অনার্য দস্যুদের আক্রমণে উপেক্ষিত নারীরা সুখী হল। তারা পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র ভেঙে দিল। এ নাটক অবশ্য লেখা হয় নি। প্রশান্তচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন, 'আমার পাঠকেরা ভয়ানক রেগে যাবে এ নাটকে লেখা হলে'। Rabindranath Tagore/Prasanta Chandra Mahalanabis/Samvadadhavam/ P. C. Mahalanobis Memorial Volume.

২। আমাদের কাছে এ তথ্য নিরর্থক নয় যে পদধ্বনি যখন লেখা হয়েছে,

'পদধ্বনি' কবিতায় 'স্মৃতি' তাই পুনরাবৃত্ত শব্দ। 'মন্থিত স্মৃতির রাজ্যে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম', 'স্মৃতির বাসর', 'স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী', দন্তুর ভয়াল/প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির, করাল অতীত নিয়ে, আমার অতীতে', 'স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসর বিনোদনে লোটে', 'স্মৃতি তার কদম্ব ছায়ায়'—অর্জুনের পুরাণ-পোষিত, তথা উনিশশো উনচল্লিশের মধ্যবিত্ত নায়কের ইতিহাস সমর্থিত কীর্তির প্রসঙ্গসূচক এই শব্দপুঞ্জ। কিন্তু মহাভারতকার জানেন—ইতিহাসবেত্তা কবিও জানেন সব কীর্তির ক্ষয় আছে তাই কুরুক্ষেত্রের জয়-মহিমাকে স্মৃতিতে লগ্ন রেখে দস্যুদের সমাসন্ন পদধ্বনির সামনে শেষ আত্মনির্বাপণ—'চোখে তার কুরুক্ষেত্র কানে তার মত্ত পদধ্বনি'। সেই স্মৃতি এই লগ্নে এত মূল্যবান বলেই সুভদ্রা-সম্ভাষণ এই কবিতায় এত তাৎপর্যময়। সুভদ্রাহরণ এক হিসাবে পুরাণোক্ত অর্জুনের সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত জয় এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধির কাহিনী। সুভদ্রাই অর্জুনের স্বাধীন পদক্ষেপকে একদা আকর্ষণ করেছিল। তাই সুভদ্রা বীরজননী। তাই স্বাভাবিক সুভদ্রা-সম্বোধন। এ মধ্যবিত্তও কি একদা সামন্তযুগীয় বন্ধন ছিঁড়ে এমনি করেই তার ব্যক্তিক চরিতার্থতাকে ত্বরান্বিত করেনি? আজ কালান্তরের লোহিত লগ্নে, ক্ষমতা হস্তান্তরের করুণ গোধূলিতে সেই স্মৃতিই কি তাকে বিষণ্ণ করে তুলছে না? করে তুলছে না দ্বন্দ্বময়? পদধ্বনির পরিসমাপ্তিতে পার্থের সেই দ্বন্দ্বময় আর্তি কবির আধুনিক কল্পনার দান। মোহ এবং মনীষা, অহমিকা এবং ভবিষ্যৎ-বোধ দুয়ের মিশ্রণে কবির সৃষ্ট নায়ক যেমন তাকিয়ে আছে তার ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তির দিকে, তেমনি তার দৃষ্টি ন্যস্ত রয়েছে ভাবীকালে। সেই মনীষাই ইঙ্গিত তুলছে—'একি নব অবতার? এ কি যুগান্তর?' আবার পরক্ষণেই সেই মোহই সংশয়ের আবছায়া সৃষ্টি করেছে—'দস্যুদল উদ্ধত বর্বর'। মনীষা সেই দস্যুদলের প্রাণৈশ্বর্যের প্রতি অচেতনভাবে প্রশংসমান। পার্থের ব্যর্থতার মধ্যে 'পদধ্বনি'-র কবি ট্রাজেডির কারুণ্য এবং নিয়তিসম্ভ্রমকে সঞ্চারিত করতে চাননি। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের বিপর্যয়ক্ষণে একক মহিমার গিরিচূড়ার বৈকল্য যেমন এক হিসাবে আরও শক্তিমান এক প্রাকৃতিক সত্তাকে স্বীকৃতি-দান, অর্জুনও তেমনি এই নবপর্যায়ের 'আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত

তখনকার ঘটনা হল ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েট প্রবেশ—মানের হাইম দুর্গপ্রাচীর-ঘটনা। "একটানাই লেখা। অর্জুনকে উল্টিয়ে।"—বিষ্ণু দে-র চিঠি।

ভবিষ্যে নির্ভর' দস্যুদলের আবির্ভাব-মুহূর্তে হতবীর্য। সেই আবির্ভাবের প্রকারান্তর sublimity অর্জুনের ব্যক্তিগত ব্যর্থতাকে গৌণ করে দিয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, পুরাণ-প্রসঙ্গের ব্যবহারে আধুনিক কবি আসলে নিজের সমকালের জটিল চ্যালেঞ্জকেই গ্রহণ করেন। ইতিহাসের উৎক্রান্তির উত্তেজ, তার সন্ধিলগ্নের উদ্বেজন পুরাণ-প্রসঙ্গের ভিতর দিয়ে কালোত্তরণের ইঙ্গিত পায়। সে উদ্বেগ এবং উত্তেজনার ছন্দ এবং লয়, সকল যুগে সমপ্রকৃতির নয়। 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুনের স্বগতোক্তিকল্প-ভাষণে এবং "পদধ্বনি"-র অর্জুনের সুভদ্রা-সম্ভাষণে তাই এত প্রভেদ। 'চিত্রাঙ্গদা'-র অর্জুন বাঙালি মধ্যবিত্তের সেই সময়ের পটে ধৃত, যে সময়পটে মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠা ছিল নিঃসংশয়। তার প্রেম যে সংশয়াকুল হয়ে উঠল, সেও প্রতিষ্ঠাকে সংশয়াতীত বলে জেনেই। তাই "চিত্রাঙ্গদা"র অর্জুনের মধ্যে অশান্ত যন্ত্রণা নেই, নেই চঞ্চলতা. কিন্তু 'পদধ্বনি'-র অর্জুন জিজ্ঞাসাচঞ্চল। তার দেউলিয়া দেবতা আজ নেপথ্যে নিক্রান্ত। অর্জুনের সঙ্কট তার প্রতিষ্ঠারই সঙ্কট। মধ্যবিত্তের নায়কত্বের পতনের কাল সেটা। কাজেই অর্জুনের বার্ধক্য সেখানে স্মৃতিকে আকর্ষণ করেছে বারে বারে। স্মৃতির দীর্ঘ ছায়ায় অর্জুনেরই দীর্ঘতর অতীত-কীর্তির আত্মাবলোকন। ব্যর্থতার বোধ সেই স্মৃতির পটকে উজ্জ্বল করে তুলছে। অথচ এ ব্যর্থতার বোধ পার্থকে অভিভূত করেনি। তার মনীষাই তাকে ইতিহাসের দুরূহ পাঠে সমাধান এনে দিয়েছে। 'পদধ্বনি'-র পার্থ যে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছে, তা সুভদ্রার কাছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের ব্যাখ্যাছল মাত্র।

"এনসিনোরে" ও "জল দাও"

দীর্ঘ কবিতায় আধুনিক কবি সিদ্ধি অর্জন করেন বহু বিপরীতের পরস্পর প্রতিঘাত ও ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশজনিত এক ঐকরস সৃষ্টির মাধ্যমে। এই জটিলতা যখন এত দুর্মোচনীয় ছিল না, যখন অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা ছিল প্রধানতঃ দ্বৈত সঙ্গীতের মতো দুই সহযোগী, তখন দীর্ঘকবিতা প্রায়শঃই ছিল কাহিনী-নির্ভর। কোলরিজের প্রাচীন নাবিকদের গান সেই অর্থেই পুরাতনী দীর্ঘ কবিতা নয়, যে অর্থে সেখানে কবিকল্পনা 'একাধিকের ঐক্য' রচনা সম্ভব করেছে। কোলরিজের 'রাইম অফ দি এন্‌শ্যেন্ট ম্যারিনার' কতখানি প্রতীকী কবিতা সে, সম্বন্ধে যদিও বিতর্কের সূচনা করা চলে, এবিষয়ে তো কোনো সন্দেহই নেই যে এই কবিতায় চিত্রকল্পগুলি ক্রমশঃই ব্যাপকতর অনুষঙ্গ সৃজনের মাধ্যমে সমৃদ্ধতর হয়েছে—কবিতার সূর্য এবং চন্দ্র, অপরাধ এবং প্রায়শ্চিত্ত, ন্যায় এবং অন্যায় সংক্রান্ত সাবয়ব কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আমাদের অবশ্য এর পরে মনে হয় যে, অতঃপর একে প্রতীকী বলতে বাধা কী? কেননা চিত্রকল্পগুলি অনুষঙ্গের পরিধি বাড়াতে বাড়াতে এক সময় স্বাধীনতা পেতে চলেছে। তখনই এ কবিতার সূর্যের মতোই অনেক কিছুই হয়ে উঠেছে প্রতীক। অথচ এ যদি প্রতীকী না হত, তা হলে Angel's headকে পরিবর্তিত করে god's own head লেখার কোনো প্রয়োজনই হত না। ক্রান্তীয় সূর্যের প্রথম প্রকাশে যে গৌরবী সমুজ্জ্বলতা তা অচিরে হারিয়ে যায়, সে সূর্যই হয়ে ওঠে অপ্রিয় এবং অশুভ। ক্রান্তীয় সূর্যের এই দ্বৈত রূপ প্রাকৃতিক সত্য—এই সত্যের দ্রষ্টাদের কাছেই তা দ্ব্যর্থক।

এই অংশেই আধুনিক কবির জগতের সঙ্গে কোলরিজের জগতের ব্যবধান। কোলরিজের নাবিকেরা নৈতিক সঙ্কটে দ্বন্দ্ব দীর্ণ। কিন্তু যে বিশ্ব তাদের অস্তিত্বের ধারক, সে বিশ্বের সকল কিছুই যথাস্থানে যথাদত্ত ভূমিকা পালন করছে। পক্ষান্তরে আধুনিক কবির জগৎ নানা বৈপরীত্যে, নানা অসঙ্গতিতে বাদীবিবাদীর লীলায় দুরূহ। সেখানে দীর্ঘ কবিতায় যে তৃতীয় স্বর শ্রুতিগোচর, সে তৃতীয় স্বর ঐ জটিলতার মধ্যবর্তী দ্রষ্টা—তারই অভিঘাত বা impactএর বাহক-কণ্ঠস্বর ঐ তৃতীয় স্বর।

জীবনানন্দ চেয়েছেন অবগাঢ় হতে। বিষ্ণু দে হতে চেয়েছেন অবহিত। প্রতীকী কবি, প্রসঙ্গতঃ আমরা ইয়েটস-এর কথা বলতে পারি, তাঁর চিত্রকল্প-গুলিকে ব্যবহার করেন উর্ধ্বপ্রয়াণের সোপান হিসাবে। আধুনিক কবি চিত্রকল্পকে ব্যবহার করেন তাঁর প্রাত্যহিকের প্রতি মুহূর্তের গূঢ় ও সজাগ সচেতনতার প্রতিচিত্ররূপে। বাংলা কাব্য সাহিত্যে বিষ্ণু দে অনন্যসাধারণ সচেতনার অধিকারী বলেই তিনি এ-যুগের প্রধান আধুনিক কবি। কালের সাম্প্রতিক ছন্দে ধৃত দেশ এবং বিশ্বে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন ঘাতে-প্রতিঘাতে, সহযোগে এবং দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানবিক চিদাকাশকে। সেখানে প্রতিটি অদ্যতনী অতীত এবং আগামীর ঊষা-রজনীতে নিত্যস্নায়ী। ঐতিহ্য-প্রাণিত এই কবির চিন্তা শুধু বৌদ্ধিক স্তরেই আবদ্ধ নয়। চিন্তা তাঁর কাছে অভিজ্ঞতা। হেনা চামেলি, শাদা বেলফুল বা গোলাপের মতোই চিন্তা তাঁর কাছে প্রত্যক্ষভাবে সংবেদ্য। অবগাঢ় হলেই মুক্তি মেলে, কিন্তু অবহিত হলে না-জানানো পর্যন্ত মুক্তি নেই। অবহিত হলে ভাষা দিতে হবে, অভিব্যক্তি দিতে হবে সময়ের সুতীক্ষ্ণ আবেগকে। বিষ্ণু দের চিত্রকল্প সেই প্রগাঢ় অবধানতার চিত্রকল্প।

বিষ্ণু দের 'অন্বিষ্ট'-অধ্যায়ের কবিতাগুলির দুটি প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিতা 'এলসিনোরে' এবং 'জল দাও' বর্তমান আলোচনার বিষয়। অন্বিষ্ট-অধ্যায়ে কবি সময়ের মর্মগত ভাষাকে কাব্যভাত করতে চেয়েছেন। এই পর্বের কবিতাগুলিতে যে সব চিত্রকল্প এবং কাব্যপ্রসঙ্গের ব্যবহার ঘটেছে তারা ঐ সময়ের ভাবরূপ গড়ে তুলেছে, গড়ে তুলেছে তার বস্তুরূপ। কবি-ব্যবহৃত কাব্যপ্রসঙ্গগুলি এই—

(১) সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত
(২) শ্রাবণ-আশ্বিন
(৩) চামেলি হেনা গোলাপ শাদা বেলফুল
(৪) দগ্ধদিন
(৫) বাহু
(৬) নরক>দুর্গন্ধ>দুঃসহ>কুম্ভীপাক>স্বর্গহীন লুসিফর
(৭) পথ চলা, ঘরে ফেরা বা নীড়ের প্রসঙ্গ
(৮) নদী>বান>সমুদ্র
(৯) সঙ্গীত
(১০) বিপরীত বর্ণ সমাবেশ কল্পনা।

অরিষ্ট-অধ্যায়ের প্রায় সব কবিতায় কমবেশী ব্যবহৃত এই প্রসঙ্গপুঞ্জ কবির বিস্তৃত অবধানতার, তাঁর গভীরতম বোদিতার রূপকল্প হিসাবে দেখা দিয়েছে। 'সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত' সময়ের নিরবচ্ছিন্নতার স্মারক। 'শ্রাবণ-আশ্বিন' কালের অনিবার্য পরিবর্তমানতার সাক্ষ্য। চামেলি, হেনা, গোলাপ, বেলফুল সময় প্রহারিত জর্জর অস্তিত্বের মাঝে সহসা-প্রত্যক্ষ এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত?

আমার চামেলি আকাশে আঁধারে গোলাপ বন কে হানল?
কার গানে জাগে ঘুম ভাঙানিয়া বন শিউলির গন্ধ?
—(প্রতীক্ষা)

অথবা

কর্মের সম্বিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল।—('জল দাও')

ফুল এখানে দ্বন্দ্বোত্তর উপলব্ধির প্রতীক। সেই শক্তিকে উপলব্ধি, যে শক্তি আঁধারের বুকে ফুটিয়ে তোলে রক্ত উষা, যে শক্তি সবলে অধিকার করে ক্লান্ত জীবনের সমস্ত ম্রিয়মানতা, তা-ই—এই ফুল>গন্ধ প্রসঙ্গে রূপান্বিত হয়েছে। নাট্যরসাশ্রিত এই প্রয়োগে ফুল বা গন্ধ এক নতুন তাৎপর্য পেল। জীবন-সচেতনতাব একটা একটা পর্যায়ের সহসা সঞ্চারণ এই ফুলের প্রতীকে আভাসিত হল। চিন্তা সেখানে এমনই প্রত্যক্ষ যে ইন্দ্রিয়ের সীমাগুলিও মিলে মিশে যায়—

গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজ—('জল দাও')

প্রসঙ্গতঃ এখানে এবং অন্য নানা ক্ষেত্রে কবি যে সঙ্গীতের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, তারা শুধু সঙ্গীতের অনুষঙ্গ নয়, বরং সঙ্গীত যে vital import-এর তাৎপর্য বহন করে এ তারই স্মারক—

এ কে গান করে! আহা শোনো শোনো এ কী
অশরীরী প্রাণদান!
আকাশে এ কার পাখা ঝিকিমিকি
নীল নাস্তিক আখরে ভরাট তান
উপল স্রোতের এই আঁকা-বাঁকা, এই বুঝি ঋজু
তুষার চূড়ায় স্বচ্ছ হাওয়ায় কৈলাস নির্মাণ। ('এক জলসায়')

তদুপরি "গন্ধের আলাপে তার বাজে…" এই অংশে ইন্দ্রিয়ের সীমানাগুলি মিলে মিশে গেছে। সচেতন অস্তিত্বের রূপকল্প রচনায় এও এক কবিপন্থা।

রুদ্ধশ্বাস বিবর্ণ অস্তিত্বের ছায়া পড়েছে দগ্ধদিনের চিত্রে ও চরিত্রে। এই সূত্রেই উচ্চারিত হয়েছে নরকের অসহতার কথা। 'নরক' নিঃসন্দেহে সময়ের তদানীন্তন বিকলতায় ক্লিষ্ট দুরবস্থার সূচক। কতবার 'নরক' প্রসঙ্গ উচ্চারিত রয়েছে দেখা যাক :—

(ক) নরকে আমারও যাত্রা…

(খ) নরকের পরে এ রচনা…

(গ) পিছনে নরক যাত্রা

(ঘ) আগুনে তুষারে নরকের শাদায় কালোয়…

(ঙ) আদিম গ্লানির কঠিন কুম্ভীপাক…

(চ) দাঁতে নরকে এ জীবন লেলিহান…

(ছ) নরকে দিয়ো না বলি…

এই নরক-বোধের মূলে যে সময়-চেতনা তা সর্বাংশে তুলনীয় নয় হ্যামলেটীয় খেদোক্তির (Time is out of joint :—O cursed spite/That ever I was born to set it right.) সঙ্গে, কিন্তু সেই সময়ের অবৈকল্য-সন্ধানী উদ্‌গ্রীব নায়ককেই সর্বাগ্রে মনে পড়ে এই নরক বোধের প্রসঙ্গে।

তখনই তাৎপর্যে দুলে ওঠে "বাহু" :—

(ক) আজ শুধু রাখি তোমাকে দু বাহু ঘিরে…

(খ) তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে…

(গ) মুক্তি দাও বৃত্তে বৃত্তে তোমার বাহুতে…

(ঘ) আমরা বেঁধেছি ঐ নীলাকাশ বাহুর বন্ধনে…

(ঙ) তোমার বাহুর পটভূমি গ্রীক ফাঁসিকাঠ…

(চ) মিলুক ধান ও বাহু ‥

(ছ) নবীন তোমার দু বাহু আমারই পিয়াল গাছের শাখা

অন্বিষ্ট-অধ্যায়ে বাহু শুধু প্রেমের আবেগের ধারক অথবা আশ্রয় নয়—বাহু মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের কর্মিষ্ঠ আততির প্রতীকও বটে। এবং এই সব মেলালেই হৃদয়াভিরাম হয়ে ওঠে বিষ্ণু দে-র বিকাশশীলতা, তাঁর সমগ্র চেতনা। 'অন্বিষ্ট'-অধ্যায়েরই কোনো কোনো অংশে কবির বর্ণ-চেতনাও

আধুনিক চিত্রীর মতোই সীমাহীন বাস্তবের অশেষ বার্তার দিকে ইঙ্গিত করে :—

সন্ধ্যা সোনালি বয়ে আনে নদী
সাগরের স্রোতে দক্ষিণ হতে শাদা ঝাঁকে ঝাঁকে
ফিরোজা আকাশে কষায়িত মেঘে সুনীল আকাশে
চংক্রমণের তুরঙ্গ পাকে উত্তরঙ্গ পাতি
একঝাঁক আলো, আলো করে গান—(এক জলসায়)

মানবিক জীবনের ত্রিকাল-প্রাণিত চেতনাই প্রগাঢ় হতে হতে রচিত হয়েছে 'এলসিনোরে'—রচিত হয়েছে 'জল দাও'। 'এলসিনোরে কবিতায় 'অন্বিষ্ট' অধ্যায়ের প্রধান চিত্রকল্প ও কাব্য প্রসঙ্গগুলি যথা—'বৈশাখ>শীতল বন্যা', 'সারেঙীর গান', 'নরক>দুর্গন্ধ', 'বাহু', 'আষাঢ়', 'ফুল — সবই সংহত হয়েছে কবির সময়-চেতনা ও জীবন-চেতনার বিস্তৃত পটে। বিষ্ণু দের কবিতায়, 'ওফেলিয়া'য় প্রথম এবং কতদিন বাদে 'এলসিনোরে' দ্বিতীয় বার সময়স্পৃষ্ট চেতনা কথা বলতে চেয়েছে হ্যামলেটের আবরণে। 'ওফেলিয়া' কবিতায় তিরিশের কবি দেখিয়েছিলেন যে, দৈনান্দনের জীবযাত্রায় অকৃতার্থতার প্রবেশাধিকার দুষ্প্রতিরোধ্য হলেও, সেই সময়ের মধ্যবিত্ত নায়ক যে প্রাণদা শক্তিকে ওফেলিয়া বলতে চায় তার কাছে প্রার্থনার মধ্যেই রয়েছে জীবনের দ্বান্দ্বিক অস্তিত্বের অনুভূতি :—

মুক্তি-ইশারা নয়নে তোমার দূরবিহঙ্গ নভোবিহার,
শান্তি তুষার মুঠিতে তোমার, ছড়াও বারেক বৃষ্টিধারে।
হৃদয় ওড়াও আকাশে, জীবন হোক তুষার ॥

(ওফেলিয়া)

'এলসিনোরে' কবিতায়ও উদ্দিষ্ট ওফেলিয়া—কিন্তু কবিতার নাম এই কারণে 'এলসিনোরে', যে এখানে সময়ের সেই বিকলতার চেতনা আরো তীব্রতা পেয়েছে। এলসিনোরের অভিজ্ঞতা থেকেই হ্যামলেট এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—

Hamlet—Denmark's a prison
Ros—Then is the world one.
Hamlet—A goodly one ; in which there are
many confines, wards and dungeons,
Denmark being one of the worst.

হ্যামলেট আরো জেনেছিলেন···This goodly frame, the earth, seems to me a sterile promontory ; this most excellent canopy, the air, look you, this brave o'erhanging firmament, the mages tical roof fretted with golden fire,—why, it appears no other thing to me than a foul and pestilent congregation of vapours.

—অন্বিষ্ট অধ্যায়ে 'এলসিনোরে'র হ্যামলেট, অনাচার-জর্জর সময়ের-দিকে তাকিয়ে, জর্জরিত হতে হতে বলে ওঠেন -

এখানে যখন প্রসাদ ওখানে প্রতিবেশী উপবাসী
ওদিকে আকাশ মুক্ত অথচ এলসিনোর তো কারা
দানেমার্কের রাজাসনে লাগে ঘুণ
হাওয়ায় কলুষ লুব্ধ পাপের খুন ।—

অথচ একালের হ্যামলেট ছদ্মবেশের সুযোগেও একথা বলতে পারে না man delights not me, তাই এই স্তবকটি পূর্ণতা পায় এই চরণে :—

তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস ।

প্রকৃতির পরিপূর্ণতা ও মানুষের ভগ্নাংশিকতায় যে বৈপরীত্য শেক্‌স্‌পীয়রের নায়ক তাকে দেখিয়ে দেন নির্ভুলভাবে । বিষ্ণু দে হ্যামলেটের মধ্যস্থতায় 'অথচ' অব্যয়ের প্রয়োগে সেই বৈপরীত্যের মধ্যে উজ্জীবনকে ডাক দেবার প্রেরণা পান । Foul and pestilent congregation of vapour 'এলসিনোরে'ও স্বীকৃত এই সব উক্তিপুঞ্জে "কূটচক্রের অন্ধ আঁধারে", "এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে", "মৃত্যুর পূতি" । কিন্তু এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে ছদ্মবেশ মোচনের তথা নিষ্কর্ম অবসাদ ভেঙে ফেলার আবেগ । যে চেতনায় লব্ধপ্রজ্ঞ হ্যামলেট বলেছিলেন—

The readiness is all.

—তা থেকে ভিন্ন এক চেতনায়, অন্যতর জীবনার্থে বিষ্ণু দে বলেন :—

হাওয়ায় হাওয়ায় হাতে হাতে নীড় দাও
দ্বন্দ্ব মুখর অবসাদ ছিঁড়ে নাও
মুখে এনে দাও প্রস্তুতি ঘন ভাষা ।

'নরক' 'দুর্গন্ধ' 'মৃত্যুর পূতি' 'প্রেতলোক' প্রভৃতির মধ্যে উজ্জীবক ফুলের আশ্বাস অন্ধকারের বিপরীতে সূর্যোদয়ের মতো :—

সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল
কিম্বা কালের বাগানে আমার ঘুম ভাঙানিয়া মালিনী,
ঘোচাও আমার অধীর ছদ্মবেশ॥

ওফেলিয়া তথা জীবনই এখানে প্রেম, এখানে উজ্জীবক। সেই উজ্জীবক জীবনই গ্রথিত হয়েছে তাঁর চেতনায়, গাঢ় করেছে তাঁর বোধিতাকে।

হ্যামলেটের মৌল ট্র্যাজিক সত্তার আলোকেই আমরা কবি বিষ্ণু দের আপন মুখপাত্র-নির্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। সে প্রসঙ্গে লক্ষণীয় কবিতার 'দিনেমার' শব্দটি। 'দানেমার্কের রাজপুত্র' অপেক্ষা 'দিনেমার' শব্দটি তাৎপর্যসূচক। দানেমার্কের একজন অপাপবিদ্ধ মনস্বী নাগরিক হিসাবেই শেকস্‌পীয়রের নায়ক জেনেছিলেন যে, সে রাষ্ট্রের দুষ্ট ক্ষতকে অস্ত্রোপচারে দূরীভূত করার দায়িত্ব তাঁরই। এ দায়িত্ব তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না, একজন সচেতন সামাজিকের মতই পারেন না। এ নায়কেরও স্বভাব-জগতে এবং পরিবেশে ঘটেছে দারুণ বিপর্যয়, তত্রাচ সেই বিপর্যয়ের মধ্যে হ্যামলেটের মতই (His nomal world has been upset, but some enlightenment has dawned···) তাঁরও চেতনায় এক নব প্রত্যূষ সমাসন্ন হয়েছে। 'এলসিনোরে' কবিতার শেষতম স্তবকের 'সূর্যোদয়' তার ইঙ্গিত। এ কবিতার যে-'দীপাধারে' এ জীবন শিখা জ্বলে উঠল, তাও কবি বিষ্ণু দের নিজস্ব রচনা। ই. এম. ডবলিউ টিলিয়ার্ড তাঁর Shakespeare's Problem plays-নামক আলোচনায় এই সূত্রেই বলেন :— And when Hamlet curses the spite by which he was born to be the victim and the cure, we thrill because it might be any of us. এইখানেই 'হ্যামলেটে'র সঙ্গে আধুনিক সময়-তাড়িত ব্যক্তি-পাত্রের অভেদকল্পনার আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভ মাত্র, আর কিছু নয়। কেননা আমাদের এও জানা আছে যে, 'হ্যামলেট'-নাটকে ম্যাকবেথের মতো সামাজিক অথবা রাজনৈতিক তাৎপর্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাতে কী যায় আসে? হ্যামলেটের সমস্যা ব্যক্তির দায়িত্ব-সম্ভূত উদ্বেগের ফল। তিনি তো দায়ী ছিলেন না তাঁর মাতার ব্যভিচারী পুনর্বিবাহের জন্য। তাঁর পিতৃব্যের অনাচারেও তো তাঁর প্রশ্রয় ছিল না। তবুও তাঁকেই বহন করতে হবে সব অনাচারের যন্ত্রণা। এ যুগের শুদ্ধচিত্ত নায়কও একথা জানেন যে, জর্জরতা এবং অনাচার তাঁর সৃষ্ট নয়। কিন্তু এর দায় তাকে বহন করতে

হবেই। এই অনাচারকে লক্ষ্য করেই সক্রিয় হবার জন্ত তাঁর উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা। যে উদ্বাস্তুতা আধুনিক মানসতার একটা অমোচনীয় লক্ষণ তাও এই ব্যাকুলতাকে দিয়েছে তীব্রতা :—

তোমার হৃদয়ে ঘরভাঙা পাক ঠাঁই
তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই
বটের ছায়ায় চৈতালী নিশ্বাস। (এলসিনোরে)

এই অনুভূতি 'অম্বিষ্ট' পর্যায়ের অন্ত কবিতাগুলিতেও রেখায়িত, যথা 'দিনান্ত' কবিতার বিভিন্ন আলাপ, অথবা এই অধ্যায়েরই আরো কোনো কোনো কবিতার পথ ও প্রত্যাবর্তনের আবেগ। আর এক পর্বে 'ওফেলিয়া'-কবিতার এ অংশ স্মরণে আসে :—

তুমি যেন এক পরদায় ঢাকা বাড়ি
আমি অঘ্রাণ শিশির-সিক্ত হাওয়া—
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ফিরে—(ওফেলিয়া)

এবং এই উদ্বাস্তুতার উদ্বেগ বুকে নিয়েই এ যুগের নায়ক তার অম্বিষ্ট প্রেমকেই জানে প্রেমের থেকেও মহত্তর—"আমি যে তোমাকে ভালবাসি সে কি তাই শুধু ওফেলিয়া? অথবা 'তুমি সখী, বধূ মাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি'।

এবং এই ভাবঘনতা 'এলসিনোরে' কবিতায় এনে দিয়েছে সংহত গঠন। ছোট ছোট স্তবক একদিকে মনে করিয়ে দেয় সেই দিনেমারের "wild and whirling words", অন্যদিকে এ যেন আজকের চরিত্রপাত্রের আত্যন্তিক বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে মুক্তির প্রাণপণ প্রয়াসে এক ক্ষীপ্র অথচ দীপ্র ভঙ্গি। অনেকগুলি স্তবক পেরিয়ে শেষতম স্তবকে পৌঁছলে পাঠকের মনে এক মহাকাব্যিক প্রশান্তি স্থির হয়ে ওঠে। এবং এই অসম স্তবক পরম্পরা এক অলক্ষ পরিকল্পনায় ধৃত। সমগ্র কবিতাটিতে তিনটি তরঙ্গ—'এ কী বৈশাখী সারাদিন আজ ধারা' এখান থেকে 'শপথ জানাই আমি তো জানাই শপথ'-পর্যন্ত প্রথম তরঙ্গ। সময়ের বিকলতা সম্বন্ধে অবধানতা এর মূল সুর। 'পিতৃপুরুষ আমিই বইব জীবনের দায়ভাগে —এই অংশ থেকে 'কে বাপ কে ভাই জীবনের দাবী ধুয়ে দেয় যারা পদলেহী চাটুকারে'-পর্যন্ত দ্বিতীয় তরঙ্গ। এই অংশে.এ চরিত্রপাত্রের আধুনিক জিজীবিষা হয়ে উঠেছে আবেগকম্প্র। "তুমি জয়গান আষাঢ়ের গান মেঘে মেঘে একাকার' এই চরণ থেকে 'ঘোচাও

আমার অধীর ছদ্মবেশ'-পর্যন্ত তৃতীয় তরঙ্গ। এই চরিত্রপাত্র জীবনের টানেই অতঃপর নেমে পড়তে চায় কর্মের স্রোতে। সেখানে সে নতুন কালের নায়ক।

ছন্দে ছয় মাত্রার ধ্বনিপ্রধান চাল হ্রস্ব দীর্ঘ ঢেউ জাগিয়েছে। তা কবি-কল্পনার স্বভাবেই হয়ে উঠেছে চরিত্রটির ভাবনার হ্রস্ব দীর্ঘ ঢেউ। স্বাধীন বাক্যাংশর দিকে দৃষ্টি রাখলে আবৃত্তিকারক জানতে পারেন যে 'চিন্তা আমার গুহাহিত', বা 'উদ্দেশ/রাজার পায় না', বা 'হত্যারকের হাতে/অথবা চিন্তা' প্রভৃতি অংশে বাগ্‌ভঙ্গি কথ্য গদ্যরীতির অনুগামী। কিন্তু সে গদ্যগত বাস্তবতার মাঝে, তার ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে কবিতার উন্নীত ভাষা :

—এদিকে হৃদয় হৃদয় আমার মাতে
পাহাড়ে সাগরে রাজপথে পথে দুর্গের দৃঢ় ছাতে।
হোরেশিও শুধু চেনে ছদ্মবেশ।

এবং এই দুই প্রান্তের দিকে কবির দৃষ্টি অপক্ষপাতী বলেই তাঁর কবিতা শুধু ভাষার সঙ্গীত নয়, ভাষ্যের সঙ্গীতও বটে। বাগর্থের যে মিলিত সঙ্গীত এখানে গুঞ্জরিত হতে হতে মুক্ত কণ্ঠ, তার পরিচয় আমাদের কথিত তৃতীয় তরঙ্গের সর্বত্র। সেখানেও 'উদ্বায়ু সন্ত্রাসে' বা 'প্রস্তুতি ঘন ভাষা' পূর্বগামী এবং অনুগামী ভাষাদের মাঝখানে থেকে এক অপরূপ অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করে। তা-ই এই কবিতার সঙ্গীত।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম শতকের পঞ্চম দশকের শেষে 'জল দাও' কবিতাটি লিখিত। সময়ের এই বিশিষ্ট পটভূমি কবিতটিতে ব্যবহৃত। যে-ব্যক্তিপাত্র কবিতাটিতে কথা বলেছে তার চারিত্রের কারণে কবিতাটি সময়সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে চিরকালের বাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তর, এই এক সাময়িক ভাব থেকে শাশ্বতকে নিষ্কাশিত ক'রে নেওয়ার জন্য কবির অনেক কবিতাই শিল্পধন্য ; কিন্তু 'জল দাও' কবিতাটি বিশেষ মূল্য অর্জন করেছে, এই কবিতার যিনি নায়ক তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য। বস্তুচেতনা ও চরিত্রপাত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধপাতের ভিতর দিয়েই দীর্ঘ কবিতার রসসিদ্ধি ঘটে। সেই অংশে দীর্ঘ কবিতার নিজস্ব আধারে মহাকাব্যের তন্ময় বৈশিষ্ট্যের দৃঢ় শৈলীর আভাস পাওয়া যায়। 'জল দাও' সেইগুণবত্তায় সম্পন্ন। দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক হঠবাদ, আত্যন্তিক শোচনীয়তা এবং এক সার্বত্রিক হতাশার ভিতর দিয়ে একটি বিশুদ্ধির দিকে অবিরাম যাত্রার প্রেরণা এই কবিতার

বিষয়। ব্যক্তিপাত্রটির চিৎমুকুরেই সমগ্র বিষয়ের প্রতিফলন। ধীরে ধীরে ব্যক্তিপাত্রটির বেদনা সূচীমুখ তীব্রতায় প্রাতিস্বিক হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই প্রাতিস্বিকতার মধ্যে রয়েছে সার্বজনীন অভিজ্ঞতার সারাৎসার।

কবিতাটিতে কতকগুলি সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। 'আমি', 'তুমি' এবং 'তার' বা 'সে'—এই সর্বনামগুলি কবিতার ভাব ও পরিবেশাশ্রিত কল্পনার ধারক। কবিতার প্রথম উচ্চারণেই যে-'তার'—আর একেবারে শেষ প্রান্তে যে-'তুমি', এদের দুজনের অভেদ অনুধাবনীয়। এই উভয়ের মধ্যে আপাত-পার্থক্য একটা, হয়তো কল্পনার বাইরে নয়। সে হিসাবে বলা যেতে পারে প্রথম সর্বনামটি প্রকৃতির বিকল্প এবং শেষ সর্বনামটি প্রেমিকার জন্য। কিন্তু পৃথিবীর দিক থেকে যিনি প্রকৃতি, কবির দিক থেকে তিনিই প্রেম। বিষ্ণু দে-র ব্যবহৃত নিসর্গ রূপকতঃ জীবনের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে। তাই তাঁর প্রকৃতি আর প্রেম একই চেতনার দুই পিঠ—সে চেতনার মূল কথা হলো জীবনের ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষমতায় আস্থা। জীবন শুধু জীবন নয়, তা সঞ্জীবনীও বটে।

'জল দাও' কবিতার 'আমি' সেই পরিমাণেই কবি বিষ্ণু দে, 'লাভ সং অফ জে.-আলফ্রেড প্রুফ্রক' কবিতার 'আমি' যে-পরিমাণে এলিঅট স্বয়ং। কবি এবং তাঁর কল্পনাসম্ভব চরিত্র—এই দুই ব্যক্তিত্বই যেমন জে. আলফ্রেড প্রুফ্রকের আধারে রূপায়িত, 'জল দাও' কবিতার 'আমি'-ও তেমনি একটি জীবনযন্ত্রণায় দহ্যমান চরিত্র এবং কবি নিজে। চরিত্রটি এই ডাবলিং অফ দি পার্সনালিটি-র প্রতিনিধি বলেই তা আমাদের কাছে অভিজ্ঞতার মতো সত্য হয়ে উঠেছে। এই কবিতার 'আমি'-র কণ্ঠে কখনো কখনো 'আমাদের' সর্বনামটি উচ্চারিত হতে শোনা যায়। প্রেমিক যেমন 'আমি-তুমি'কে মিলিয়ে 'আমাদের বলেন, এখানে 'আমাদের' শব্দে সেই অর্থকে লক্ষ্য করা হয়নি। এখানে 'আমি'ই ব্যাপকতা লাভ ক'রে 'আমাদের' হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় 'আমরা' বা 'আমাদের' বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কবিদের নিজনিজ চেতনা অনুসারে 'আমরা' শব্দের ব্যঞ্জনাও পৃথক হয়েছে। জীবনানন্দের 'আমরা' আর বিষ্ণু দে-র 'আমরা' এক কথা নয়। আলোচ্য কবিতায় 'আমাদের' শব্দটি কাব্যের মূল থীমকে সাহায্য করে। যন্ত্রণাবাহী 'আমি' যাতে শেষপর্যন্ত যন্ত্রণার অহঙ্কারে চিহ্নিত না হয়, 'আমাদের' শব্দটিতে তারই ইঙ্গিত।

কবিতাটির প্রারম্ভে, প্রকৃতির কর্মসূত্রের ইঙ্গিতে জীবনের অদম্য প্রবাহের রূপক নির্মিত—সেই রূপকই কবিতাটির যেখান থেকে প্রকৃত আরম্ভ ('তাই আজ যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ') তার পটভূমি হিসাবে গ্রাহ্য। যে ভৌম দৃঢ়তায় বনস্পতি ডালপালা মেলবার শক্তি পায়, আলোচ্য প্রথমাংশটুকু তারই সঙ্গে তুলনীয়। আর অনুধাবনীয় বাচনের ধীর লয়। মহাকাব্যোপম নিরাসক্ত প্রশান্তি এই ধীর লয়ের বাচনভঙ্গির সঙ্গে তুল্য। বিস্তৃত কাল কালান্তর, বিস্তৃত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কবি বা কবির নায়ক সেই অনুভূতিকেই প্রাণবন্ত করেছেন, যে-অনুভূতিতে বাংলাদেশের বাউল কবি বলেছিলেন—'ওরে নিঠুর গরজী তুই মানস মুকুল ভাজবি আগুনে…'

/ 'অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে'—এই প্রত্যক্ষ চিত্রকল্পের সাহায্যে কবিতাটির রচনাকাল মূর্ত হয়েছে। সেই সময়ে—ব্যক্তিস্বাধীনতা যখন দলিত, রাজনৈতিক চিন্তা যখন নানা দিকে আহত, দেশবিভাগের যন্ত্রণা তীব্রতর, তখন 'পরোয়ানা' শব্দটি অশুভ ছায়ার চিত্রকল্প হিসাবে, শুধু সুনির্বাচিত নয়, অব্যর্থ তাৎপর্য সঞ্চায়ী হয়ে উঠেছে। অথচ এই অংশেই প্রকৃতির মুকুরে জীবনের অন্তহীন অপরাজেয়তা দূরাগত আশ্বাসের অভয় বচন শোনাতে চেয়েছে। তা তৎকালে প্রচলিত গরমাগরম ছন্দঝুমঝুমি বাজানো ছেলে-ভোলানো রাজনৈতিক আশাবাদ নয়। তা আমাদের পরিচিত পাত্রটির, তথা কবির অস্তিত্বের বৃহত্তর অংশের অভিজ্ঞতার দান। 'জল দাও' কবিতার 'আমি' অত্যাচারে এবং অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত সময়ের বুকে এক যাত্রী-চরিত্র। ব্যক্তির নিজজীবনে এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে যখন আশ্বাসের উৎসগুলি বিপন্ন হতে থাকে, যখন নির্জনতা ঘনিয়ে আসে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়েই, যখন সমস্ত আকাশে হয় দাহ, নয় বিষণ্ণতা, যখন ভীষ্ম বা বৃহন্নলার মতো কর্মস্রোত স্থগিত, অথবা অন্যপথচারী—তখনই সমগ্র সত্তার পরতে-পরতে অদৃশ্য অথচ সুনিশ্চিত অন্বেষার যন্ত্রণা শুরু হয়। স্থানিক সমগ্রতাকে অতিক্রম ক'রে কালগত সমগ্রতার লক্ষ্যে মানুষের পূর্ণতার সাধনা। তৃষ্ণা এবং জলের রূপকে এই বিপুল অন্বেষার বেদনা এবং আবেগকে এই কবিতায় ধারণ করা হয়েছে। / 'গরমে বিবর্ণ' 'গরম হাওয়ার ঝরে নীল আর বেগ্‌নি কুরুষ', 'হিংস্র গরম', 'বালিচড়া মরা নদী', 'দগ্ধ দিনের মৃত্যুর শহরে'— প্রভৃতি প্রসঙ্গে সেই তীব্র তৃষ্ণার অস্তিত্ব। তৃষ্ণার মতো বারিবোধক আর কিছু হতে পারে না। তাই তৃষ্ণার তীব্রতায় জলের প্রতীক্ষা এত জীবন্ত।

এই উজ্জীবন-বারির জন্য প্রতীক্ষাই 'জল দাও' কবিতার মূল থীম।

'রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে বন্যা মরা পোড়ো লেবার্নমে'—এই প্রাকৃতিক পট-ভূমিতে 'দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়'। এই সব কর্মহীন, অর্থহীন, ছন্নছাড়া, স্বদেশে ছিন্নমূল, জীবনের ভগ্নতায় ব্যর্থতায় অসহায় অবস্থায় মনে হয়—'হয়তো বা নিরুপায়/হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস'। এই যন্ত্রণা-মথিত চিত্তের পটভূমিটি ঐতিহাসিক—আবার ব্যক্তিগত একটি যন্ত্রণায় বিনিদ্র সময়ের স্মারকও বটে। বাড়ির কাছেই আক্রান্ত এক মুসলিম যুবককে নিহত হতে দেখেছিলেন কবি। কবি নিজে এগিয়ে গিয়েছিলেন, যদি সে রক্ষা পায় এই ভেবে। গুণ্ডার আঘাতে সে আক্রান্ত প্রাণ হারায়। কবি নিজেও আক্রমণকারীদের লাঠিতে কাঁধে আঘাত পান। এই ভয়ানক ঘটনার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষতা তাঁর পক্ষে হয়ে উঠেছে দুঃসহ। 'জল দাও' কবিতায় এই ঘটনার পরোক্ষ প্রভাব লক্ষণীয় :

(ক) হাসবে কি একাই নিষাদ

(খ) দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে…

(গ) অন্ধ বিসম্বাদ

(ঘ) উন্মাদের ব্যবসা

(ঙ) গৃধ্নু দানবিক হিংস্র কণ্ঠ

(চ) অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান…

এই সময়েরই পূর্ণ-প্রতিভূ-কবিতা 'জল দাও'। 'হয়তো বা যন্ত্রণাই সার'—এই সময়েরই ক্ষণিক খেদোক্তি।

হয়তো বা শুনিনিকো হাসি
তোমার পূর্ণিমা। তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ।

এই উচ্চারণেও একটা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দাঁড়ানো ব্যক্তির, অপরাজেয় অথচ ট্র্যাজিক চেতনার উদ্ভাসন। এরই মাঝখানে এই যন্ত্রণামথিত চিত্তেই পূর্ণতাকে খুঁজে ফেরা। অথচ কবিতাটিতে কোথাও নৈঃসঙ্গ্যবিলাস নেই। কিন্তু একটি ক্লান্তি, একটা জটিল পথ অতিক্রমের অনুভূতি, মাঝে মাঝে এক দুঃসহ অচরিতার্থতা, নানা আকারে ছায়া ফেলেছে। 'সমুদ্রের আন্দোলন বান-ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ'—এমনি একটি মর্মান্তিক আক্ষেপোক্তি। যে কোনো অমূল উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার পটভূমিতে এ এক আশ্চর্য সময়োত্তীর্ণ উক্তি।

সময় 'জল দাও' কবিতার বিষয়। নির্দিষ্ট কালখণ্ডের সঙ্গে ব্যক্তির

বোঝাপড়া, সেই আকালের বাঁকাচোরা গলিপথে অথবা ঋজু রাজপথে ব্যক্তির যাত্রা ও পরিশেষে, সিদ্ধি নয়—সিদ্ধান্তই কবিতাটির বাস্তব বহিরঙ্গ। প্রতি মুহূর্ত যখন অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত, তখন ইতিহাসের পরিণতির অমল মহিমাকে বিশ্বাস ক'রে যে যাত্রা, তার প্রশান্ত প্রত্যয় ছড়িয়ে আছে এই কবিতায়। ভয় তখন সব থেকে বেশি বিচ্ছিন্নতাকে, নৈঃসঙ্গ্যকে। চিত্রকল্পের মূলধারা তারই সঙ্গে সুলগ্ন ঃ

ক। যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ

খ। হয়তো-বা নিরুপায়
হয়তো-বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার

গ। নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণচাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?

ঘ। কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাত বাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান

ঙ। অথচ নিঃস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে, কারণ, সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলন বান ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ

অথচ এই নির্জন বিষাদকে ঘিরে রয়েছে প্রকৃতির অমেয় প্রসাদ। বিষাদকে ভেঙে সেই প্রসাদে মিলিয়ে দেওয়ার কোনো গাণিতিক সূত্র কবি জানেন না। বরঞ্চ প্রকৃতির প্রসাদের সুবিস্তীর্ণ পটে বিষাদকে স্থাপনা করার মধ্যে জীবনের বিচিত্র সমগ্রতার আভাস মেলে। জীবনে ও প্রকৃতিতেও নানা বিপরীতের দ্বন্দ্ব। তাই গরমে বিবর্ণ হয় গোলমোরের সাবেক জৌলুস —সেই যাত্রিকের চোখে আনে জ্বালা, কিন্তু তার বিস্ময় বিপন্ন নয়, সে তার আগেই জানে ঃ

সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্ত ধরে
বিনীত পদ্মের মত নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত

কর্মের সংবিতে স্তব্ধ।
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল।*

তার বিস্ময় বিপন্ন নয় বলেই তার যন্ত্রণা আরো তীব্র। চিত্রকল্পে চিত্রকল্পে অস্তিত্বের যন্ত্রণার রূপাধার গড়ে উঠেছে। পদ্ম সৌন্দর্যময় পরম প্রশান্তির ভারতীয় প্রতীক। প্রসঙ্গতঃ আমরা আরেকবার স্মরণ করতে পারি অষ্টম অধ্যায়ের ফুলের প্রতীকী ব্যঞ্জনার কথা। স্মরণ করতে পারি উত্তরণের সেই পরমা প্রতিমাকে। কিন্তু বিষ্ণু দে এই স্বাভাবিক প্রতীকের সঙ্গে 'বিনীত' শব্দের সংযোগে ছবিটিকে অন্যতর গভীর অর্থে মূল্যবান করেছেন। চারি-দিকের অত্যাচার অনাচার পাপের মাঝে পদ্মের শুচিতা যেমন স্মরণীয়, তেমনি বিনয়ও। বিনয়ই তার শুচিতাকে গ্লানিময় সমগ্রের দিকে তাকিয়ে মূল্যবান করে তুলেছে। যন্ত্রণার মোচড়ে মোচড়ে যাত্রিকের অভিজ্ঞতার রূপাধারগুলি এই আকার নিয়েছে:

ক। তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতা-ঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার মরার মরীয়া যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

খ। তবু সন্ধ্যা চৈত্র সন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাদে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া স্ফুট দুর্বিষহ

গ। যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান

ঘ। তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গঅ৷তত
বালাসরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর মতো—

---

* চতুষ্পার্শ্বে দূষিত দিন। ছাদে পুত্রের সযত্ন লালিত বেলফুল এই দুয়ের বৈপরীত্য এখানে এই চিত্রকল্পে গভীরতা পেল।

দেখা যাবে চিত্রকল্পগুলি কোথাও আকস্মিক সাহসিকতায় উদ্বেল নয়। অথচ দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত আততি এদের প্রত্যেকটিতে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে এই আততি নিজে কোনো পৃথক দৃষ্টির পক্ষপাত দাবি করে না। 'গ' চিহ্নিত অংশে চিত্রকল্প কালখণ্ডকে তার আত্মবিরোধ সমেত মূর্ত করেছে। 'ঘ' চিহ্নিত চিত্রকল্পের রূপধারটিকে তুলে ধরার পরিশ্রমদীর্ঘ প্রয়াস যদিও বিচ্ছিন্নভাবে ক্লান্তিকর ব'লে মনে হয়, সে ক্লান্তিকে সময়ের পটে স্বাভাবিক ব লে মেনে নিতে কষ্ট হয় না। ক্লান্তি এবং প্রতীক্ষার কবি-কল্পনা, নিঃস্রোত এবং ঢেউ-এর চিত্রকল্প, যখন শেষ স্তবকের সিদ্ধান্তে আসে, 'তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই...' তখন এই রূপকল্পের ভিতর দিয়ে জীবনের রূপক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শেষ স্তবকে যাত্রিকের এই হৃদয়াভিরাম আত্মনিবেদনের জটিল প্রস্তুতি ছড়িয়ে রয়েছে এই দীর্ঘ কবিতাটির পর্বে-পর্বে চরণে-চরণে। পৃথকভাবে চিত্রকল্পগুলির কথা তখন আমাদের মনে থাকে না। থাকে শুধু কবিতাটির শুদ্ধ রসপরিণাম।

কবিতাটিতে প্রকৃতির বিচিত্র ভূমিকা লক্ষণীয়। আতুর এবং আর্ত অস্তিত্ব-পীড়িতের কাছে প্রকৃতি অবশ্যই আশ্রয়। কিন্তু এ-কবিতায় প্রকৃতি মানুষের সহযোগী। যেগুলি জীবনের মূল ধারায় পরিপন্থী শক্তি, এ-প্রকৃতি তাদেরও প্রতিদ্বন্দ্বী: 'হয়তো-বা শুনিনিকো হাসি'— স্তবকটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। 'হাসবে কি একাই নিষাদ' কিংবা তারো আগে 'অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের'—প্রভৃতি অংশে বিনষ্টির প্রতিস্পর্ধী প্রকৃতিকে অনুভব করা যায়। এই প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত আর কেবলমাত্র প্রকৃতি নয়— অপরা প্রকৃতির ভিতর দিয়ে পরাশক্তির সঙ্গে তুলনীয় (এ তুলনা কবির নয়) যে পরম সঞ্জীবনী শক্তি কাজ করে চলেছে, তাকেই দেখা গেল 'সাগরউত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে'; ইনিই কবির সমগ্র অস্তিত্বের সারাৎসার প্রতিমা। কবিতার শেষ স্তবকে যে প্রশান্তি তা এঁকে উপলব্ধি ক'রেই। তা শুধু তৃষ্ণারই নিবৃত্তি নয়, প্রেমের প্রত্যয়ও। 'তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই...' এখান থেকে শেষ চরণ পর্যন্ত শান্তরসাশ্রিত অংশ কবিতাটির গঠনে শৈল্পিক পূর্ণতা প্রদান করেছে। যে যন্ত্রণা, যে বেদনা এই কবিতার সর্বত্র মূর্ত, তা বৃহৎ এক উপলব্ধির আশ্বাসে শান্ত—সেই প্রশান্তিই পূর্ণতা। গাঠনিক সৌষম্য এবং শৈল্পিক অভিপ্রায়ের সাযুজ্যে কবিতাটিও অখণ্ডতা লাভ করেছে। প্রথমাংশের উপস্থাপনা ('একরাশ শাদা বেলফুল'

পর্যন্ত), দ্বিতীয়াংশের অস্তিত্বের যন্ত্রণাভাতি ('সমুদ্রের আন্দোলন বান-ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ' পর্যন্ত) যেন নানা বাঁক, নানা মোড় ফিরে কবিতাটির তৃতীয় এবং শেষ অংশে সমুদ্রের বিস্তার লাভ করেছে। আর সবটাই বলা হয়েছে এক লোকায়ত বেগবান কথ্যস্রোতের সহায়তায়। ঐতিহ্যপুষ্ট শব্দরাশির সঙ্গে সজীব কথ্য ভাষার নিজস্ব ছন্দকে মিলিয়ে এ-কবিতার বাক্‌সিদ্ধি অর্জিত হয়েছে। কখনো বিষাদ, কখনো প্রত্যয়, কখনো অতীত, কখনো বর্তমান এই নানা অসবর্ণের জটিলতা এখানে চরিত্রবান ভাষাতেই জীবন্ত। আর এই মিলহীন কবিতায় কবির ব্যবহৃত সুপ্রচুর অন্তর্মিল ('আমাদের ঘরে-ঘরে আমরাও নানান মানুষ…বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়' অংশটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়) যেন আপাত অনৈক্যের অন্তর্বর্তী যোগসূত্রের মতো ক্রিয়াশীল। এবং ঐ বেগবান কথ্য স্রোতের তরঙ্গ-ভঙ্গে এ কবিতার শেষাংশে সঙ্গীতকল্প vital import রচিত হল। এ কবিতায় চিত্রকল্পপুঞ্জ কবির সচেতনতার মূর্তিপুঞ্জ। লক্ষণীয় 'পথ' বা 'ঘরে ফেরা' অন্বিষ্ট অধ্যায়ে আরেকটি প্রধান প্রসঙ্গ। 'অন্বিষ্ট কবিতার ২-সংখ্যক অংশ' অথবা '১৪ই আগস্ট' কবিতায় 'দেখেছি মেলায় এক -অংশ কিংবা 'অবিচ্ছিন্ন কাব্য'-কবিতার 'ঘুরে ফিরে সেই স্বপ্নেরা পথে ঘোরায়'-অংশ বা 'শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব'-কবিতার 'নেই গলির সীমানা, পায়ে চলার শেষ কোথা'—ইত্যাদি পুনরাবৃত্ত পথ-প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ের কবিমানসতার একটি দিককে নির্দিষ্ট করছে। 'জল দাও' কবিতায় পথ পরোক্ষভাবে এক বৃহত্তর তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে। অন্বেষার প্রতীক এই পথ, পথই অন্বিষ্ট। তাই এখানে অনিবার্য স্বর ধ্বনিত :

আমি দূরে কখনও বা কাছে পাশে পাশে এখনও বা হাসে।
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই…

এই চলাই জীবন। কবির কাছে এবং আমাদের কাছেও।

ক্লান্তি নেই

তুলনার্থে বলছি না, দুই কবির তত্ত্ব বিশ্বের সংক্ষিপ্ত তুলনা সঙ্গতও নয়,—তবু এটা কারো দৃষ্টি এড়ানো উচিত কি যে, রবীন্দ্রনাথের মতো বিষ্ণু দে-ও প্রতীক্ষার কবি? একথা ঠিক, বড়ো কবি মাত্রেই একটা মহাপ্রতীক্ষাকে লালন করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় গানে এবং কাব্যোপম নাটকগুলিতে সেই মহাপ্রতীক্ষাকে মূর্ত করে দিয়েছেন। যে কোনো প্রতীক্ষার মূলে থাকে অপূর্ণতা জনিত বেদনা। অপরিপূর্ণ রিয়্যালিটি সম্বন্ধে অবধানতা এক হিসাবে অস্তিত্বের দান। সচেতন সেই অস্তিত্ব ঐ দানের সঙ্গে একটা দক্ষিণাও দেয়—পরিপূর্ণ আইডিয়ালের ধ্যান বা উপলব্ধি। প্রতীক্ষা সেই দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা বোধের ফল। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছিল। প্রতীক্ষক আশাবাদী—সে কখনো শূন্যতায় আক্রান্ত নয়। মহাবিরহেও সে সম্ভব করে তোলে ভাবসম্মেলন। রবীন্দ্রনাথেব আশ বাদ তাঁর প্রবল গভীর আস্তিক্যের অভিজ্ঞান বহন করছে। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' লিরিকটি স্মরণীয়। এই গানটিই এখন আমরা বেছে নিলাম বিষ্ণু দে-র 'ক্লান্তি নেই' কবিতাটির সঙ্গে তুলনা বিচারের জন্য। দুঃখ মৃত্যু বা বাস্তবের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পূর্ণতার স্বপ্ন বা আকাংক্ষা অনির্বাণ থাকে—দুই কবিই এ কথা আমাদের জানান পৃথক 'টোনে', 'টিউনে'। কিন্তু মিল এই পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'দুঃখ' 'মৃত্যু' সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, বিষ্ণু দে-র কবিতায় স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু দুঃখ মৃত্যুর ভাবচিত্র মূর্ত হয়েছে প্রাকৃতিক প্রতিমায়। ব্যক্তিগত জীবন তথা প্রত্যক্ষ নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং প্রাকৃতিক উজ্জীবক শক্তির সহাবস্থানে শেষোক্ত শক্তির জয় ঘটে—এটাই রবীন্দ্রনাথের বাণী।

বিষ্ণু দে শুরু করেন—'আমার স্বপ্নও অপরিসীম'। 'স্বপ্নও'—'ও' এই অব্যয়টি বক্তব্যের ব্যঞ্জনাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। একটা অর্থ আস্তে আস্তে দানা বাঁধে। আমার দুঃখ দুর্দশা, বেদনার যেমন সীমা পরিসীমা নেই—তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বপ্নেরও সীমা নেই। বাস্তবের প্রতিস্পর্ধী এ স্বপ্ন—সে কারণেই বলতে ইচ্ছে করে স্বপ্ন এখানে সংকল্পের আরেক নাম। দ্বিতীয় পংক্তির 'আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই'—সেই সংকল্পের সত্যকে ধারণ করে আছে। সেই স্বপ্নের নাম যেমন সংকল্প, সেই সংকল্পেরই দান প্রতীক্ষা

করার ক্ষমতা। দ্বিতীয় পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথের 'তবুও' এবং তৃতীয় পংক্তিতে বিষ্ণু দে-র 'অথচ' সংযোজক অব্যয় মাত্র নয়। 'তবুও' প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ঢেকে দিতে চায়—'তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' এই তবুকে ধরেই রবীন্দ্রভাবনা প্রথম চরণের বস্তুজগতকে একবার মাত্র ছুঁয়ে মিশে যেতে পারে ধূলিবিহীন নীলিমায়। অন্যদিকে বিষ্ণু দে-'অথচ' অব্যয়ের সাহায্যে একই সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করেন স্বপ্নের প্রতিকূল বাস্তব পরিস্থিতি এবং নিজ সংকল্পের অপরাজেয়তা—'অথচ ডালে-ডালে শুকনো হাহাকার/অথচ মাঠে-মাঠে অসাড় হিম,/আকাশে কান্নারও ক্লান্তি নেই।' 'শুকনো হাহাকার' নিষ্পত্র অরণ্যস্থলীর রূপকে জীবনের বাস্তব ভাবছবিকে ফুটিয়ে তুলছে। 'অসাড়' 'শুকনো' দুটো বিশেষণই এদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। 'অসাড়' এবং 'শুকনো' বন্ধ্যাত্বের সূচকও বটে। শীতের পরিবেশটি ঠিকভাবে ধরে দেবার জন্য 'শুকনো'র পরেও 'অসাড়' শব্দটির প্রয়োজন হলো। তারপর 'আকাশে কান্নারও ক্লা ন্তি নেই'—আবার 'ও'। কিন্তু এই 'ও' প্রথম পংক্তির 'ও'-এর সঙ্গে ভারসাম্য রচনা করছে। দুটো 'ও' পরস্পরের প্রতিস্পর্ধি—স্বপ্ন আর বাস্তবের দ্বন্দ্বময় মূর্তির প্রতিষ্ঠা ঘটলো। 'ক্লান্তি' শব্দটি এই কবিতায় একটু পরেই আরেকবার ব্যবহৃত হবে—তখন এই বাস্তবের প্রতিস্পর্ধীতা আরো তীব্র হবে।

ষষ্ঠ পংক্তি অথবা দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তি—'জীবন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়'। পর পর দুটি শব্দের যুক্ত ব্যঞ্জন পংক্তিটিকে মন্থর করে—একদিকে সে মন্থরতা ঐ প্রতীক্ষার দীর্ঘতার দান। আবার অন্যদিকে তা প্রতিহত জীবনস্রোতের মুক্তিলাভের সংকল্প। কবি যে সচেতন ভাবে এটা করেছেন তা নয়, সজাগ শিল্পকৃতি ও মগ্ন চৈতন্যের সামগ্রিক সহযোগিতায় শব্দ-প্রতিমার এমন গড়ন সম্ভব হয়। 'প্রতীক্ষা না এক মিশ্রসুর'—সন্দেহ অলঙ্কার বটেই, কিন্তু মিশ্রসুরের আরেকটা ব্যঞ্জনা আছে—আশা আর আশঙ্কায় মেশানো সে প্রতীক্ষা। যে-কোনো প্রতীক্ষার মধ্যেই থাকে আশা আর আশঙ্কা। এখানে 'মিশ্র' এই বিশেষণ প্রয়োগে সুরকে বলা হয়েছে জটিল, এবং তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ব্যাপকতায়। যে-দ্বন্দ্বময় রিয়্যালিটির মাঝখানে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে থাকি—'মিশ্র' বিশেষণটি তার দিকে ইঙ্গিত করে। 'আকাঙ্ক্ষার নীলে রেঙেছে অঙ্গার'—আকাঙ্ক্ষা শুধু প্রতীক্ষারই অপর নাম নয়, তা বেদনারও নামান্তর। সে জন্যই তার রঙ নীল। আবার নীল সংস্কৃত ক্লাসিকের অর্থে অসিতবর্ণও বটে। বেণীর বিশেষণ এই অর্থেই

নীল। সে দিক থেকে তা অন্ধকারের রঙ। 'অঙ্গার'—ভূগর্ভস্থ উত্তাপে যা কয়লায় রূপান্তরিত। সে কয়লাও রাঙা হয়ে ওঠে কামনার আঁচ লেগে। বাসনা উন্নীত হয় প্রেমে। সেটুকু হয়েই সে কিন্তু থেমে থাকে না, সেটাও আমরা একটু পরে দেখবো। এতক্ষণ ধরে এক চলিষ্ণু আবেগের কথাই বলা হচ্ছে। 'চাওয়া' পাওয়ায় মেশে'—অন্য কবিতায় বিষ্ণু দে যে ক্ষেত্রে বলেন—'প্রেমের তৃপ্তি অতৃপ্তি একই দীক্ষা'—এ কবিতায় কতকটা তারই সন্নিহিত উক্তি করেন—'চাওয়ায় পাওয়া মেশে সে ভিক্ষায়'। চাওয়াটাই কাম্যকে পেয়ে যাওয়া। ডাকতে পারাই সাড়া পাওয়া। শরীরকে তখন আর মনের সঙ্গে বিচ্ছেদের দুর্ভোগ পোহাতে হয় না। দূরত্ব তখন মূর্তিমেয় হয়ে যায়। স্থান তখন ব্যবধান রচনা করতে পারে না—কাল তো পারেই না। 'বাহুর নাগালে নেই অস্পষ্ট অধরা' (প্রচ্ছন্ন স্বদেশ) অথবা 'এ পূর্বরাগ পাবে না ক্রান্তি দিন তো রাত্রি রাত্রি করেছি দিন' অথবা 'ঊষসী সে কবে মেলাবে হৃদয়ে এ ঊষা হৃদয়?' 'মুঠি' আকর্ষণের প্রতীক। 'পাঁচ প্রহর' কবিতার কথা মনে পড়ে—'ঘরের ডাকে টানে দূরের রথ'—প্রভৃতি 'অস্বিষ্ট' পর্যায়ের প্রতীক্ষাবাচী পংক্তিতে বিষ্ণু দে-র প্রেম প্রকৃতি ও কালচেতনা ত্রিমুখ এক বিন্দুতে সংহত। বিষ্ণু দে-র 'তুমি' এই অর্থে ব্যাপকতরের সর্বনাম। এই 'তুমি'-র মধ্যে প্রতিমা-সংহতি পেয়েছে তাঁর ত্রিকাল বিস্তৃত জীবনচেতনা। তাই 'প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত' তাঁর অস্তিত্ব।

'চাই না তুমি বিনা শান্তিও' ঈষদ্দীর্ঘ শেষ স্তবকের প্রথম পংক্তি, বা, কবিতাটির একাদশ পংক্তি, বাচনে ঋজু। নির্দ্বন্দ্ব শান্তির কোনো অভিপ্রায় নেই। না-পাওয়ার মধ্যে যে অশান্তি তা অনেক বেশি নৈতিক গুণান্বিত। 'শান্তিও'—আবার 'ও'। এখানে 'ও'—'এমন কি'। দুর্বিসহ বর্তমানেও সে শান্তির দরকার নেই যে-শান্তি তুমি-ব্যতিরিক্ত। 'তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই'—'ক্ষান্তি' শব্দটি মনে পড়িয়ে দেয় একটু আগের 'আকাশে কান্নারও ক্ষান্তি নেই'। 'স্বপ্নও অপরিসীম' বস্তুতঃ অপ্রাপ্তিও অপরিসীম, তাই কান্নাও অপরিসীম। কিন্তু তাহলেও তোমাকে চাওয়া অনিঃশেষ। সমস্ত কিছু নৈতিক তাৎপর্য পায় এখানে। 'কৃষ্ণচূড়া রাঙে সেও তো হাহাকার/এর আগে অঙ্গারের রেঙে ওঠার কথা বলা হয়েছে। কঠিন ভূস্তরের অন্ধকার চাপে অঙ্গারের রেঙে ওঠা—এক অর্থ, কিন্তু নীল শুধুই অন্ধকারের রঙ নয়, অঙ্গারের রূপান্তরের রঙও বটে, সে যা হবে তার পূর্বাভাস ওই রঙ।

আলোচ্য কবিতার প্রথম স্তবকে শুধুই রিক্ততার কথা বলা হয়েছে—সম্পদ শুধু স্বপ্নে, যার নাম দিয়েছি সংকল্প। দ্বিতীয় স্তবকে এল নীল রঙের প্রসঙ্গ। বহ্নিমান অঙ্গারের তীব্র দহনের রঙ নীল। তৃতীয় স্তবকে এল পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার প্রসঙ্গ। নিষ্পত্র ডালে লাল ফুল যেন বিমুখ বর্তমানের উপর স্বপ্নের স্বাক্ষর। আকুতির রঙ হিসাবেই তা লাল। তাই কৃষ্ণচূড়ার রক্তিমায় এই কবিতার মূল আলম্বন পাত্র নিজের হৃদয়ের ছবি দেখে—'আমারই হৃদয়ের কান্তিও'॥

'তোমাকে জেনেছে যে শান্তি নেই/জীবনে তার'—একথা প্রেমিকের সম্বন্ধে সত্য, বিপ্লবীর সম্বন্ধে সত্য, এ কথা সেই মানুষ সম্বন্ধেই সত্য, যে ছকে বাঁধা গতানুগতের অস্তিত্ব ভেঙ্গে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে, প্রেম বা আদর্শের আহ্বানে, সেই ছকের রিক্ততা নিরর্থকতা যে বুঝতে পেরেছে। 'সেই হীরার' —হীরার অলক্ষ্য ভূমিকা রচিত হয়েছে অঙ্গার প্রসঙ্গে একটু আগে। অঙ্গারেরই রূপান্তর ঘটে হীরায়। উত্তাপে চাপে অঙ্গারের সে রূপান্তর ঘটে। যতক্ষণ সে অঙ্গার হীরায় রূপান্তরিত না হচ্ছে, ততক্ষণ সে বেদনায় নীল হলেও আলোক প্রতিফলনের বা বিচ্ছুরণের ক্ষমতা তার নেই। হীরা হয়ে যাবার পরই সে হয় অক্ষয় আলোকের অধিকারী। তোমাকে জানা হয়েছে বলে দুঃখে চঞ্চল হওয়ার যেমন শেষ নেই, তেমনি সেই দুঃখকে, বেদনাকে স্বপ্নকে, প্রতীক্ষাকে কবিতায় সংহত করে অন্ত আলোক বিচ্ছুরণেরও শেষ নেই। অঙ্গারের তবু একটা শেষ পরিপূর্ণতা আছে হীরাকে রূপান্তরিত হওয়ায় - কিন্তু তোমাকে যে জেনেছে সে কখনো পরিপূর্ণতার শান্তি পায় না। যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের অস্থির স্বপ্নময় আলোড়ন তাঁকে ছাড়ে না। অথচ এই যন্ত্রণা সে প্রেমিক অথবা কবিকে ক্লান্ত করে না। সেটাই তাঁকে উজ্জীবিত রাখে।

[পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা বিষ্ণু দের চিঠি —]

কনক কানন, উইলিয়ামস্ টাউন, দেওঘর, বিহার

স্নেহের পার্থ,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম, গরম হাওয়ার মধ্যে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছ, তুমি কেমন আছ? দেখাসাক্ষাৎ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের নাটক, আমারও ধারণা, উচ্চ শ্রেণীর, বাংলায় উচ্চতম বোধহয়। এবং বিশিষ্ট তার জাত, যখন তা গীতিধর্মী রীতির কাছাকাছি থাকে। উৎকৃষ্ট নাট্য প্রযোজনায় হয়তো এই গীতিধর্মিত্ব চাপা পড়ে, ঝোঁক পড়ে নাটুকে বা নাটকীয়তার দিকে, অথচ সামাজিক রাজনৈতিক শিল্পজাত কারণে মহাকবি প্রত্যক্ষনাট্যে সিঁটিয়েযেতেন, "কাব্যি" ও গীতিময় নাট্যের পথে প্রকাশ খুঁজতেন। সময়ে সময়ে অবশ্য আশ্চর্য বিশ্ব-অসামান্য সাফল্য দেখা যায়, যেমন "মুক্তধারা" বা "রথের রাশি"-তে। "ডাকঘর" নাটকেও বোধহয় এই গীতিনাট্য মেজাজেই তিনি অনন্য, মেটরলিঙ্ক থেকে। এক বোধহয় ইয়েট্সের কিছু কিছু নাটকে তাঁর মেজাজ প্রতিবেশী পায়, কিন্তু "কালভারি" বা "রেজারেকশন" বা "দি ওআর্ডস আপন্ দি উইনডোপেন"?

প্রত্যক্ষের বাস্তবতা আমাদের পরোক্ষ জীবনে ব্যাহত তাই বোধহয় শিল্পসাহিত্যেও। তারই মধ্যে রাবীন্দ্রিক প্রকাশএষণা ভয়ঙ্কর প্রতিভার সক্রিয়তা ভীতসন্ত্রস্ত বিড়ম্বিত দেশে। তাই নয়?

সাহিত্যপত্র বিষয়ে তোমরা দয়ামায়া রেখো। বেচারা প্রদ্যুম্ন,[১] তার এত কাজ, তবু উৎসাহ প্রচুর। কাগজ নাকি শীঘ্রই বেরোচ্ছে। ডেক্লারেশন্ পেতে বিস্তর দেরি হল।

এমনিতেই ভাবছিলুম সরোজকে[২] আর নরেন্দ্রকে[৩] অভিনন্দন জানাই। কাগজটি ভালো হয়েছে। সমরেশের[৪] গল্পটি বেশ, যদিচ ঐ স্বগতোক্তি ও স্মৃতিচারণ আরো আঁটসাঁট বাঁধা হলে অভিভূত করত বেশি। দেবেশের[৫] গল্পটি উৎরেছে দারুণ। নরেন্দ্র-র[৬] পুস্তক সমালোচনার আবেগ-টা ভালো লাগল। আশা করি চলবে কাগজটি। তোমাদের

বিষ্ণু দে

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ২৮।২ এর চিঠি পেয়ে বলাই বাহুল্য খুশি হয়েছি। জবাব দিতে দেরি হল এবং সংক্ষেপ করছি। কারণ শরীর ও স্নায়ুর স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছে পস্টিউমস্ পুরস্কার পেয়ে অবধি। আশা করি তুমি মার্জনা করবে।

টমাস মান-এর আমি অনুগত পাঠক, সেই রয়াল হাইনেস্ থেকে ব্ল্যাক সোআন অবধি। তাঁর Dr. Faustus ও Joseph অসাধারণ আধুনিক মননের উপন্যাস। Holy Sinnerও অসামান্য কীর্তি। কিন্তু মান্-এর উদাহরণ আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ে রাবীন্দ্রিক থীসিসেরই প্রায় প্রতিবেশী, ব্রেখটের মতো এন্টিথীসিস্ হিসাবে উপস্থিত করা যেত না। কারণ মান্ যে লিখেছিলেন, না ?—কার্লমার্কস্ যদি হোয়ল্‌ডেরলিনের কাছে পাঠ নিতেন।—কিন্তু বক্তব্যটা সম্পূর্ণ হত যদি বলতেন যে আহা হোয়লডেরলিন্‌ও যদি মার্কস পড়তে পারেন তাহলে কী ভালোই হত! তাই নয়? মান্ যে পরিমাণে ফ্রয়েড-ইয়ুং পাঠ করেছিলেন সে মাত্রায় যদি মার্কসকে পরিপাক করতেন তাঁর লেখার উভবলিত্ব বা অস্পষ্টতা নিশ্চয়ই কমত। তোমার কি মত? আশা করি তোমাদের খবর ভালো।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

স্নেহের পার্থ,

তোমার কার্ড এইমাত্র পেলুম। খুশি হলুম। সাঃ পত্রতে তোমার দীর্ঘ আলোচনা একবার রিখিয়া থাকতেই পড়ি। তোমার লজ্জিত হবার কি আছে? আমারই একটু অপ্রস্তুত লাগে। অবশ্যই ভালো লেগেছে, তুমি যে অত খেটেখুটে বিস্তৃত ভাবে লিখেছ তাতে খুশিতে তারিফ জানিয়েছি। হ্যাঁ এলিঅটের কাছে আমি কৃতজ্ঞ – মার্কস এঙ্গেলসের ঋণস্বীকারও তো বাহুল্য। আসলে আমরা তো নিজের গরজেই প্রভাবান্বিত হই। আমার সৌভাগ্যবশত ঠিকসময়ে ঐ সব প্রভাবে বিচলিত হতে পেরেছিলুম।

এরিক্‌সনের গান্ধী-বই আজও পাইনি। আমার জামাতৃদ্বয় খোঁজে আছে। আশা করছি কলকাতাতে এসে পড়বে কড়াকড়ি সত্ত্বেও।

দর্পণে তোমার লেখা পড়বার ইচ্ছা আছে। পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারো? নরেন্দ্র[৭]রও কি লেখা বেরিয়েছিল, পাঠাবে? যখন আমি খবর পাই তখন আর স্টলে গিয়ে পাইনি ও পাইও না।

তোমাদের সব খবর কি? আছ কেমন? সরোজ লেখে না কেন? শুভাকাঙ্খী—

তোমাদের

বিষ্ণুদে

নরেন্দ্র একদিন সসন্তান এসেছিলেন, পপারা বলেছিল। থাকলে দেখা হত এবং খুশি হতুম।

স্নেহের পার্থ,

তোমার চিঠি পেয়ে বেশ ভাল লাগল এবং তোমরা মোটামুটি সুস্থ আছ জেনে। সাহিত্যপত্র-য় তোমার ও সরোজের[৮], প্রবন্ধ ভালো লাগল। সরোজ বড় কম লেখে। নরেন[৯] কেমন আছে?

কবিতা তো আমি প্রচুর লিখি। গত আড়াই তিন মাস লেখা প্রায় হয় নি। যেটা আমাকে পীড়া দেয়, কারণ লেখার habitus-এ বিশ্বাস করি তো। অনেকদিন পরে তাই একটা লিখে নিজেরই স্বস্তি হল, সেটা 'অমৃত'কে দিয়েছি।

"আমাদের শিল্পকলার সমাজপ্রেক্ষিত সহ কোনও আলোচনার বই" আমার তো জানা নেই। আমার খুচরো লেখা সাহিত্যেব ভবিষ্যতে আর মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা যা আছে তা ছাড়া আব কিছু বোধহয় লিখিনি।

মাওৎসেতুঙের কবিতা পাওয়া যায় না। অনুবাদ হয়েছিল অধ্যাপক তানয়ুন শান্-এর ইচ্ছায় ও সাহায্যে এবং তাঁর ছেলে তানচুঙের সঙ্গে ব'সে ব'সে—প্রায় একমাস ধ'রে খেটে।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণু দে

স্নেহের পার্থ,

আজই তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। তোমাদের কথা প্রায়ই মনে হয়। বাঁধনও[10] মাঝে মাঝে তোমাদের কথা বলে।

সাহিত্যপত্রে ও পদাতিকে তোমার লেখা পড়ে ভালোই লাগল—লিখছ যে তাতে খুশি হওয়ার উপরিভাবেই। সরোজের[11] লেখাও। তোমাদের মননের শক্তি আশান্বিত করে।

ঐ অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলা বাংলাদেশ শেষ অবধি অসম্পূর্ণই থাকছে—তবে অনেক খণ্ডে অসম্পূর্ণ হয়েছে। ছাপাবার ইচ্ছা আছে তবে ইচ্ছা তো সর্বেসর্বা হয় না।—এমন কি উচ্চণ্ড সঙ্গীত ও বোমপটকাবাজি বন্ধ হোক সে ইচ্ছাও ব্যর্থ থাকে। রাজনীতির জগতেও তাই অসহায় লাগে—অথচ দীর্ঘসময়ের হিসাবে আশাভঙ্গ আশায় প্রাণ পেয়ে চলে। মনের জিত—বা জিদ্—কিন্তু জিত তো বটে, কি বলো তোমরা?

ঐ 'নরক প্রকাশ্য হোক' বেরোয় সপ্তাহ-পত্রে। অসম্পূর্ণ কবিতারই অংশ।

পরিচয় আন্তর্জাতিক শাঃ কালান্তর আজও পাই নি। তারই কোনোটিতে শুনেছি দেবেশের[12] ভালো গল্প বেরিয়েছে।

আশাকরি তোমরা সবাই ভালো আছ।

শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের

বিষ্ণু দে

[পার্থপ্রতিমকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের চিঠি]

৫ এস, আর, দাস রোড

কলিকাতা-২৬

প্রিয় পার্থপ্রতিম,

ইতিমধ্যে আমাকে জমশেদপুর Tagore Society-র আমন্ত্রণে যেতে হয়। এসে দেখি আপনার চিঠি অপেক্ষমান। আপনি যে প্রশ্ন করেছেন বিষ্ণুবাবুর কবিতা সম্বন্ধে তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। আসলে ঐ কবিতা সুরারোপের জন্য লিখিত হয় নি। "জ্ঞান-পীঠ" Award Committee আমাকে অনুরোধ করেন, স্মৃতিসত্তাভবিষ্যত নিয়ে কিছু করা যায় কি না।

কবিতাটাকে নানাভাবে অনেকবার পড়লাম। পড়ে দেখলাম এর এক অন্তর্নিহিত সুর আছে যা সঙ্গীতের মাধ্যমে হয়ত প্রকাশ করা যায় এর এক ভাষ্য হিসাবে। বিশ্বাস করুন, ইট কাঠ পেরেক দেশলাইকেও সুরান্বিত করা যায়। একটা কবিতার বিশেষ কোনও মুহূর্তের তাগিদে। অবশ্য এর প্রধান বিচারক কান। সে যদি উলটো দিকে রায় দেয় তা হলে সে সুর টেঁকে না ধোপে। যে জন্য সুরারোপ সব সময় শ্রাব্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছয় না। অবশ্য Composer-এর কান, অভিজ্ঞতা ও কাব্যবোধ প্রায় কবির স্তরেই পৌঁছন দরকার। কারণ এটা কাব্যের recreation ও interpretation-ও বটে। বিষ্ণুর কবিতার সঙ্গে আমি প্রায় আশৈশব পরিচিত। আমি তার সহপাঠী, সহকর্মী, সহমর্মী। তার কবিসত্তার গভীরে পৌঁছন আমার পক্ষে তাই সহজ হয়েছিল। তার বিশেষ mood-টাকে ধরতে পেরেছিলাম তার কবি-কৃতির অন্তরে প্রবেশ করে। আমি নিজেও খানিকটা কবি, কবিতা-চর্চা করি। আমার সুর সাধনায়, উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত (ভারতীয় ও য়ুরোপীয়) এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমাকে খুবই সাহায্য করেছিল। আমি তাই তাদের কাছে ঋণী। সুর-স্রষ্টা, কবি, চিত্রশিল্পী এদের হাত প্রায় এক। এদের স্রষ্টামানসের গহন লোকের খবর খুব রহস্যময়, বিচিত্র এবং মাঝে মাঝে দুর্জ্ঞেয়। আমি, তাই, কেন যে কোন্ পংক্তির কি সুর লাগিয়েছি, তার সঠিক সংবাদ দেওয়া বড় দুষ্কর! মনে হয় প্রত্যেক শব্দের একটা আবহলোক (atmosphere) আছে, বিচিত্র mood আছে, রং আছে (chromatic)। এ সবই এক একটা সংবাদ ও সাহিত্য বহন করে। এর সৃষ্টি-প্রয়াস (সুরে হোক, শব্দে হোক, রং-এ হোক) বাহ্যতঃ খুব conscious মনে হলেও, এর অন্তর্লোক নিমগ্ন চেতনার নির্জ্ঞানে ধরা দেয়। conscious artist বলতে এইটুকুই বুঝি, যে, সে পরিবেশকে এবং তৎসঙ্গে তার tension উত্তাপ সংঘর্ষ সব কিছুকেই সে গ্রহণ করছে সমাজ-নিষ্ঠ ও বস্তু-নিষ্ঠ চেতনায়। কিন্তু তার পরের খবরটা নানা গবেষণার বস্তু হতে পেরেও পুরো খবরটা স্পষ্টভাবে দিতে পারা যায় না।

আমার বক্তব্য ঠিকভাবে বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না। চেতনার বহুধা স্রোত বেয়ে তান্মাত্রিক জগতের সংবাদ স্রষ্টা-মানসের গহন লোকে পৌঁছে, বেরিয়ে আসে অভিনব শিল্পকৃতির রূপ নিয়ে অনুভবগম্য sensation এর রাজ্যে। তারপর তার বিচার চলে, সমালোচনা, বিতর্ক চলে, নানা

ideology ও থিওরীর উদ্ভব হয়। জাগ্রত সমাজ-মানসের রঙ্গ-মঞ্চে এসে দাঁড়ায় উপভোগ বা অবহেলার বস্তু হয়ে। আরও অনেক কথা বলা যায়। আজ এই পর্যন্ত। আপনার পত্র পেলে আন্তরিক খুশী হব। আশা করি আপনার দাদা সরোজবাবু কুশলে আছেন। আপনার কুশল কামনা করে, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে—

আপনাদের

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

Rikhia etc.

[সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা বিষ্ণু দেরচিঠি]

স্নেহের সরোজ,

তোমার ৪ঠার চিঠি কাল পেয়েছি। আশ্চর্য তৎপরতা, হয়তো বা তোমার গুণে! আমি ভাবছিলুম তোমাদের কথা এবং কালকেই বাঁধনকে উত্তর দিতে গিয়ে তোমাদের খবর চাইছিলুম।

তোমার ছাত্রীরা তো বেশ ভালো মেয়ে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে খানিকটা সজীব কাঁচা মনের তাপ পাওয়া যায়, যা ক্লাসসম্পর্কের অতিরিক্ত। পাঠ্যজগতে ঘুরতে ঘুরতে এইরকম জিজ্ঞাসা পেলে তৃপ্ত হয়— তেত্রিশবছর মাস্টারি তো করেছি। তবে 'ঘোড়সওয়ার' জ্বরের ঘোরে লেখা, প্রণতি তার ইতিহাসটা মনে রেখেছেন। স্টীভন্‌সনের উত্তর স্কটল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরে ঘোড়া-ডোবার একটা গল্প বোধহয় একটা মনের রূপান্তর, মৈমনসিংহের মহারাজা শশীকান্তের হ তীর চোরাবালিতে ডোবা আরেকটি। ইয়ুং সেই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথকে জানান, ফ্রয়েড-উত্তর অবচেতন তত্ত্বের বিবর্তন তাঁরই দান। কোনো দানই তো একমাত্র ও চরম দান নয়। যে কোনো বিজ্ঞানেই ক্রমান্বয়ে, রূপান্তর হয় না কি? ইয়ুঙের ব্যাখ্যাসহ একটি চীনা গূঢ়মনস্তত্ত্বের বই পড়ে আমার ভালো লাগে (final conclusion নয়, stimulation ব'লে). সুধীন্দ্রনাথও সেটি পড়েন এবং তাঁর পিতাকে 'পরিচয়'-তে রিভিউ করতে দেন। Ricbard wilhelm-এর চীনা থেকে অনুবাদ, টীকা ইয়ুঙের। যাই হোক, 'ঘোড়সওয়ার'-এর সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ যোগ তার নেই। 'চোরাবালি'-র ভূমিকা লিখতে চান সুধীনবাবু, অনেকদিন

ধরে পাঠ ও আলোচনা হয়, মূল বক্তা ওরকম ভালো শ্রোতা কমই পেয়েছে (রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এক মহান ব্যতিক্রম)। মজাটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ও কবিতাটা পত্রিকা পড়ে ভালো লেগেছিল। যখন বইটা বেরোল, তখন শান্তিনিকেতনী কতিপয় মান্যগণ্যজন 'গুরুদেব'-কে গিয়ে আতঙ্কিত ধিক্কার জানান!

বাকিটা আমার স্ত্রী তোমায় জানাচ্ছেন— যদিচ বিষয়টি অত কিছু গুরুতর নয়। শুভাকাঙ্ক্ষী বিষ্ণু দে।

[কবিপত্নী প্রণতি দের সংযোজনী]

আমার বক্তব্য আরো অবান্তর (unnecessary) কবিতাটি বুঝবার পক্ষে। ওঁর খুব জ্বর ছিলো, 4th. না 5th Jan. 1935, rheumatic fever, সারা রাত প্রায় delirium-এর মতো কেটেছে। ভোরের দিকে আমায় বললেন, "কাগজ কলম দাও"। গলার ব্যথাতে অনেক সময়ে কথা বলতে পারতেন না, slate-এ বা কাগজে লিখে দিতেন। হাতের কাছেই ছিলো—কবিতাটির প্রথম অংশ তক্ষুণি লেখা হয়ে গেলো, তারপর খানিকটা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি অবাক হয়ে কবিতাটি পড়লুম—Coleridge-এর Kubla Khan-এর মতো dream poem বলে আমার মনে হলো। তারপর আমাদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জীবনময় রায় ওঁকে দেখতে এলেন, আমি কবিতাটি ওঁকে দেখাতে উনি ভীষণ excited হয়ে বললেনঃ তুই কিচ্ছু বুঝিস না, কি আশ্চর্য লেখা লিখেছে।

২য় ভাগটা ঘুম থেকে উঠেই শেষ করে ফেল্‌লেন। আরেকটা কবিতা ওই রকম খুব ভোরে প্রায় এক নিঃশ্বাসে লেখা—সেটাও চোরাবালিতে আছে—মহাশ্বেতা।

পরে, 1942-তে, যুদ্ধের সময়ে এক ইংরেজ সৈনিক Martin Kirkman এর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়েছিলো। তিনি Statesman-এ Soldiers Corner-এ লিখতেন। একদিন ওঁর এক Ripon College-এর ছাত্র ওঁকে আনেন। সে কথা Statesman-এ লিখেছিলেন আমাদের বাড়ি আসার বর্ণনা দিয়ে। তিনি অনেকদিন Communist Party-র সভ্য ছিলেন। বাংলা শিখে মহা উৎসাহে কবিতাটি অনুবাদ করে ফেলেন, কারণ ওটা নাকি একমাত্র people's poetry। আমরা একটু অবাক হয়েছিলুম, কিন্তু সুধীন-

বাবুকে বলাতে উনি বলেন—তা হতেই পারে, a Symbolist poem bears many interpretations! মার্টিন এখনও Card পাঠায়—তোমার সাগরপারের ভাই মার্টিন—বলে! প্রণতি।

Rikhia
(Via Deoghar)
Bihar

স্নেহের সরোজ,

তোমার চিঠি ও 'অমৃত'-র লেখাটি পেয়ে খুশি হয়েছি প্রণতি ও আমি। তুমি খুব পরিশ্রমী ছেলে বাপু। 'অমৃত' পাই, কিন্তু ঐ সংখ্যাটি দেখা হয় নি, তুমি না পাঠালে হয়তো দেখাই হত না। দু-কপি 'ঘোড়সওয়ার' লাভ হল। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর কথা তো ওঠে না, তাই খুশিই জানাচ্ছি।

বড় ঘোড়া ছোটবেলা থেকেই দেখতে ভালো লাগে। সেকালে মধ্য কলকাতাতেও দেখা যেত। দুই জ্যাঠার দুটো অস্ট্রেলীয় ঘোড়া ছিল, গাড়ি-ছাড়াও তাদের দর্শন হত যখন সইস্‌রা কর্তাদের দেখাতে বাড়িতে উঠোন অবধি আনত, আর রাঙাজ্যাঠাবাবুকে হাতে তুলে দানা খাওয়াতে হত। পাড়াতেই—কলেজ স্কোয়্যারেই পিসতুতো দাদা ছুটির দিনে তাঁর শ্বশুর মোহনবাগানের এক কর্তাব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে ক্যালকাটা লাইট হর্সের সভ্য—ময়দানে যেতেন। দৃশ্যটা বেশ। তারপরে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় দফায় যখন পাড়ার গোলদীঘি তালা দেওয়া, তখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাঁচিল টপকানো মিটিং-এ গোবেড়াং মার লাগাত সরকারী যমদূতরা। একদিন এক বালক বেগতিক দেখে এ রাস্তা ও গলি দিয়ে জনহীন রাস্তায় পালাচ্ছে এবং লাটের বডিগার্ড বাহিনী ও মাউন্টেড্ পুলিস ঘোড়ায় চেপে পাগলের মতো কলেজ স্কোয়্যার ও স্ট্রীট রাস্তা ও বাঁধানো পেভমেন্টে ছুটছে। প্রায় বাড়ির কাছে এসেছি বলে গোলদীঘির পূর্বপথে ঢুকে পড়েছি, দোকান-বাড়িঘরদোর সব ভেতর থেকে বন্ধ। মনে আছে কৃষ্ণকুমার মিত্র-র দেয়ালে লেপটে থাকাটা। মরি নি। আরেকবার ঘোড়ার কাণ্ড দেখি হ্যারিসন রোডে, মামার বাড়িতে মার সঙ্গে গেছি। রাস্তার দিকে এক নং উঠোনের তিনদিকে দোতলায় বারান্দা ও ছাত। রাস্তা দেখছি, দোকানপাট সব বন্ধ

হয়ে যাচ্ছে, গাড়িটাড়ি উধাও। দেখি বাবা দাদামশায়ের কাছে আসছেন। প্রায় এসে পড়েছেন, ফটক দারোয়ান বন্ধ করে দিয়েছে। একটা পাগলা ঘোড়া এদিক ওদিক ছুটছে লাফাতে লাফাতে। বাবাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, প্রায় মাড়িয়ে ছুটে পালাল। বাবা ৬ ফুট রোগাশরীর নিয়ে রাস্তায় অজ্ঞান, একটু কেটেকুটেও গিয়েছিল। দৃশ্যটা খুব ছাপ দিয়েছিল। ঘোড়ার শক্তি।

বড় বেশি বকছি। কিন্তু তার দায়িত্ব তোমারও খানিকটা। তাই নয়?

আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ।

শুভাকাঙ্খী বিষ্ণু দে

Yet, "the horse is a noble animal" দু'জনেই ছেলেবেলায় আলাদাভাবে Royal Reader-এ পড়েছি। মজার, না?

জল দাও পরে হবে। মাথা ও মধ্যঅভ্যন্তর কাবু। এবং প্রণতি সংসার, মিস্ত্রি আদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

[কবি পত্নী প্রণতি দের চিঠি]

Rikhia

শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু,

আপনার ৭।৮ তারিখের চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। আপনাদেরই কাছে আমাদের ঋণ বাড়ছে—সেটাই ঠিক। আসলে সেটাও ঠিক নয়—কারুর কাছেই কারুর ঋণ নেই—অনুসন্ধানে ঋণের কথা আসেই না। তাই নয় কি?

আমারও নিজের অনেকবার মনে হয়েছে লিখি, আমি যা জানি। কিন্তু এতো কম জানি, আর ভালো তো লিখতে পারি না তাই লেখা হয় না।

"ঢল" নামে আর "জোয়ারে" ওঠে—এখনও উনি বলছেন তফাৎ। জলস্রোত পাহাড় থেকে নামা—"ঢল"—জোয়ার ওঠে—সমুদ্রের থেকে নদীতে, নদীর জল স্ফীত করে তাই না? তাই "জেগেছে"—উঠেছে। জোয়ার ওঠে ভাঁটা নামে—নদী-সমুদ্রে জল ওঠা নামার flow and ebb tides, চাঁদের সঙ্গ সঙ্গে। তাছাড়া জেগেছে-অর্থাৎ সচেতনতা। ওঁর অনেক আগেই এই

ভুলটা ঠিক করা উচিত ছিল। কিন্তু কবিতা লিখে বেশী revise করেন না, আর এ কবিতা তো একেবারেই করেন নি। হঠাৎ record করবার সময়ে মনে পড়ে গেলো, পড়ে দিলেন।

ঐ "ক্লান্তি নেই" কবিতাটির শেষ পংক্তিতে আসবার আগেই "অপরিসীম স্বপ্ন" ও কবির "মনে কোনো ক্লান্তি নেই"-এর সঙ্গে বহির্বিশ্বের ছবির contrast আসছে—"ডালে ডালে শুক্‌নো হাহাকার", "মাঠে অসাড় হিম", "আকাশে কান্নারও ক্ষান্তি নেই"। কবির মনে একটা transformation. পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় ব্যস্ত। ভয় ভাবনা (Success, failure) সব এখানে জড়িত, তাই কি মিশ্রসুর ? সংগ্রামী আশা ? তাই "আকাঙ্ক্ষার নীলে রেঙেছে অঙ্গার"—নীল আঘাতের রং (Wante-তেও আছে), লাল ("রেঙেছে") রক্তের। কয়লার নীল আগুনের রঙেই উত্তাপ বেশী। লাল লোহা তো steel-এ পরিণত হয়। তাই মন ভিক্ষা চাইছে, কিন্তু সেই চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে অনেক নীল লাল স্তরের ব্যবধান। তবু 'সেই-পাওয়া'ই চাই, শান্তি সহজে নয়, এবং 'সেই চাওয়ার'ও ক্ষান্তি নেই।

প্রথম পর্বের "ডালে ডালে শুক্‌নো হাহাকার" শেষ স্তবকে হয়েছে উন্নত, রক্তের রঙে, শুকনো আর নয়, ফুলে,— "কৃষ্ণ চূড়া রাঙে ; সেও তো হাহাকার" [ইংরিজিতে rhetoric-এ যাকে বলে pathetic fallacy]—"আমারই হৃদয়ের কান্তিও"। সেই জন্যই তোমাকে যে জেনেছে তার আর জীবনে শান্তি নেই, কারণ সে তো সেই কঠিন উজ্জ্বল হীরা চেয়ে বসেছে। [এখানে মনে করিয়ে দি "অঙ্গার" ও "হীরা" একই carbon, chemically transformed through the ages—তাই তো ? কাজেই "হীরা"টা anticipated হচ্ছে দ্বিতীয় স্তবকের "অঙ্গারে"-ই।] হীরার মতো হতেই হবে, এই শুক্‌নো হাহাকারের জীবন বদল করে। তার পর্বে পর্বে আছে আঘাত নীল, লাল—কালো অঙ্গারই তো শাদা ঝকঝকে (scintillating) উজ্জ্বল হীরা ! "হীরা উজ্জ্বল সংহত জীবনও বলতে পারা যায়—আকাঙ্ক্ষিত সেই উজ্জ্বল জীবন, যা বহু কষ্টে আয়ত্ত করা যাবে।"

আমি ওঁকে এই লেখাটা দেখিয়েছি, এবং বলেছিলুম এটা আদর্শের কবিতা। Political—দেশপ্রেম। উনি বললেন, ওটা এক হিসাবে প্রেমেরও কবিতা। ওঁর কবিতায় সব জড়িয়ে যায়, দেশপ্রেম, প্রিয়ার প্রেম। Ambiguity থাকতে পারেই, অনেক কবিতাতেই থাকে—জীবন ও হীরা,

এবং যে সেই জীবনকে খুঁজছে, তাকেও তো হীরা হতে হবে। যামিনীদার কথা মনে পড়ে যায়, Nature-এ straight line, বা সহজ পথ নেই। ওদিকে সবই সহজ। জানি না, আমি কিছু বোঝাতে পারলুম কিনা—আমি যা বুঝেছি, লিখলুম।

আমার চিঠিটা লিখতে একটু দেরি হয়ে গেলো, মধ্যে বাঁধনের আগে জ্যোতি সাহা ও তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন, আমাদের বাড়ীতে নয়, কিন্তু খুঁজে থাকবার জায়গা জোগাড় করতে হলো। একটু ঝামেলা, এখানে থাকবার ভালো বাড়ী পাওয়া খুব কষ্ট। তারপর সব ব্যবস্থা করাও। তারপর এল, সনত ইলা। আর ক্রমাগত মিস্ত্রী খাটছে। একটু হয়রাণ হতে হয়, মাথা ঠিক থাকে না। আর আমি ঠিক স্পষ্ট করে বোঝাতেও পারি না; যতটুকু বুঝি। ওঁকে দিয়ে লেখাতে পারলে ভালো হোতো, কিন্তু উনি বেজায় bored হয়ে যান, নিজের কবিতা বিষয়ে। আর এখন তো হাতটায় ব্যথা, কমই লিখতে পারছেন। কবিতাই কম লিখছেন। গত বছর এ সময়ে অনেক বেশী কবিতা লিখেছিলেন। তবু আপনারা প্রশ্ন করলে, আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করে করে হয়তো লিখতে পারবো, বা ওঁকে প্রশ্ন করলে, উনিও হয়তো উত্তর দেবেন। আপনাদের মতো serious reader-দের উনি উত্তর দেন। অনেকে এতো বাজে চিঠি লেখেন, রাগ হয় আমারই!

আপনারা যদি পুজোর ছুটিতে দেওঘরে আসেন, তাহলে রিখিয়ায়ও আসতে পারবেন মাঝে মাঝে। অনেক প্রশ্নের উত্তর এবং অনেক কবিতার background মিলে যাবে।

আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমাদের শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিয়ে শেষ করি। ইতি

আপনাদের
প্রণতি দে

১। প্রদ্যুম্ন—প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, ২। সরোজ—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। নরেন্দ্র—নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ৪। সমরেশ—সমরেশ বসু, ৫। দেবেশ—দেবেশ রায়, ৬। নরেন্দ্র—নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ৭। নরেন্দ্র—নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ৮। সরোজ—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। নরেন্দ্র—নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১০। বাঁধন—ডঃ বাঁধনচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১১। সরোজ—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। দেবেশ—দেবেশ রায়।

বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জী

[বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জীর সঙ্গে শ্রদ্ধেয়া প্রণতি দে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন, ২৬।৪।৮২, তাতে রচনাপঞ্জী প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় মন্তব্য আছে : "...কয়েকটি ইংরেজি লেখার তারিখ পাচ্ছি না। যেমন, Lalitkala Contemporary No 1. এ লেখাটি Pioneers of Modern Art in India বেরিয়েছিল, কিন্তু, আশ্চর্য, সারা বইটায় কোনো জায়গায় Publication-এর তারিখও দেওয়া নেই। একটা book reviw মুলকরাজ করেছেন, বইটির date 1961— তাই অনুমান করছি লেখাটি 1961 বা 61-র পর। সমরবাবুর interviewটা (Shakespeare without tears) অবশ্যি ওঁরই কথা Compile করেছেন সমর সেন—ওটারও তারিখ ৬০-র পরই হবে......। বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪র্থ সংস্করণে ও উর্বশী ও আর্টেমিস-এর কবিতা লেখা আছে ১৯২৯—৩৬। সেটা ঠিক নয়, কারণ উর্বশী ও আর্টেমিস প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ। আমার কাছে একটি কপি আছে। কাজেই, সেই তারিখের পর কবিতা কি করে ওই বইতে প্রকাশিত হবে?......অল্প বয়সে "শ্যামল রায়" নামে গল্প লিখতেন—ক'টা গল্প আমার কাছে আছে—ছাপা হয়েছিলো —সেগুলি তো প্রকাশ করেন নি। সমগ্র যখন ছাপা হবে, সেগুলি দিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে।"]

কবিতা

১। উর্বশী ও আর্টেমিস —	প্রথম প্রকাশ : ১৩৪০ (ইং ১৯৩২), প্রকাশক বুদ্ধদেব বসু, গ্রন্থকার মণ্ডলী, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ—১ম সিগ্‌নেট সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৭ (১৯৬০) ও পরবর্তী সংস্করণ।
২। চোরাবালি—	প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৪ (১৯৩৭), প্রকাশক কুন্দভূষণ ভাদুড়ী—ভারতী ভবন, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ— ১ম সিগনেট সংস্করণ ১৩৬৭ (১৯৬০) ও পরবর্তী সংস্করণ।

৩। পূর্বলেখ— প্রথম প্রকাশ ১৯৪১—প্রকাশক প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী, কবিতা ভবন। পরবর্তী সংস্করণ—প্রথম "একুশ বাইশ"—এম. সি. সরকার —সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদপট। পরে "বছর পঁচিশ"—বিশ্ববাণী প্রকাশনী—কাব্য সংগ্রহে ছাপা হয়েছে। এ কবিতার বইয়ের অনুবাদগুলি "এলিঅটের কবিতা" ও "হে বিদেশী ফুল" গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

৪। ২২শে জুন— ১৯৪২—Anti Fascist Writers' Association.

৫। সাত ভাই চম্পা— ১৯৪৫—অমল বসু, ঈগল পাবলিশার্স, কলিকাতা।

৬। সন্দ্বীপের চর— ১৯৪৭ - চিন্মোহন সেহানবিশ, দি ব্লকম্যান, কলিকাতা।

৭। অন্বিষ্ট— ১৯৫০—ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬।

এই চারটি গ্রন্থ প্রথম "একুশ বাইশ" (এম. সি. সরকার), পরে "বছর পঁচিশ"-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—বিশ্ববাণী প্রকাশনী (১৯৭৩)।

৮। নাম রেখেছি কোমল গান্ধার—১৩৬০ (১৯৫৩)—সিগনেট প্রেস, কলিকাতা ও পরবর্তী সংস্করণ।

৯। আলেখ্য— ১৯৫৮—সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার। পরে "বছর পঁচিশ" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত (বিশ্ববাণী)।

১০। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ— ১৯৫৮ বাক্, তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় "একুশ বাইশ"—এম সি. সরকার, পরে "বছর পঁচিশ" কাব্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

১১ স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ— বৈশাখ ১৩৭০ (১৯৬৩) সম্বোধি পাবলিকেশনস, কলিকাতা। প্রকাশক :

রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১ম ও ২য় সংস্করণ, ৩য় সংস্করণ—বিশ্ববাণী প্রকাশনী ও "বছর পঁচিশ" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

১২। সেই অন্ধকার চাই— ১৯৬৬—ভারবী, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ—বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা।

১৩। রূপতী পঞ্চাশতী— ১৯৬৭—কবিতার সংকলন—মণীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

১৪। সংবাদ মূলত কাব্য— ১৯৬৯—প্রকাশক সাহিত্যপত্র গ্রন্থ, কলিকাতা-৯ (পরে বিক্রির জন্য বিশ্ববাণীকে দেওয়া হয়েছিল—আলাদা ছাপা হয়নি)।

১৫। ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে— ১৯৭০- সারস্বত লাইব্রেরী, কলিঃ-৬, প্রকাশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য (ছাপা নেই)।

১৬। রবি করোজ্জ্বল নিজ দেশে— ১৯৭৩—মাতলা ব্রাদার্স—ঢাকা-৩, বাংলাদেশ (ছাপা নেই)।

১৭। একুশ বাইশ—প্রথম কাব্য-সংকলন— প্রথম প্রকাশ ১৩৭২—এম. সি. সরকার (ছাপা নেই)।

১৮। বছর পঁচিশ— ১৯৭৩—পূর্বলেখ, ২২শে জুন, সাত ভাই চম্পা, সন্দ্বীপের চর, অম্বিষ্ট, আলেখ্য; তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ কবিতা গ্রন্থের সংকলন—বিশ্ববাণী প্রকাশনী।

১৯। ঈশাবাস্য দিবানিশা— ১৯৭৪—বিশ্ববাণী।

২০। চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর— ১৯৭৫—বিশ্ববাণী।

২১। উত্তরে থাকো মৌন— ১৯৭৭—আনন্দ পাবলিশার্স, কলিঃ-১৮

২২। আমার হৃদয়ে বাঁচো— ১৯৮১—নাভানা।

অনুবাদ ঃ বাংলায়

১।	এলিয়টের কবিতা—	সিগনেট প্রেস—প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণ।
২।	সমুদ্রের মৌন—	১৯৪৫—প্রকাশক, অমল বসু, ঈগল পাবলিশার্স (ছাপা নেই)।
৩।	হে বিদেশী ফুল—	১৯৫৮ বাক্, কলিকাতা-১৩, প্রকাশক—তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় (ছাপা নেই)।
৪।	মাওৎসে তুং—	১৯৫৮—প্রথম প্রকাশ ঃ ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, কলিকাতা-৯। ২য় ও পরবর্তী সংস্করণ—মাও-সে তুং-এর কবিতা—বিশ্ববাণী (১৯৮৩)।
৫।	আফ্রিকায় এশিয়ায় মুরলী মৃদঙ্গ তুর্যে	চতুর্থ আফ্রো এশীয় লেখক সম্মেলনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি কমিটি। (ছাপা নেই)।

সংকলন

১।	একুশ বাইশ—	ছাপা নেই।
১।	বছর পঁচিশ—	১৯৭৩ (১৮নং)।
৩।	বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা—	১ম, ২য়, ৩য় মুদ্রণ নিঃশেষ ; ৪র্থ মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৮৮, (সেপ্টেম্বর ১৯৮১)।
৪।	একালের কবিতা—	১৯৬৩ ভূমিকাসহ আধুনিক কবিতার সংকলন, সম্বোধি পাবলিকেশন, কলিকাতা (ছাপা নেই)।
৫।	বাংলা দেশের কবিতা—	এক স্তবক—মনীষা - সেপ্টেম্বর ১৯৭১ (ছাপা নেই)।

বাংলা গদ্য রচনা

১।	রুচি ও প্রগতি—	১৯৪৬—ঈগল পাবলিশার্স, কলিকাতা (ছাপা নেই)।
২।	সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—	১৯৫২—সিগনেট প্রেস (ছাপা নেই)।

৩।	এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য—	১৯৫৮—ইষ্ট এণ্ড কোং (ছাপা নেই)।
৪।	সাহিত্যের দেশ-বিদেশ —	১৩৬৯ – কথাকলি, কলিকাতা—১২ (ছাপা নেই)।
৫।	মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা—	১৯৫৭—মনীষা (ছাপা নেই)।
৬।	জনসাধারণের রুচি—	১৯৭৫—(পুরানো প্রবন্ধ ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে) বিশ্ববাণী।
৭।	রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা—	১৩৭২—লেখক সমবায় ও একটি edition ঢাকায়ও ছাপা হয়।
৮।	সেকাল থেকে একাল—	(পুরানো প্রবন্ধ আবার ছাপা) ১৯৮০, বিশ্ববাণী।
৯।	যামিনী রায়—	১৯৭৭—আশা প্রকাশনী।

English

1.	The Art of Jamini Roy (With John Irwin) —	1945—Indian Society of Oriental Art (out of print).
2.	Introducing Nirode Mazumdar—	1946 Book Emporium (out of print).
3.	An Introduction to Jamini Roy—	Dhoonimal—Delhi 1953 ?
4.	Pointings of Rabindranath Tagore India and Modern Art—	1957—Visva Bharati Quarterly.
5.	Prodosh Dasgupta—	His sculpture—1961—Lalitkala Akademi.
6.	Satyendranath Bose a legend in his lifetime—	1963 Indian Oxygen.

Essay

7. In the sun and the Rain— Essays on aesthetics 1972

Essay

8. The pioneers of Modern Art in India— After 1961 Lalit Kala Akademi.

Essay

9. Shakespeare without tears— Indian Oxygen (an interview taken by Smar Sen).

Anthology of prose writings

10. In the sun and the Rain—a collection of essays on aesthetics 1972 PPH (out of print).

Anthology of translations of his own poems.

11. History's Tragic Exultation. 1973— PPH (out of print)

12. Traslations

Caramel Doll—Abanindranath's story 1946.

Two Folk Tales of Bengal—Visva Bharati Quarterly.

She waited for him—Tara Shankar Bandyopadhya's story entitled "shabari" 1945.

The Music I live by (Radio talk).

Swagata—a review.
